বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম ও সাধনা।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমজ্‌জগন্নাথাশ্রম
প্রণীত।

বর্দ্ধমান—বোলকুণ্ডবাস্তব্য—
শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দেবশর্ম্মা (উকিল) কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৩৬ সাল,
১লা জ্যৈষ্ঠ।

মুল্য ১৲ টাকা

১ হইতে ৫নং ফর্ম্মা ৬৩নং বিডন ষ্ট্রীট্, এল্‌ম্ প্রেস হইতে
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।
৬ হইতে ১৫নং ফর্ম্মা দি ভেনাস্ প্রিন্টিং প্রেস হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত।
৬৬ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্।

উৎসর্গ-পত্রম্।

—:০:—
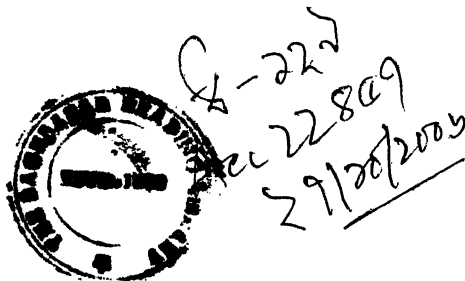
সংসারের মায়ামোহে 'আমি' 'আমার,' চিন্তা করিতে করিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়াছি। সর্ব্বদাই মৃত্যুর পর কি গতি হইবে ভাবিয়া আকুল, এমন সময় যাঁহার অভয়বাণী কর্ণে প্রবেশ করায় বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি—'অভয়ই আমার স্বরূপ,' সেই সংসারসাগরের কাণ্ডারী গুরুদেবের শ্রীচরণ-কমলে এই দীন সন্তানের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীভূষণচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ (উকিল)
বোলকুণ্ডা।
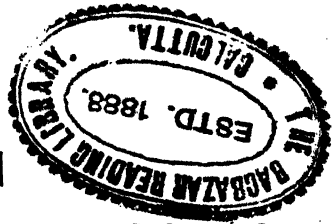
ভূমিকা

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমজ্ জগন্নাথাশ্রমপূজ্যপাদবিরচিত বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম ও সাধননামক গ্রন্থের ভূমিকার ভার মাদৃশ সংসারতাপত্রয়দগ্ধ প্রাকৃত মানবের উপর ন্যস্ত। এই গ্রন্থের পরিচয়প্রদান অপরের উপকার-সম্পাদন অপেক্ষা নিজের চিত্তবিশুদ্ধিই প্রয়োজন। স্বামীজি মহারাজ আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকিয়া ক্রমে মানবের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবৎপূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্কর যেমন তীব্রবৈরাগ্য-বশতঃ ব্রহ্মচারী হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামীজি ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তপস্যার দ্বারা যে সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়াছেন, গুরুর উপদেশে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বেদ, স্মৃতি-প্রভৃতির প্রামাণ্য অক্ষুন্ন রাখিয়া তদনুমোদিত পন্থা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অলৌকিক বস্তু প্রতিপাদন করিবার শক্তি শাস্ত্রব্যতিরেকে অপর কাহারও নাই, ইহা সমীচীনভাবে বলিয়াছেন। যোগ যে গুরু-পরম্পরাক্রমে লব্ধব্য, উহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আজকাল অনেক নূতন নূতন মহাপুরুষ বাহির হইয়া প্রথমে অজ্ঞ, সংসারসন্তপ্ত, শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকগণকে যোগের উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—আমি যে যোগ শিক্ষা করিয়া প্রচার করিতেছি তাহা বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি কোন শাস্ত্রে নাই, ইহা হিমালয়ের গুহায় অবস্থিত একটী মহাযোগীর নিকট পাইয়াছি ইত্যাদি। আবার বিশ্ববিদ্যালয়প্রত্যা-গত কোন কোন ব্যক্তি আধুনিক কোন ব্যক্তির লিখিত যোগশাস্ত্রাভাস হইতে দুই একটী তুক্ শিক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণেরও পাণ্ডিত্যে দোষ অর্পণ করিতে লজ্জিত হন না। যে সময় সকলেই গুরুর আসন লাভ করিতে

আগ্রহান্বিত, শিষ্য হইবার বাসনা কাহারও নাই। একদা যে ভারতে অর্জ্জুনের মত পুরুষসিংহ 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' এই বাক্য অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখনও যে মন্ত্র ভারতবাসীর গৌরব প্রখ্যাপিত করিতেছে, সেই দেশে সাধারণ লোক শিষ্য না হইয়া হঠাৎ গুরুর পদ পাইতে ইচ্ছুক, ইহা কালমাহাত্ম্যব্যতীত আর কি বলিব? এদিকে কোন কোন ভুঁইফোঁড় খদ্দরাচার্য্য বাহির হইয়া ধর্ম্মনাশে বদ্ধ-পরিকর। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলপূর্ব্বক নিজের পায়ে ব্রাহ্মণের মাথা আনিয়া প্রণাম লাভ করিয়া আচার্য্যত্ব প্রখ্যাপন করিতেছেন। কিন্তু কলিমদ্দী মিঞার করকলিত অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রথিত ভূদেবগণের অজস্র নিন্দাবর্ষণে ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া নিজের দুইটী পরিচ্ছিন্ন নয়নগোলক ও ভোঁতা কয়টী নরুনবৎ যন্ত্রের সাহায্যে ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্য্যমহাশয় ও মিঞা সাহেবের রক্তের তুল্যতা পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য সাজিয়াছেন। সেই সময় স্বামীজির দুন্দুভিনিনাদ জগতের কিঞ্চিন্মাত্রও কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, বলিয়া বিশ্বাস।

যোগ গুরুগম্য হইলেও গুরু কোথা হইতে পাইলেন? এইরূপে একটী মূল পাওয়া যায়। সেই মূল বেদশাস্ত্র, তাহাতেই যোগ উপদিষ্ট আছে, তাহাই পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য পতঞ্জলিপ্রণীত যোগসূত্রসমূহের প্রথম সূত্র—'অথ যোগানুশাসনম্''। এখানে 'শাসন' না বলিয়া 'অনুশাসন' বলায় অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ উপদিষ্ট, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পতঞ্জলির পূর্ব্বে কেহ যোগের উপদেশ দিয়াছেন বলিতে হইবে। 'হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ' ব্রহ্মা যোগশাস্ত্রের প্রথম উপদেষ্টা, অন্য কোন প্রাচীন উপদেষ্টা নাই। প্রথমে ব্রহ্মা বেদশাস্ত্র হইতে যোগের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া পরে উপদেশ দেন, অতঃপর পতঞ্জলি তাহা অবগত হইয়া সূত্রাকারে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

"পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌॥ ২।১২
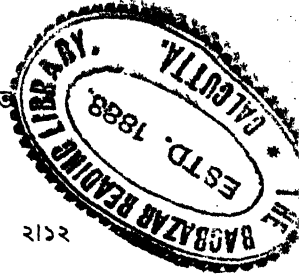
এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এইরূপ যোগের বিষয় অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাপ্রভৃতিতে যোগও উপদিষ্ট আছে। সুতরাং বেদাদি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ যোগ হইতেই পারে না। যাহারা এইরূপ কথা প্রচার করে, তাহারা পাষণ্ড, প্রবঞ্চকব্যতীত আর কিছুই নহে। গ্রন্থ দেখিয়া যোগ-শিক্ষা করা বা যোগী হওয়া যায় না, কিংবা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গণ্ডী ভাঙ্গিলে কখনও যোগফল লাভ হয় না। এই আর্ষ বিজ্ঞান বোঝা অসংযমীর পক্ষে, কিংবা ভোঁতা যন্ত্রের দ্বারা ইহার পরীক্ষা কোন কালেও হইতে পারে না, ইহা এই গ্রন্থে স্বামীজি বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থে যোলটী অধ্যায় আছে, কোন অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহা সূচীপত্রে জ্ঞাতব্য। ভূমিকায় সমস্ত বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব। প্রধানভাবে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। আজকাল সন্ন্যাস হওয়া অতি সহজ হইয়াছে, গৈরিক বসন পরিধান করিলেই যে কোন জাতি, যে কোন অধিকারী সন্ন্যাসী আখ্যা লাভ করিতে পারেন। স্বামীজি এই গ্রন্থে বৈরাগ্যবান্‌ ব্রাহ্মণের একমাত্র সন্ন্যাসে অধিকার, ক্ষত্রিয়াদির নহে—ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতির পক্ষে সন্ন্যাস বিহিত হইত, তাহা হইলে ভৈক্ষ্যরূপ সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতসংকল্প অর্জ্জুনকে কখনও ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস লইতে নিষেধ করিতেন না। আশ্রমবিভ্রাট ঘটায় আজ কত আনন্দ তারস্বরে ভারতবাসী হিন্দুকে গোমাংস খাইবার উপদেশ দিতেছে। আজ ক্ষত্রিয় রাজা থাকিলে সেই সব নকল সন্ন্যাসীর

কি দণ্ড হইত, তাহা বেদ স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছেন—"ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনমরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" ইত্যাদি।

গুরুকরণ বর্ত্তমান যুগে একটী অত্যদ্ভুত ব্যাপার। যদৃচ্ছাক্রমে গুরুত্যাগ ও গুরুগ্রহণ, স্ত্রীলোকগণের গুরুকরণে স্বাধীনতা, স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক্ গুরু—ইত্যাদি নানাবিধ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণভিন্নজাতি প্রচ্ছন্নভাবে অথবা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণাদি জাতিকে দীক্ষা প্রদান করিতেছে, স্বামীজি এই গ্রন্থে শাস্ত্ররীতিতে তাহার খণ্ডন করিয়া সকল রহস্য সহজে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

স্বামীজি অদ্বৈত ব্রহ্মবাদই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইহা বুঝাইতে যাইয়া কিরূপে সেই অদ্বৈতাত্মা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এই অভিপ্রায়ে অন্যান্য মতবাদের আলোচনা করিয়াছেন। অদ্বৈত ব্রহ্ম উপলব্ধির একমাত্র কারণ তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান চিত্তশুদ্ধিব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, সুতরাং গুরুর নিকট যাইয়া দীক্ষা লইয়া কুলাচারানুসারে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতে হইবে। যোগও চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়া তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ইহার দ্বারা দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণাদি জাতিকল্পনা বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অসৎ বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। এই অদ্বৈতব্রহ্মস্বরূপলাভই জীবের চরম ফল; যত দিন মানব উহা উপলব্ধি না করিবে, তত দিন তাহার সংসারে পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিতে হইবে। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা এবং পূজা ত্যাগ করিয়া খামখেয়ালীতে ধর্ম্ম করিলে কোনকালেই যে মুক্তি হয় না, ইহা গীতায় ভগবান্ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। স্বামীজি তাহাই স্বগ্রন্থে নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

অনেকে সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা ইত্যাদি নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপাসক সাজিতে চান, কিন্তু সুবর্ণবিহীন সুবর্ণ কুণ্ডলের ন্যায় নিত্য-কার্য্যবিহীন উপাসনা আকাশে ভিত্তিরচনার সদৃশ।

পরিশেষে ইহা বক্তব্য, যাঁহারা সাধনমার্গে প্রবেশ করিতে চান, যাঁহারা ভারতীয় রত্নভাণ্ডারের কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় লাভ করিবারও ইচ্ছা করেন, যাঁহারা ভারতীয় বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি একবার অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। পূজ্যপাদ স্বামীজির নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তিনি এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান দীনতাগ্রস্ত হিন্দুজাতির বিশেষ উপকার সাধন করুন। ইতি

আশ্রব

শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৪	যেঁ	যে
১৭	৬	ষাপন	যাপন
১৭	১০	কার্ষ্যে	কার্য্যে
৩৬	১১	মৃত্তিকা	মৃত্তিকা
৪২	৬	ষতমান	যতমান
৪৫	১৮	পাণ্ডিত্যাভিমানী	পাণ্ডিত্যাভিমানী
৪৬	৫	মন্ত্রশক্তিয়	মন্ত্রশক্তির
...	৭	মুক্তিদাতা	মুক্তিদাতা
৮১	২১	অকাশ	আকাশ
১০০	১৮	হইায়ছে	হইয়াছে
১০৮	১৩	স্থতবাং	স্থতরাং
১১৩	২	অত্মনিরুপণ	আত্মনিরুপণ
১৩২	১২	পদার্থভবাণী	পদার্থভাবনী
১৩২	...	তুর্য্যাগা	তুর্য্যগা
১৩৪	৮	দৃষ্ট্রূপে	দ্রষ্টৃরূপে
১৪২	১৯	অন্তস্তল	অন্তঃস্থল
১৪৭	৪	মতানুষায়ী	মতানুযায়ী
১৮৬	১৪	ষদিও	যদিও
১৮৬	১৭	বায়স্কোপ	বায়স্কোপ
১৯০	২২	উপার্জ্জিত	উপার্জ্জিত
১৯৭	২০	এই	নই
২০৩	১৩	নিস্কাসন	নিষ্কাসন
২০৯	২২	ক্রন্দ্ধ	ক্রুদ্ধ

দণ্ডীস্বামী শ্রীজগন্নাথ আশ্রম।

শ্রীশঙ্করমঠ (কাঁকো)
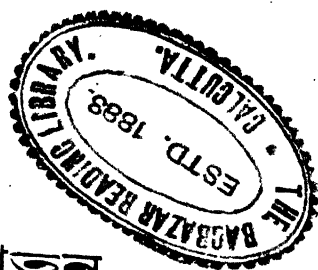
সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম ও সাধনা।

প্রথম অধ্যায়।

সাম্যবাদ প্রাচীন দৃষ্টি।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা এরূপ স্থানে উপনীত হইয়াছি যে, আলোক বা অন্ধকার উভয়ই সমানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। শাস্ত্রে বলে—এইরূপ সমতাবস্থায়, মানব জাগতিক সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে। সত্যই কি আমরা সেই পদবীতে অবস্থিত হইয়াছি, অথবা ইহা আলেয়ার মত দিক্‌ভ্রমকারী একটা কিছুর বিকাশ ?

চারিদিকে হা-হুতাশ, দুঃখ-দৈন্যের বিকট মূর্ত্তি ভারতের অনুপম সৌন্দর্য্য গ্রাস করিয়াছে। অত্যাচার, অবিচার, ঈর্ষ্যা, ঘৃণাপ্রভৃতি আসুরিক বৃত্তিগুলি যেন তাণ্ডব নৃত্যে প্রতি প্রাণীর হৃদয়দেশ শতধা বিভক্ত করিয়াছে, অধিকন্তু তাহারা ধ্বংসের এরূপ বিরাট আয়োজনে ব্যস্ত যে, তাহা ভাবিলেও প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। কেহ বলিতেছেন—কোন চিন্তা বা যুক্তির প্রয়োজন নাই। সহজ সরল বুদ্ধিতে যাহা সত্য মনে কর, তাহাই করিতে থাক। শাস্ত্র বা যুক্তি অসভ্য ব্যক্তিদের জন্য।

সভ্য জাতির জন্য শাস্ত্রাদির ঐ সব বন্ধনের আয়োজন অপ্রয়োজনীয়। সেদিন আর নাই। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আলোকে ঐ সব অজ্ঞান আঁধার চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে। মস্তিষ্কের বৃথা শক্তিক্ষয়কারী অপদার্থ ঐ সব মতবাদসমূহ আর যাহাতে উঠিতে না পারে, তাহাই একমাত্র সাধনার সামগ্রী। সুতরাং বক্তৃতা, পত্রিকা, অথবা প্রচারক দ্বারা তাহা করিলেই আমরা পরম আনন্দের অধিকারী হইতে পারিব। কেহ বলিতেছেন—জগতে যাহা কিছু আসে,বা আছে কিছুই অপ্রয়োজনীয় নহে : তবে ঐ সব শাস্ত্রাচারের, সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গিয়াছে। ঐরূপ আচার ব্যবহার বা সামাজিক নিয়মতন্ত্রতা যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে নূতন আকারে পরিণত করাই অবতারপ্রতিম মানবসমূহের কর্ত্তব্য এবং তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধানে, নানা স্থানে নানা দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং সেই সমুদয় দেবমানবপ্রতিপাদিত আচারই ধর্ম্ম, বর্ত্তমান সময়ের একমাত্র অনুকরণীয় বস্তু। কেহ বলিতেছেন—যাহাতে বহু মানবের সুখ হয়, তাহাই অনুষ্ঠেয়। আবার অপরে মুষ্টিমেয় লোকের সুখের সামগ্রী-রূপেই এই জগতের অভিব্যক্তি ইত্যাদি মতবাদ প্রচারে অভিলাষী। মুদ্রাযন্ত্রের বাহুল্য, ইংরাজী বিদ্যার প্রচার এবং রাজকীয় অনুকূলতা সর্ব্বপ্রকারেই সমুদয় মতের কিছু না কিছু সহায়তাকারী দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ইঁহারা সকলেই সত্য পথে ধাবমান অথবা এই মতবাদসমূহ বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির প্রলাপের ন্যায় অগ্রাহ্য। সকলেই স্বাধীনতার আলোকে উৎফুল্ল, এ সময়ে এরূপ প্রশ্ন করাই বাতুলতা। যাহাই হউক, যেহেতু এ যুগে স্বাধীন মত সকলেই প্রচার করিতে সমর্থ সুতরাং আমাদেরও কিছু স্বাধীনতা আছে বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং তজ্জন্যই এ বিষয়ে কিছু বলিতেছি। বাল্যকাল হইতে শুনিতেছি—আমরা এই জগতের সহিত ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত এবং সকলেই একদিন চরম

মুক্তির আস্বাদ পাইব। এই জগৎ এবং জাগতিক জীবসমূহ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, তিনি পরম কারুণিক এবং আমাদিগের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং আমরা যাহা করি, তিনিই তাহা করান, আমাদের কোন সামর্থ্য নাই। আমাদের সুখের নিমিত্তই তিনি এই সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া আশে পাশে রাখিয়াছেন। আমরা এই সমুদয় ধারণা করিতে পারিলেই অমৃতের অধিকারী হইতে পারি। সন্দিগ্ধবাদ আমাদের মজ্জাগত। সুতরাং সর্ব্বদাই মনকে বলি, "হে মন, তুমি এই কথা কয়েকটী ধারণা কর এবং ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই তোমার সর্ব্বপ্রকার অশান্তির নিবৃত্তি হইবে এবং তুমি অচিরে পরম পদের অধিকারী হইবে।" মন বলে, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক, কিন্তু ঐ দেখ অপর ব্যক্তি বলিতেছে—উহা অকিঞ্চিৎকর মতবাদমাত্র। আমরা উন্নতির পথে যাইতেছি সত্য, কিন্তু তাহার মূলে ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। আমরা নিজেই নিজের উন্নতি করি। পরস্পর সংযোগেই এই জীব ও জগৎ উৎপন্ন এবং মৃত্যুতেই ইহার সমাপ্তি। সুতরাং ঐ সব বৃথা মতবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি যাহাতে উত্তমরূপে করিতে পারা যায়, এস তাহাই করি। তাহা হইলে আমরা পরমানন্দের উপভোগ করিতে পারিব। দেখ, তোমরা এই সব মতবাদে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছ, আর প্রতিচীর সন্তানগণ কেবল সর্ব্বত্র বিজয়দুন্দুভিনিনাদে সমুদয় পৃথিবী আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।" বাল্যকালের শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সর্ব্বোপরি মনের এই যুক্তিপূর্ণ আবদার, বাস্তবিকই আমাদিগকে কি একটা অজ্ঞাত সুখের আশায় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই ভাবিলাম-- আচ্ছা! অনেকেই এই পথে যাইয়া অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছে সুতরাং আমরা আর কেন দুঃখ পাই। শীঘ্রই এবার সুখের চরম অবস্থায় পৌঁছিব। কিন্তু দুই চারি পা চলিতেই এক প্রশ্ন মনে উদয় হইল।

তোমার আশে পাশে অনেকেই নিশ্চিত ঐরূপ সুখে সুখী হইয়াছে। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই তোমার ঐ সমস্যাসমূহের মীমাংসা করিতে পারিবে। প্রশ্নের উত্তর লইতে যাইয়াই এমন জটিল সমস্যা দাঁড়াইল যে, আর তাহার পারে যাইবার ভরসা হইতেছে না। শুনিলাম দুঃখই সংসারে একমাত্র লভ্য বস্তু। যাহা কিছু সুখ, তাহার পনের আনা তিন পয়সা দুঃখে পূর্ণ। বাকীটুকু সুখ বা দুঃখ তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাই প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা, যদিও কেহ কেহ ইহার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন।

প্রথমতঃ আমরা বিরুদ্ধবাদীদের মতের সত্যতা বিচার করিতেছি। ইহাকে সুখের আগার, ভোগের আকর, এবং আনন্দের চরম অভিব্যক্তি বলিতে যাঁহারা প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি "তোমরা যাহাকে সুখ বল সে জিনিষটা কি? উহা দেহের, ইন্দ্রিয়ের বা মনের বা অপর কোন কিছুর অনুভব যোগ্য? যদি দেহের সুস্থতা বা পুষ্টি সুখের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে কুক্কুরাদি পশু অথবা বন জঙ্গলের অধিবাসী হওয়াই মানবমাত্রেরই বাঞ্ছিত হইত। কিন্তু কার্য্যকালে আমরা দেখিতেছি যে, কেহই ঐরূপ পশু বা পশুসদৃশ মানবের তুল্য অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করে না। বরং সকলেই চায় যাহাতে তদ্রূপ অবস্থায় কখনও কাহাকে না আসিতে হয়। যদি ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বপ্রকার চরিতার্থতাই একমাত্র কাম্য বস্তু হইত, তাহা হইলে মদ্যপায়ী লম্পট মানবেরাই জগতের সার্ব্বজনীন আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি যে, একজন নিঃস্ব সচ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজের আপামরসাধারণ দ্বারা পূজিত হইতেছেন। কিন্তু লম্পট অথবা মদ্যপায়ীকে দেখিলেই ঘৃণায় নাসিকা আকুঞ্চিতকরত সকলেই স্থান ত্যাগে অভিলাষী হন। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবী ব্যক্তিমাত্রেই নানাপ্রকার ঘৃণিত ও দুশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত হইয়া পুত্র-

পৌত্রাদি সকলকেই স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যান, যাহার ফলে অচিরাৎ বংশে দীপ জ্বালিবার কেহই থাকে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়সেবীর সুখ নাই, তাহাও প্রমাণিত হইল।

যদি কেবল মনের ভোগকেই চরম ধরিয়া লই, তাহাও যুক্তিবিচারে দাঁড়াইতে পারে না। কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহায়তাব্যতিরেকে শুধু মনে কোন প্রকার সুখই সম্পূর্ণরূপ আস্বাদন করা যায় না। বরং চিন্তা ও অতৃপ্তিজনিত আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মানুষের অতি সাধের দেহপর্য্যন্ত অপটু করিয়া তোলে।

যদি দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয় এককালে ভোগে রত হইয়া পার্থিব সুখ অনুভব করে ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই অন্য কোন একটী সচেতন বস্তুর সাহায্যব্যতিরেকে ইহাদের এককালে বা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া কাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ক্লোরোফরম্ (Chloroform) (অচেতনকারী দ্রব্যবিশেষ) নামক দ্রব্যবিশেষের সহায়তায় যদি কাহাকেও অচেতন করা যায় এবং ব্যাধিগ্রস্ত স্থান কাটিয়া দেওয়া হয়, তথাপি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সে ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, তাহার কর্ত্তিত অঙ্গুলীতে বেদনা হইতেছে, যেমন এইরূপ উক্তি বন্ধ্যাপুত্রের রাজ্য-লাভের ন্যায় অসম্বদ্ধপ্রলাপসদৃশ, তদ্রূপ চৈতন্যবিহীন দেহাদির সুখদুঃখ-ভোগ অসম্ভব। ফলতঃ চৈতন্যের সাহায্যভিন্ন কোন প্রকার কার্য্যই সমাধা হয় না। সুতরাং সুখও পাওয়া যায় না ইহাই মীমাংসিত সত্য।

যদি চৈতন্যই সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের নিয়ামক হন, এবং সর্ব্বপ্রকার সুখের আকর নির্ণীত হন, তাহা হইলে তথাকথিত মতবাদীদের উক্তি উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন অন্য আখ্যা পাইবার উপযুক্ত নহে। আমরা বিচার দ্বারা যে সত্যে উপনীত হইলাম, এই সত্যই ত্রিকালদর্শী ঋষিরা যুক্তি-বিচার এবং অনুভব দ্বারা জ্ঞাত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং

তাঁহাদের নিজ নিজ অনুভব নানা শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া অধিকারী বিশেষের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা বলেন নিজ নিজ যুক্তি বিচার দ্বারা উপনীত সত্যই অনুষ্ঠেয়, তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যেঁ, এইরূপ মতবাদ তাঁহারা পাইলেন কোথায়? ইহা কি তাঁহাদের মাতৃগর্ভ হইতে লব্ধ সংস্কার অথবা শিক্ষা ও সংসর্গসমূহের পরিণামফল। মাতৃগর্ভ হইতে এই সংস্কার আসে নাই এবং উহা কতকগুলি অপরিপুষ্ট মস্তিষ্কের প্রসূত বিকারমাত্র। তাহা না হইলে সেই সব মতবাদিগণ প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন মত গ্রহণ করিতেন না। আমরা বাল্যকাল হইতে যেরূপ শিক্ষা ও সংস্কার লাভ করিয়া থাকি, তাহার সহিত জন্মার্জ্জিত সংস্কারের মিশ্রণফলে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হই। যাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরতা এবং জন্মার্জ্জিত সংস্কারে বিশ্বাস করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—সম্ভবতঃ তাঁহারা মাষ্টার মদন ও সরস্বতী দেবীকে জানেন। উভয়েই চারি পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সঙ্গীত বিদ্যায় চরম উৎকর্ষ, তান-লয়ের বিশুদ্ধতা, কি প্রকারে লাভ করিয়াছিলেন? ইহা কি ইহ-জন্মের সাধনার ফল?—তাহাত সম্ভব নহে, কারণ তাঁহাদের সাধনার অবসর কোথায়? পিতামাতার নিকট হইতেও বংশানুক্রমিক ধারায় উহা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর-ব্যাপী দীর্ঘ সাধনার ফলেও তাদৃশ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। সুতরাং জন্মান্তরীণ সংস্কার ভিন্ন কোন্ যুক্তি দ্বারা এতাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার সিদ্ধ হইতে পারে? এই সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ এবং যুক্তি দেখান যাইতে পারে। তাহা সময়ান্তরে উল্লেখ করা যাইবে।

যাঁহারা বলেন—ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার নিদেশেই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, আমাদের কিছুই করিবার নাই, তাঁহারা অপর

এক শ্রেণীর অবিবেচক এবং ভ্রান্ত লোক তাহার সন্দেহ নাই, কারণ যদি ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং তোমার কোন কর্ত্তৃত্বই না থাকে, তাহা হইলে কাহারও কিছু করিবার আবশ্যকতা নাই। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই ধ্বংসশীল। যদি জীব সৃষ্ট পদার্থ হয়, তবে তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং মুক্তির অবসর রহিল না। সাধন ভজন বৃথা, চার্ব্বাকমতানুযায়ী আহার-নিদ্রাদির দ্বারা যে কোন উপায়ে দেহ পুষ্ট করাই কর্ত্তব্য।

সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ববিহীন (Passive) জীবের স্কন্ধে পাপ, পুণ্যের ভার চাপাইবার সঙ্কল্পও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভালমন্দ বলিবার কাহারও অধিকার নাই। যে দস্যু একজনকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে এবং যে পুণ্যাত্মা সর্ব্বস্ব পরহিতার্থে বিলাইয়া দিতেছে, উভয়েরই কর্ত্তা ঈশ্বর, সুতরাং তাহার ফলভোগী তিনি। কাঁঠাল একজনে খাইবে, আঠা অন্যের মুখে লাগিবে, ইহা কি বুদ্ধিমানের কথা? এ লম্পট ও অত্যাচারী, সে বিষয়ী, অপরে উদাসীন ইত্যাদি বাক্যগুলির কোনই অর্থ রহিল না। আর ঈশ্বর বেচারীও তথাকথিত ভক্তদের হাতে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন। এইরূপ মতবাদের প্রচারকগণকে জিজ্ঞাসা করি যে ঈশ্বর সৃষ্টি কেন করেন? বাসনার অভিব্যক্তিব্যতিরেকে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এই বাসনার জন্য দায়ী কে? তিনি যদি স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তা হন্ তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে ডাকিতে যাই কেন বা তিনি লীলা করিয়া আমাদিগকে এইরূপ কষ্টের ভাগী করেন কেন? আর যদি কোন বস্তু দেখিয়া তাহার কর্ত্তা আছে এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরনামক বস্তুর কর্ত্তা চাই, নতুবা বিচারে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। আমরা তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন-গুলির সমাধান চাই। নতুবা তাঁহাদের প্রচারিত বিশ্বাসমূলক অথচ

যুক্তিহীন পদার্থে কেন আকৃষ্ট হইব ? যুক্তি এড়াইবার নিমিত্ত যদি তাঁহারা বলেন—"অচিন্ত্য ঈশ্বরতত্ত্ব লৌকিক বস্তুর ন্যায় যুক্তিগম্য নহে", সেক্ষেত্রে আমারও বলিবার আছে যে, প্রকৃষ্ট প্রমাণভিন্ন এইরূপ মতবাদ সাধারণ্যে প্রকাশ্য নহে। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, তোমাদের মানিত শাস্ত্রগীতা বলিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (১৮।৬১)।

"অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিত ঈশ্বর শরীর-যন্ত্রে আবদ্ধ জীবসকলকে মায়াদ্বারা ঘুরাইতেছেন।" তাহা হইলে তিনি ভিন্ন কর্ত্তা কোথায় ? এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, এই অর্থ তোমার অপরিপুষ্ট মস্তিষ্ক প্রসব করিয়াছে, কারণ শাস্ত্রবাক্যের সমাধান করিতে হইলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ করিতে হয়। তৎপূর্ব্বেই গীতা বলিতেছেন—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥ (১৮।৫৯)।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥" (৬০ শ্লো)।

"অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি যে অহঙ্কার দ্বারা বশীভূত হইয়া যুদ্ধ করিব না এইরূপ মনে করিতেছ এই চেষ্টা মিথ্যা, কারণ প্রকৃতি তোমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেই। স্বভাবজাত নিজ কার্য্যের দ্বারা তুমি বদ্ধ, সুতরাং অবশ হইয়াও তোমাকে তাহা করিতেই হইবে।"

এক্ষণে আমরা যদি উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ইহজন্মে জীবের উপর সম্পূর্ণ

প্রভুত্ব করিতেছে। উহারই নাম মায়া। সেই কর্ম্ম এবং কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা জীবই সমুদয় কার্য্যের মূল। এখানে জীবকেই ঈশ্বর ধরিতে হইবে, কারণ হৃদয়ে তুইটী চৈতন্যের সত্তা নাই। যতক্ষণ নিজেকেই চৈতন্য বলিয়া না বুঝিতে পার, ততক্ষণ তোমা ছাড়া অতিরিক্ত চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাকেই ঈশ্বর বলা যায়। সেরূপ হইলেও ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতা এবং জীবের জন্ম, মরণ স্বীকৃত হয় না। প্রভাতে সূর্য্য উদয় হইবামাত্র সমুদয় প্রাণী স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। সূর্য্য কখনও কাহাকেও কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন না। সাধক সাধনায়, কৃষক কর্ষণকার্য্যে, ভোগী ভোগ্য-বস্তুসংগ্রহে, রোগী ঔষধপথ্যাদিব্যবহারে এবং যোগী পরমাত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়। এ ক্ষেত্রে সূর্য্য বাস্তবিক কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা, তাঁহার অধিষ্ঠাননিবন্ধন সমুদয় জগদ্ব্যাপার শৃঙ্খলা অনুসারে চলিতে থাকে। প্রত্যেক প্রাণী স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী ব্যক্তিত্বের সহায়তায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তদ্রূপ সর্ব্ব জগতের অধিষ্ঠান একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সান্নিধ্যবশতঃ সমুদয় ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হইতেছে। তজ্জন্যই হিন্দুজাতি ঐরূপ স্বেচ্ছাচারী ঈশ্বর স্বীকার করেন না। বেদাদিতে তাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হইয়াও জগদ্ব্যাপারের নিরাকরণ করা হইয়াছে। কর্ম্মের কারণগুলি শাস্ত্রানুযায়ী দেখান যাইতেছে—যথা—

"পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥"

(গীতা ১৩।১৩-১৪-১৫)।

"অর্থাৎ হে মহাবাহো! সমস্ত কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে পাঁচটী কারণ কথিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর—শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা এবং দৈব—এই পাঁচটী সমুদয় কর্ম্মের মূল। মনুষ্য শরীর, বাক্য এবং মন দ্বারা ন্যায় বা অন্যায় যাহা কিছু সম্পাদন করে এই পাঁচটীই তাহার হেতু।" এই সমুদয় অধ্যয়ন করিয়াও অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য না রাখিয়া স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক অর্থপ্রচার করিলে বুদ্ধিহীনতাই প্রমাণিত হয়।

বিজাতীয় শিক্ষা এবং সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী বেদ-বিরুদ্ধ অধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের সংশ্রবে আসিয়া আমরা ঈশ্বর, ভগবান্‌প্রভৃতি শব্দগুলি অযথা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী শব্দ এবং অর্থ, প্রাণ এবং মনের ন্যায় ঐক্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা নাই। ঈশ্বর-শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে যাঁহাতে নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য আছে, তাঁহাকে বুঝায়, অথবা উপনিষদ্ অনুযায়ী জগতের অভিন্ন নিমিত্তও উপাদানকারণ যে সুষুপ্তির অভিমানী প্রাজ্ঞ তাঁহাকে বুঝাইয়া থাকে। যথা--

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ
সর্ব্বস্য প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।"

মাণ্ডুক্যশ্রুতি।

"এই প্রাজ্ঞ সকলের ঈশ্বর, ইনি সকলেয় অভ্যন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করেন, এইজন্য ইনি অন্তর্য্যামী। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হয় এবং শেষ ইহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।" কোন কোন দার্শনিকেরা ঈশ্বরকে শুধু জগতের নিমিত্ত কারণ বলেন এবং তদনুযায়ী শ্রুতি ও যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাহাতে উপক্রম ও উপসংহার-প্রভৃতির একবাক্যতা না থাকায় আমরা উহা অনাদর করি। তর্কবহুল তৎসমুদয় আকরগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

আমরা এখন নিজের খেয়ালে চলিতে শিখিয়াছি। তাই শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা নাই, স্বকর্ম্মে নিষ্ঠা নাই, সুতরাং কোন প্রকার অনুষ্ঠানের ফলও প্রাপ্ত হই না। আমরা এইরূপ কথা বলিলে বাদিগণ বলিয়া থাকেন—তবে কি বিজাতীয়দিগের ধর্ম্ম ও পরকাল কিছুই নাই? ইহা কি শুধু হিন্দু-দিগের একচেটিয়া সম্পত্তি? এইরূপ অন্ধ অনুকরণ এবং গোঁড়ামী দ্বারাই হিন্দুজাতি ধ্বংসের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ গোঁড়াদিগকে আমাদের প্রয়োজন নাই। এতাদৃশ অনুদার মতবাদ বিশ্বাস করিয়া স্বর্গ লাভ করিলেও তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। সকলের সব জিনিষে সমান অধিকার, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে।

পাশ্চাত্যদিগের অজ্ঞানাচ্ছন্ন এই কলুষিত মতবাদ কতদূর ভ্রান্ত, তাহা প্রকাশের উপযুক্ত বাক্যও দেখিতে পাই না। তাঁহারাত এই পৃথিবীর পরমায়ুঃ কয়েক হাজার বৎসর মাত্র স্থির করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা নাকি ক্রমোন্নতির পথে শাখামৃগ হইতে মনুষ্যত্বে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বুদ্ধি হিন্দুশাস্ত্রে কোন রকমেই প্রবেশ করিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ বৎসরের সাধনার অমৃতময় ফলে হিন্দু-দর্শনের উৎপত্তি। সংযমের পরাকাষ্ঠা ব্যতিরেকে সর্ব্বপ্রকারে স্বেচ্ছাচারী ইহকালসর্ব্বস্ব জাতির ধারণায় হিন্দুর কোন প্রকার চিন্তাধারা প্রবিষ্ট হইতে পারে না; হইতে পারে তাঁহারা বাহ্য জগতের কতকগুলি বিষয়ের উন্নতি করিয়াছেন। তাহার ফলে অন্য সকলকে পথের কাঙাল সাজাইয়া নিজেদের ভোগবিলাস পরিতৃপ্তির নিমিত্ত জগৎধ্বংসকারী নিত্য নূতন যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া হিন্দু-দিগকে অর্দ্ধসভ্য বিকৃতমস্তিষ্ক বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিন্তু ইতি-হাসের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে—কিছুকাল পূর্ব্বেও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বনজঙ্গলে উলঙ্গ অবস্থায় মাংসাদির দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের পক্ষে ক্রমোন্নতিবাদ স্বীকার্য্য হইলেও হিন্দুর

দৃষ্টিতে হইবে না। তাঁহাদের সভ্যতা অতি অল্প দিনের। ইতিহাস যাহার নিরূপ করিতে পারে না, কিম্বদন্তীও যথায় পৌছিতে পারে না, সেই প্রাচীন জাতি অর্দ্ধসভ্য, ইহা কতদূর সত্য তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, তাঁহারা ইন্দ্রিয়বাদী সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছু থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদের ধারণার অতীত। কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণ অতি দুর্ব্বল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। চক্ষু অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াও দর্পণের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেকে দেখিতে পায় না, সূর্য্য অতি বৃহৎ বস্তু হইয়াও একখানি গোল থালার মত অনুভূত হয়, কামলারোগগ্রস্ত হইলে সমুদয় পদার্থ হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূরবর্ত্তী পক্ষী বা নিকটবর্ত্তী অণু-পরমাণু দৃষ্ট হয় না। দেয়ালের পরবর্ত্তী অতি বৃহৎ বস্তুও উপলব্ধ হয় না। একই বস্তু জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে নানারূপে অনুভূত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন আর কিছু না মানিলে জগতের সমুদয় জ্ঞান ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের গতি আর কতদূর? তাই হিন্দুজাতি বেদবিশ্বাসী। বেদনামক শব্দরাশিই হিন্দুজাতির নিয়ামক। বেদানুসারে এ পৃথিবী অনন্তকাল হইতে প্রবাহরূপে নিত্য। প্রতি প্রলয়ান্তে পুনরায় এই জগৎ বিকাশের নামই সৃষ্টি। সুতরাং ইহা কয়েক হাজার বৎসর হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি কয়লা খনির অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, বনজঙ্গলসমূহ কত কোটী কোটী বৎসর মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত থাকায় তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি যাহাই বলুন, তাঁহাদিগকে আমরা উপেক্ষার চক্ষে দেখিব। যদিও জড়জগতের ভোগবিলাস বাড়াইয়া জগতের উপরে যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন,

তথাপি তাঁহারা জগতের উৎপত্তি এবং মুক্তিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাই শাস্ত্রে যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্ততম মত উল্লিখিত আছে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। ইহার পরেও যদি কেহ জগৎ আদিমান্ বলিতে চাহেন, তবে কোন্‌দিন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দিলেই আমরা অনাদি প্রমাণ করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অদ্বৈতবাদই মুক্তির পথ।

সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বানুস্যূত, স্বপ্রকাশ, সাক্ষিস্বরূপ একমাত্র চৈতন্য আছেন তাঁহাতে মণির ঝলকের ন্যায় স্বাভাবিক স্পন্দন উৎপন্ন হয়। সেই স্পন্দন এবং চৈতন্য, যথাক্রমে প্রকৃতি এবং পুরুষ নামে অভিহিত। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ জড়া প্রকৃতিতে চৈতন্য ধর্ম্মের আরোপ হয়। যেমন জবাফুলের সান্নিধ্যবশতঃ স্ফটিক লৌহিত্যাদি গুণযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সহযোগে চৈতন্যময় হইয়া এই দৃশ্যমান্ জগতের সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করিয়া থাকেন। পুনরায় কালক্রমে তাহা আপন অঙ্গে মিশাইয়া লন। এইরূপ সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই প্রকৃতি দুই প্রকার মায়া ও অবিদ্যা। বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা মায়া এবং মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা নামে অভিহিত। মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর নামে অভিহিত। জীবের ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

এইরূপে আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত তেজের রজোগুণ হইতে পাদ, জলের রজোগুণ হইতে পায়ু, এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হয়। এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের রজোগুণের সমষ্টি হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়, তাহা কার্য্য

ভেদে পঞ্চধা বিভক্ত। যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। নাসিকাতে অবস্থিতে বায়ুর নাম প্রাণ। পায়ুতে অবস্থিত বায়ুর নাম অপান। উদরস্থ অন্ন পরিপাককারী বায়ুর নাম সমান। কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং সর্ব্বশরীরে অবস্থিত বায়ুর নাম ব্যান।

কার্য্যভেদে এই প্রাণ বায়ু আরও পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় তাহাদের নাম—যথা—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। ইহা বৃত্তি-ভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিভাগে বিভক্ত। মনের কার্য্য সংকল্প, বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয়, চিত্তের কার্য্য অনুসন্ধান এবং অহঙ্কারের কার্য্য অভিমান। শারীরিক যাবতীয় ক্রিয়া ইহাদেরই সহায়তায় নিষ্পন্ন হয়। পঞ্চভূতের পরস্পর পঞ্চীকরণ দ্বারা জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক এক ব্রহ্মাণ্ড, অতল, বিতল, সুতল, পাতাল ও রসাতল মহাতল, তলাতলরূপ অধঃ সপ্তলোক এবং ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এই উর্দ্ধ সপ্তলোকে বিভক্ত। এইরূপ জগৎ সৃষ্টি তুমি বা আমি সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ, শুধু যদি তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গে আমাদের অন্তঃকরণ পরিচালনা করিতে সমর্থ হই। যদি কেহ আধুনিক জড় বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন, অথবা জ্যোতিষের চরম তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চান, অথচ বিজ্ঞান মন্দির (Laboratory) অথবা মান মন্দিরে না যাইয়া রান্নাঘরে প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর পার্শ্বে গৃহিণীর সহিত কলহে ব্যাপৃত হন এবং সর্ব্বজ্ঞের দলে নিজের নাম লেখাইতে চান, তাহা হইলে তিনি যেমন জগতের চক্ষে বাতুল বলিয়া উপহাসাস্পদ হইবেন, তদ্রূপ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ওজন করিতে যাওয়া

ঘোর উন্মত্ততার পরিচায়ক হইবে। যদি কেহ এই ত্রিকালাবস্থিত নিত্য সত্যের এবং তদীয় মায়াশক্তির বিকাশকে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি ঋষিপ্রদর্শিত মার্গে অগ্রসর হইবেন এবং সমাধিপর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যদি বলিতে পারেন এইগুলি মিথ্যা স্তোভ বাক্য মাত্র, তখন আমরাও তাঁহার কথা সাদরে গ্রহণ করিব। শাস্ত্র হইতে উপলব্ধির উপায়গুলি এবং অনুভূত সত্যসমুদয় লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

সর্ব্বোপনিষৎসার গীতা বলেন ঃ—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ !
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥"

৩—তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ এই লোকে দুইপ্রকার মোক্ষের উপায় আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি। সাংখ্যগণ জ্ঞানযোগ এবং যোগিগণ কর্ম্মের দ্বারা অগ্রসর হইয়া থাকেন," কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সাম্যবাদের আশ্রয় লইয়া উভয়কেই এক পন্থা ও এক পদার্থ স্থির করিয়া লইয়া সকলকেই সমভাবে সেই পথেই অগ্রসর করিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্র ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। অধিকারিনির্ব্বাচন তাহার বিশিষ্টতা—কারণ, সব প্রাণী পরস্পর বিভিন্ন এবং বিভিন্নরূপ শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন। এবং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে বিভিন্নতাই জগৎ। বিভিন্নতানাশই জগতের ধ্বংস এবং শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতার পারে যাওয়াই জীবের সর্ব্ব বন্ধন হইতে অবসান লাভের কারণ। এক শ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিভিন্নতানাশই যখন মুক্তি, তখন সর্ব্বপ্রকারে একতার ভাণে হিন্দুধর্ম্মের বর্ণাশ্রমরূপ সর্ব্বপ্রকার বন্ধন সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন এই, যদি ইহাই সত্য হয় তাহা হইলে ঋষিরা এই বর্ণাশ্রম

বিধিবদ্ধ করিলেন কেন। যাঁহারা জগতের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত সুখে চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়া চিরদিন পর্ব্বতগহ্বরে হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে কটু তিক্ত ফলমূলাদি ভক্ষণকরত দিন যাপন করিতেন এবং অবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্বীয় শরীরপর্য্যন্তও পরহিতে বিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহারা এই সামান্য কথা বুঝিতে পারেন নাই কি? বর্ণাশ্রম সমুদয় দর্শনশাস্ত্রে স্বীকৃত ও স্মৃতি, পুরাণের প্রতিছত্রে দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা অনুকৃত। তৎসমুদয় অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, * সংযম সাধনাহীন অনুবাদজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা ধারণা করিতে পারেন না।

জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ এক নহে। এবং তাহাদের অনুষ্ঠাতাও এক হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

(গীতা ১৬।২৩)

"যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, শান্তি এবং মোক্ষ কিছুই প্রাপ্ত হয় না।" শাস্ত্র বলিতেছেন, নিষ্ঠা দুই প্রকারের। সুতরাং উহাকে দুই প্রকার বলিয়াই মানিতে হইবে। কারণ বেদ তাহার পোষক। সাধারণ লোক বেদ কি তাহা বুঝিতে পারে না। তাই নিজের মনের মত কথা না পাইলেই তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিজের ক্ষিপ্ততা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা দুই প্রকার শব্দের অস্তিত্ব জানে, তাই তাহারা বেদ বুঝিতে পারে না। মধ্যমা, বৈখরী এই দুই শব্দ তাহাদের জ্ঞাত। যাহা মনে মনে চিন্তা করা যায় এবং যাহা বাক্যে প্রকাশিত হয় তাহারাই পূর্ব্বোক্ত নামদ্বয়ে অভিহিত।

* গ্রন্থকারের বর্ণাশ্রমনামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ইহা ছাড়া অনাহত ও পরাভেদে আরও দুই প্রকার শব্দের অস্তিত্ব আছে। তন্মধ্যে অনাহত শব্দ সাধকমাত্রেই সাধনার কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরে আরোহণ করিলেই বুঝিতে পারেন। পরা বাণীর সন্ধান কোন কোন সিদ্ধ পাইয়া থাকেন। উহা যুক্তি বিচারজনিত জ্ঞান নহে। সংযম সাধনার চরম ফলে অনুভূত হইয়া থাকে। তাই সব দেশে সর্ব্বজনকর্ত্তৃক অনুভূত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

গীতা সমুদয় উপনিষদের সার এবং সর্ব্বসম্প্রদায়মান্য শাস্ত্র। তাহাতেই উপদিষ্ট উভয় পন্থা সর্ব্ব ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়াছেন। এবং এত উচ্চ অধিকারীকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানযোগ কত কঠিন তাহা বলিতে হইবে না। দেশমান্য বালগঙ্গাধরতিলকমহোদয় তৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত গীতাতে কর্ম্মবাদই প্রচার করিয়াছেন, উহা বাস্তবিকই সংযম-সাধনাহীন এই সময়ের লোকের পক্ষে সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ মতই চরম সত্য নহে। মহাবীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন বলিয়াই উত্তম অধিকারী ছিলেন, এরূপ বিবেচনা আমরা করিতে পারি না। কারণ বসুদেব তাঁহার পিতা হইয়াও নারদের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং আজন্ম পরমহংস শুকদেবের জন্মদাতা হইয়াও ব্যাসদেব উলঙ্গ অবস্থায় স্নানরতা অপ্সরাগণের লজ্জার কারণ হন। কিন্তু ষোড়শবর্ষীয় যুবক শুকের উলঙ্গ অবস্থা দর্শনেও অপ্সরাদের মনে কোন বিকার আসে নাই। কর্ম্মযোগের চরম পরিণামে সন্ন্যাসে উপনীত হয়। তাহা গীতাকার বলিয়াছেন যথা—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" (৩।৪)

"অর্থাৎ পুরুষ কর্ম্মযোগব্যতিরেকে (কর্ম্মযোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিয়া) সন্ন্যাসের অধিকারী হন না। সন্ন্যাসেরই চরম পরিণাম সিদ্ধি-লাভ।" মহাবীর অর্জ্জুন প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে গুরুজনদিগকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভক্ষণ বরং শ্রেয়ঃ। সুতরাং ইহা-দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি রাজ্যের বাসনা ছাড়িতে পারেন নাই, শুধু গুরু-জনবধরূপ পাপের নিমিত্তই ভিক্ষান্নভোজনরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হয় নাই। তাঁহারা জ্ঞানের চরমফল লাভে অধিকারী। শাস্ত্রে সমাজ এবং আশ্রমের বিধি ব্যবস্থা নানারূপ করিয়াছেন। অবশ্য বৈদিক ধর্ম্মের নাম লইয়া বর্ত্তমান সমাজে কালাধলার বিচারের ন্যায় অনেক অপদার্থ জিনিষ প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার প্রাণহানির ব্যবস্থা না করিয়া সংস্কার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাজার অনুকূলতায় বা প্রতিকূলতায় সমাজ গঠিত হয়, সুতরাং সমাজসম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থল ইহা নহে।

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানংপশ্যেৎ'
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতো নাশান্তো মানসো বাপি
প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

ইত্যাদি শ্রুতি অনুযায়ী আমরা জানিতে পারি, এই সাংখ্য বা জ্ঞান-যোগের অধিকারী কে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরকভাষ্যে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, যাহা অতি কঠিন দার্শনিক তথ্যে পরিপূর্ণ এবং তীক্ষ্মমস্তিষ্ক সুধীগণেরই আলোচনীয়। যাহার গাম্ভীর্য্য এবং সারবত্তা আধুনিক বিভিন্ন মতাবলম্বী উপাসকসম্প্রদায় ধারণা করিতে না পারিয়া মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ইত্যাদি বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কিন্তু যাঁহারা মতবাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসুরূপে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের বিচারগুলি আলোচনা করিবেন তাঁহারাই বুঝিবেন, ঐরূপ মতবাদ একমাত্র নিত্যসত্য বৈদিক মত। অন্যান্য বাদিগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেশকালাতীত ত্রিকালস্থায়ী সত্যের পরিচায়ক নহে। সর্ব্বোপনিষৎসার গীতাতে হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় মৌলিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। যদি গীতা দ্বারাই গীতার মত কি জানিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তাহার মত চরমে আচার্য্য কথিত অদ্বৈতবাদেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু অন্যান্য বাদিগণের মতও নিন্দার যোগ্য নহে। উদয়োন্মুখ সূর্য্যের আলোক সহ্য করার ক্ষমতা উলূকের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে, তাই বলিয়া তাহারা জগতের বাহিরে যাইতে পারে না এবং তজ্জন্য অন্ধকারাবৃত স্থানে আশ্রয় লওয়া তাহাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। সুতরাং ঐ সব মতবাদিগণের অস্তিত্ব চিরকালই আছে ও থাকিবে। আমরা নিরপেক্ষ সত্য কাহাকে বলে এবং তাহা লাভের উপায়গুলি আলোচনা করিয়া অন্যান্য মতের সাধ্য এবং সাধন তত্ত্বও সবিচার আলোচনা করত তদ্দ্বারা আমরা কতদূর উন্নত হইতে পারি, তাহাও স্থানান্তরে আলোচনা করিব।

সৃষ্টিপ্রকরণ আলোচনা করিতে যাইয়া বেদান্তশাস্ত্রানুযায়ী কয়েকটী কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন যে, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার না করিয়াও জগতের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে তাহার যখন সুন্দর মীমাংসা পাওয়া যায়, তখন এরূপ কোন জগৎকর্ত্তা স্বীকার করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। বরং ঐরূপ ঈশ্বর স্বীকার করিলে কতকগুলি অনিবার্য্য প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে, যাহার মীমাংসা কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। সাংখ্যবাদীরা পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বহু নির্গুণ পুরুষ এবং একমাত্র প্রকৃতিদ্বারা এই জগতের বিকাশ হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বেদান্তসম্মত একব্রহ্মই মায়াযোগে বহুরূপে দৃষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ মতবাদ স্বীকার করা অজ্ঞানের কার্য্য বলেন। তাঁহারা পরিণামবাদ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে এই জগৎ প্রকৃতির বিকৃত রূপ। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়। বিকারশীলা সত্য প্রকৃতির সঙ্গবশতঃ নির্গুণ পুরুষ সমূহ অনাদিকর্ম্ম-জনিত অবিবেকবশতঃ এরূপ আবদ্ধ হইয়াছেন। প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র ইহা জানিতে পারিলেই জীব স্বস্বরূপে অবস্থিত হন। মুক্ত হইলেও প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে। ভ্রষ্টবীজসম প্রকৃতির আর কার্য্যকরী শক্তি থাকে না। এই মতে প্রকৃতিতেই সমুদয় শক্তির বীজ নিহিত আছে, তাহা পুরুষের সঙ্গবশতঃ ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। ইঁহারা জন্য ঈশ্বররূপ হরি, হরব্রহ্মাদি দেবতাগণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা মায়িক জগতের রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া জগতের নিয়ামক হইয়াছেন। সাধারণ জীব এই নিয়মন-প্রণালী জ্ঞাত নহেন বলিয়া তাঁহাদিগকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া ভ্রমজালে পতিত হন।

এক্ষণে আমরা বেদান্তসম্মত অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। এই অদ্বৈত ভাবের অধিকারী কে তাহা আলোচনা করিতে যাইয়া বেদান্তের প্রথম সূত্রে আচার্য্য প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাঁহার নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান জন্মিয়াছে, যাঁহার ব্রহ্মলোক হইতে জগতের সমুদয় ভোগ্য পদার্থে কাকবিষ্ঠার ন্যায় হেয় বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধানরূপ ষট্-সম্পত্তিযুক্ত এবং যাঁহার তীব্র মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তিনিই এই মত আলোচনা করিয়া শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এই সমুদয়ব্যতিরেকে বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা প্রায় নিরর্থক। শুধু

বাক্যাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নহে। অনেকেই বলিতে পারেন—এইরূপ দুরূহ শাস্ত্রের আলোচনার সার্থকতা কি। তাঁহাদের নিকট ইহাই বক্তব্য যে পায়সান্ন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট বিষতুল্য হইলেও, দীপ্তজঠরাগ্নি ব্যায়ামশীল ব্যক্তিগণের নিকট অতি সুখাদ্য এবং বলপ্রদ, তাহার সন্দেহ নাই। এই মতটীর নাম অনির্ব্বচনীয় বাদ। অন্ধকার স্থানে পতিত রজ্জুখণ্ডকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হয় এবং তজ্জন্য কম্পাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে বিশ্বভ্রম উৎপন্ন হইয়া জন্মমরণাদিরূপ ভয়ে নিপতিত হইতে হয়। এক ব্রহ্ম সর্ব্বজীবের আত্মা এবং নিত্য সত্য। তাহা ভিন্ন সমুদয় পদার্থ মায়িক, সুতরাং মিথ্যা। ব্রহ্মবস্তু নির্ব্বিকার, কিন্তু এই বিশ্ব সবিকার; সুতরাং এই সবিকার বিশ্বকে জানিতে পারিয়া ত্যাগ করিলেই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম আত্ম-স্বরূপে অনুভূত হয় এবং তাহারই নাম মুক্তি। বিকারশীলা মায়াকে সৎ বলা যায় না, কারণ মায়ার নিত্যত্ব যুক্তি সিদ্ধ নহে এবং মায়াকে অসৎও বলা যায় না, কারণ মায়ার অস্তিত্বেই জীবের বদ্ধাবস্থা প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মায়া অনির্ব্বচনীয় বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য নহে। রজ্জুকে সর্পরূপ অনুভব হওয়া রূপ-দ্বৈত ভাবই জগৎস্বীকার রূপে অনুভবের প্রমাণ। দ্বৈতবাদী বলেন—যদি সর্পের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে রজ্জুকে সর্পরূপে কল্পনা কি প্রকারে সঙ্গত হইল।

রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা মিথ্যা হইবে কেন? যে ব্যক্তি সর্প দেখে নাই, তাহার রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইবে কি প্রকারে। রজ্জুতে কখনও অশ্ব বা অন্য কিছু ভ্রম হয় না কেন? এজন্য রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি মিথ্যা নহে। সেইরূপ ব্রহ্মেতে যে জগৎ জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা মিথ্যা নহে। তাহাও সত্য জ্ঞান। সুতরাং এই জগৎ মিথ্যা নহে। ইহার উত্তরে দেখিতে হইবে যে, সর্পভ্রম স্থলে সর্পজ্ঞানই তাহার কারণ। সর্পসত্তা

সেই ভ্রমের হেতু নহে। সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎভ্রম হওয়ায় জগতের সত্তা সিদ্ধ হয় না। সর্প না থাকিলে সর্পজ্ঞান হয় না ইহাও নহে, কারণ পূর্ব্বদৃষ্ট সর্প সংস্কাররূপে রহিয়াছে। রজ্জুর সাদৃশ্যবশতঃ ভ্রান্তিতে সর্পজ্ঞান উপস্থিত হয়। যদি বলা যায়, যে সর্প পরে না থাকিলেও প্রথম যখন সর্প জ্ঞান হয়, তখন সর্প বিদ্যমান ছিল, সুতরাং সর্পের বিদ্যমানতাই তাহার কারণ, তাহা নহে। কারণ বাল্যকাল হইতে লোক-মুখে ভূত-প্রেতাদির গল্প শুনিয়া অজ্ঞানী নিজের মনে ভূতাদির রূপ গড়িতে থাকে। পরে কোনরূপ ছায়া দেখিলেই তাহাকে ভূত বলিয়া বুঝিয়া থাকে। এ স্থলে মনগড়া ভূত ছায়াতে প্রবেশ করে। ভ্রমস্থলে যে সর্প দেখা যায় তাহা পূর্ব্বদৃষ্ট সর্প নহে। সুতরাং সর্পভ্রমে সর্পসত্তা সিদ্ধ, হয় ইহা বলা যায় না। যদি বলা যায়—সর্পদর্শনকালে যে সর্পত্বরূপ সর্পজাতি বুঝা যায়, ভ্রমকালে সেই জাতিই দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও সত্য হইবে না। কেননা রজ্জুতে সর্পের সর্পত্ব আসিতে পারে না, কারণ সর্পত্ব সর্পেই থাকে। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম তাহা রজ্জু-বিষয়ক অজ্ঞান প্রযুক্ত। সেই অজ্ঞান সর্প আনয়ন করে। সেইরূপ ভ্রান্তিই ব্রহ্মে জগতের আরোপ করিয়া থাকে। ভ্রমেতেই প্রকৃতি স্বীকৃত। ভ্রমেতেই প্রকৃতির পুষ্টি এবং স্থিতি। ভ্রম হইতেই জাগতিক ব্যবহার, পরে চিত্তে সংস্কাররূপে পরিণত হয়। এই ভ্রম দুরীভূত হইলেই অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং ভ্রম নাশ হইলে আর প্রকৃতির সত্তা মানিবার আবশ্যকতা থাকে না। একমাত্র অদ্বৈততত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে। এই অদ্বৈত ব্রহ্মকে যিনি আত্মস্বরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী নামে পরিচিত হন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে দশেন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি দশ বায়ু ও মনঃসংযোগে সমুদয় শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার সম্পন্ন

হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ব্যাপারাদিকে আমরা আত্মার কার্য্য বলিয়া প্রতিপদেই ভ্রমে পতিত হই। তাহার কারণ আত্মা সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

২০, ২য় অঃ।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণাণ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

(২।২২)

"অর্থাৎ এই আত্মা কখনও জন্মে না, বা মরে না অথবা জন্মের পর তাঁহার স্থিতিলাভ হয় না—এই আত্মা স্বভাবতঃ সৎস্বরূপ, সুতরাং তিনি অজ, তাঁহার বৃদ্ধি নাই সুতরাং তিনি নিত্য, অপক্ষয় নাই বলিয়া তিনি শাশ্বত, পরিণামহীন, সুতরাং তিনি পুরাণ। এই শরীরের হানিতে তাঁহার কোন হানি হয় না। যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগকরত মানুষ অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে তদ্রূপ আত্মা, বাসরূপ এই দেহ প্রারব্ধ বাসনার ক্ষয়ে নষ্ট হইয়া নূতন দেহ ধারণ করে।" এই ষড়্বিধ বিকার রহিত আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান হইল। যখন এই আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবে, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যাইবে।

জগতে যত কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদয়ের পার্থক্য (আকারগত বা পরিণামগত) গুণ দ্বারাই অনুমিত। ইহা সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের বিকাশ। যদি ঐ সব গুণগুলির বাহিরে কেহ যাইতে পারেন, তাঁহার নিকট পৃথক্ পৃথক্ বস্তু থাকে না। যদ্রূপ ঘট, পট রূপ ভেদ না থাকিলে একমাত্র মৃত্তিকাই অবশিষ্ট থাকে তদ্রূপ সত্ত্ব,

রজঃ বা তমোগুণের ক্রিয়া না থাকিলে একমাত্র নির্গুণ আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। সেই অব্যয় নির্গুণ আত্মাকে যিনি স্বস্বরূপে জানিতে পারেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। গীতা ত্রয়োদশে বলিতেছেন,—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥" ১৬

"অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের দেহধারী মাত্রের যত হস্ত, পদ, যত মুখ বা কর্ণ আছে, সেই সমুদয় যাঁহার, যিনি সমুদয় ক্ষেত্রে জীবরূপে ও রজ্জুতে সর্পের মত অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার সত্তায় এই সমুদয় সত্তাবান্ কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় দেহাদি যাহার আভাসেই ক্রিয়াশীল অথচ যিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত কারণ তিনি কাহাতেও সক্ত নহেন এবং রজ্জুতে সর্প না থাকিয়াও যেরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তির ভীতি, কম্পাদি উৎপাদন করে, তদ্রূপ যিনি নির্গুণ হইয়াও ভ্রান্তিবশে সগুণ, গুণভোক্তা বলিয়া অজ্ঞকর্ত্তৃক অনুমিত হন।

স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারের যেরূপ অন্তর এবং বাহির উভয়ই স্বর্ণ, তথাপি ভূষণ বলিয়া পৃথক্ সত্তা স্বীকৃত হয়। সেইরূপ চর ও অচর প্রাণী সমুদয়ের অন্তর বাহির যাঁহার সত্তায় সত্তাবান্, অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা যায় না। কারণ তিনি নির্ব্বিশেষ। অজ্ঞ

ব্যক্তির নিকট তিনি বহুদূরে এবং বিজ্ঞ তাঁহাকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন, সুতরাং তিনি তাঁহার অতি নিকটস্থ। যদিও তিনি এক, সমরস এবং অখণ্ড, কিন্তু সাগর তরঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তরঙ্গ শান্ত হইলে তাঁহাকে আর বিভক্ত দেখা যায় না। তিনি বিষ্ণুরূপে প্রাণীদিগের ভর্ত্তা, রুদ্ররূপে গ্রাসকর্ত্তা এবং ব্রহ্মারূপে জন্মদাতা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াশীলতাই উপাসনার নিমিত্ত তাঁহাদিগের এই তিনরূপে বিভক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মস্বরূপে তাঁহারা এক।"

গীতায় কথিত এই অদ্বয় আত্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে যতগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ক্রমশঃ তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

(১) ব্রহ্ম যদি বাক্য মনের গোচর না হন, তবে তিনি জ্ঞেয় কিরূপে ?

(২) ইন্দ্রিয়ব্যাপার ব্রহ্মঅধিষ্ঠানবশতঃ স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয় বাস্তব হয়, সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

(৩) সমুদয় প্রাণীতে থাকিয়া ব্রহ্ম নিরাকার কিরূপে ?

(৪) যদি ব্রহ্মই আত্মা হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতিদেহে তিনি ভিন্ন হইবেন এবং একের মুক্তিতে অন্যের মুক্তি হইবে না এবং এক হইলে মুক্তি বা বদ্ধাবস্থারূপ ভেদ থাকা সম্ভবপর নহে।

প্রত্যেক প্রশ্নের সংক্ষেপতঃ উত্তর দেওয়া যাইতেছে :—

(১) ব্রহ্ম এই দেহের ভিতর অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার অবস্থিতিবশতঃ সমুদয় ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত। রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ সর্পের সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তব সর্প সেখানে নাই। তদ্রূপ ব্রহ্মই জগৎরূপে অজ্ঞানীর নিকট প্রতীয়মান হইয়া থাকে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম গুণময় মনের দ্বারা অনুভূত হন না। সগুণ ব্রহ্মই বাক্য ও মনের গোচর হন এবং নির্গুণ ব্রহ্ম ঐ বাক্য মনের

নিশ্চল অবস্থাতেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন ও তাঁহাকে স্বীয় আত্মারূপে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইয়া থাকেন।

(২) সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার ব্রহ্মসত্তাতেই স্বীকৃত হয়, যদিও ব্রহ্মের অধিষ্ঠানই ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার কারণ, তথাপি তিনি অসক্ত থাকায় ঐ ক্রিয়ার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং তাঁহাকে গুণযুক্ত দেখাইলেও তিনি বরাবরই নিগু'ণ থাকেন। যেরূপ জবা পুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃ স্ফটিক লোহিত বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু স্ফটিকে কোন দিনই লৌহিত্য নাই, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে কোন কালেই গুণের সংশ্রব নাই।

(৩) স্বপ্নাবস্থায় ভূতের ভয়ে ভীত হওয়া সম্ভব এবং তজ্জনিত কম্পাদিও দৃষ্ট হয়, কিন্তু জাগরিত হইলেই আর ভূত থাকে না, সুতরাং তজ্জনিত কম্পাদিও মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানে ব্রহ্মকে সাকার সগুণ বলিয়া ধারণা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তিতে নিরাকার এবং নিগু'ণ বলিয়া বুঝা যায়। নিরাকার বলিলে আকারের অভাব স্বীকৃত হয় এবং এক ভাব বস্তু স্বীকৃত হয়। সাকার বলিলেই অনেক-গুলি ভাব বস্তু স্বীকার করিতে হইবে সুতরাং দ্বৈত বা খণ্ড ঈশ্বর স্বীকৃত হইতে পারে, কিন্তু ভাবঅভাব বস্তুতে দ্বৈত সিদ্ধ হয় না। এই নিমিত্ত অদ্বৈত নিরাকার সত্য বলা হয়। যদি আকারের মূল কিছু থাকে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহা নিরাকারেই সম্ভব। আকারবিশিষ্ট হইলে তাহা সিদ্ধ হয় না। কেননা আকার থাকিলেই তথায় দেশ থাকা চাই। দেশ স্বীকৃত হইলেই সর্ব্বমূল একটী বস্তু থাকে না। যদি অভাবকে দেশরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বস্তু সাকার হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সসীম কিরূপ হইবেন অসীমই, স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপ উৎপত্তি স্বীকার করিলে কাল স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু উৎপন্ন পদার্থমাত্রেই ধ্বংসশীল, সুতরাং উৎপন্ন অর্থাৎ গুণময় ব্রহ্ম ধ্বংসশীল হন। তজ্জন্যই তাহাকে চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

(৪) ব্রহ্মবস্তু সদা এক এবং অবিভক্ত, সর্ব্বভূতে ঘটাকাশের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হয়। ভূতসমুদয় মিথ্যা নশ্বর-মাত্র সুতরাং ভূতের পার্থক্যহেতু তাঁহাতে পার্থক্য কল্পনা করা অজ্ঞানের কাজ। জ্ঞানীর নিকট ভূতের নশ্বরতা জ্ঞাত থাকায় তিনি তাঁহাকে সর্ব্ব দেহে এক বলিয়া জানেন। সাগর তরঙ্গ সহ যেরূপ বিভক্ত দেখায়, অথচ উহা প্রকৃতই অবিভক্ত। সেইরূপ সাগরকেই ব্রহ্মের স্থলে রাখিয়া তরঙ্গকে জীবস্থানীয় ধরিলে উহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে। কারণ বায়ুর নিমিত্তই সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়। ঐ বায়ুর সমতাতে সাগর এক এবং অবিভক্ত বুঝিতে পারা যায়। তদ্রূপ মায়ার নিমিত্ত ব্রহ্মে দ্বিতীয় সত্তা হইলেও মায়ার নিবৃত্তিতে কার্য্য ও কারণের ন্যায় কারণকেই সত্য বলিয়া জানিতে পারা যায়। এক ব্রহ্ম-সত্তাই মায়া বলে বহুবিধ দেখাইতেছে, ইহা প্রতীতি হয়। ইহাতে মনে হইতে পারে তাহা হইলে একের মুক্তিতে নিশ্চিতই অন্যের মুক্তি হইবে কেননা ব্রহ্ম এক। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ মুক্তের দৃষ্টিতে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, অথচ বদ্ধ তাহাকে সত্য এবং বাস্তব বলিয়া মনে করে। মুক্ত যিনি তিনি এক সত্তা অনুভব করায় আর কাহারও সত্তা দেখিতে পান না। সুতরাং তাঁর কাছে আর কেহ অমুক্ত থাকে না। বদ্ধের নিকটেই ঐরূপ ভেদাভেদ থাকে। এমতাবস্থায় বদ্ধকথিত ভেদমুক্ত স্বীকার করেন না। ইহার লৌকিক দৃষ্টান্তও আমরা দেখিতে পাই। প্রাতঃকালীন সূর্য্য অজ্ঞানীর নিকট উদিত এবং

সন্ধ্যাকালীন সূর্য্য অস্তমিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানী সূর্য্যকে উদয়াস্তহীন নিরন্তর একরূপ বলিয়া জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট বোধ অসম্ভব এবং হাস্যজনক হইলেও জ্যোতিষিমাত্রেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়া থাকেন। তদ্রূপ অজ্ঞানীর নিকট অনুভূত বহু চৈতন্য এবং এক প্রকৃতি, জ্ঞানীর নিকট এক চৈতন্যই তদীয় মায়াশক্তিতে বহুরূপে প্রকাশিত হন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্যবাদীগণের সহিত ভেদ।

জগতের কারণ স্থির করিতে যাইয়া আস্তিক দার্শনিকগণ তিনটী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

যথা (১) আরম্ভবাদ (২) পরিণামবাদ এবং (৩) বিবর্ত্তবাদ।

১। এই মতে কারণ কার্য্য হইতে অত্যন্ত ভিন্ন।

২। কারণ কার্য্য হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে।

৩। কারণ কার্য্য হইতে অত্যন্ত অভিন্ন।

দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যেকটীকে বুঝান যাইতেছে—

যদি কেহ একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে চাহে, তাহার প্রথম কর্ত্তব্য উপকরণ দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করা, তজ্জন্য, তুরী, তাঁত, সূত্র, বেমা এইগুলি প্রয়োজন। ইহার মধ্যে সূত্রই আরম্ভবাদীর মতে উপাদান বা সমবায়ি কারণ অর্থাৎ যাহাতে কার্য্যের উৎপত্তি, অবস্থিতি এবং লয় তিনই সম্পাদিত হয় তাহারই নাম সমবায়ি কারণ; যেমন সূত্র অবলম্বনে বস্ত্রের উৎপত্তি, সূত্রেই অবস্থিতি এবং সূত্র নষ্ট হইলে বস্ত্রও নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত অন্য এক কারণ অসমবায়ি কারণ নামে অভিহিত হয়। যাহার নাশে কার্য্যদ্রব্যের নাশ হয় তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে। যেমন বস্ত্রের পক্ষে সূত্রসমূহের সংযোগ। এই সূত্রসংযোগ সূত্ররূপ সমবায়ি কারণে আশ্রিত থাকে। এতদ্ব্যতীত আরম্ভবাদিগণ নিমিত্ত কারণও স্বীকার করেন। কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব ক্ষণে যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় উৎপন্ন হইবার পর তাহার অবস্থিতির প্রয়োজন নাই তাহার নাম নিমিত্ত কারণ। যেমন বস্ত্রবয়নে, তন্তুবায়, তুরী, বেমা প্রভৃতি।

বস্ত্র বয়নের পর আর তাহাদের প্রয়োজন নাই। আরম্ভবাদিগণ এই ত্রিবিধ কারণই স্বীকার করেন। এই কারণের জ্ঞানেই কার্য্যেরও জ্ঞান হয়। কারণ হইতে কার্য্য অত্যন্ত ভিন্ন কেন তাহা বুঝান যাইতেছে। কার্য্য বস্ত্র, সমবায়িকারণ সূত্র, উহারা পরস্পর বিভিন্ন, কারণ এই যে, বস্ত্রদ্বারা পরিধানাদি সম্পন্ন হয়, সূত্র দ্বারা তাহা কখনও হইতে পারে না এবং সূত্র দ্বারা যে উদ্দেশ্য সীবনাদি হইতে পারেন বস্ত্র দ্বারা তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। তদ্রূপ বস্ত্রকার্য্যের নিমিত্ত কারণ তুরী ও তন্তুবায়প্রভৃতি বস্ত্র হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং দেখা গেল যে কার্য্য হইতে কারণ ভিন্ন। ইহা যে উৎপত্তির পূর্ব্বেও অসৎ, তাহা অতঃপর দেখান যাইবে। বস্ত্র উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না। যদি বলা যায় সূত্ররূপে থাকে—তাহা ঠিক নহে কারণ সূত্রকে কেহ কখনও বস্ত্র বলে না এবং সূত্র দ্বারা বস্ত্রের কার্য্যও সিদ্ধ হয় না। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে বস্ত্র থাকিত, তাহা হইলে বস্ত্র উৎপাদনের আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—আবার বিনাশের পরও উহা অসৎ।

জগতের তত্ত্ব আরম্ভবাদিগণ এইরূপেই নির্ণয় করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাহারা পরমাণুবাদ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে, ক্ষিতি,অপ্, তেজঃ, বায়ুর অতি সূক্ষ্ম পরমাণু আছে। পরমাণু বলিতে প্রতি ভূতের অতি সূক্ষ্মতম অংশ বুঝায় যাহাকে আর ভাগ করা যায় না। উহাই জগতের কারণ।

(২) পরিণামবাদ—

ইঁহাদের মতে কার্য্য চিরকালই আছে এবং থাকিবে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অব্যক্তাবস্থায় কারণে বিদ্যমান থাকে। ইঁহারা বলেন—যাহা অসৎ তাহা কখনও সৎ হইতে পারে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি

অসৎ বা অভাবস্বরূপ হয়, তাহা হইতে সৎ বা ভাব বস্তু কখনও হইতে পারে না। যেমন তিল হইতে তৈল বাহির করা যায়। যদি তিলে তৈল কখনও না থাকিত, তবে কখনও বাহির হইত না। বালুকাকণা হইতে কেহ কখনও তৈল হইতে দেখে নাই কারণ বালুকা কণাতে তৈল কখনও নাই। তিলের মধ্যে অব্যক্তভাবে আছে সুতরাং তাহা হইতে বাহির হইয়া থাকে।

উত্তরে আরম্ভবাদিগণ বলেন—যাহা যাহার কারণ, তাহা হইতেই তাহা বাহির হইবে। বালুকা তৈলের কারণ নহে তিলই তৈলের কারণ এই কারণই তিল হইতেই তৈল বাহির হয়।

ইহার উত্তর—কারণের সহিত কার্য্যের—কার্য্য-কারণ ভাব আছে বলিয়াই যদি তিল হইতে তৈল বাহির হয়—। তবে সম্বন্ধ কাহাকে বলে? দুই বস্তু পরস্পর মিলনের নামই সম্বন্ধ। কিন্তু আরম্ভবাদিগণের মতে ঘানিযন্ত্রে তিল ফেলিবার পূর্ব্বে তৈল বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ, কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রের সহিত কাহারও কি কোন সম্বন্ধ হইতে পারে। সুতরাং তৈল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তিলের সহিত তাহার কোন প্রকার সম্বন্ধই হইতে পারে না। যেমন তিলের সহিত সম্বন্ধ নাই, তেমনি বালুকার সহিতও তাহার সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সম্বন্ধ নাই বলিয়া বালুকা হইতে কেন তৈল উৎপন্ন হইবে না। পদার্থ যদি সৎ হয় তবেই তাহাদের সম্বন্ধ হইবে। অসতের সহিত কখনও কাহারও কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং আরম্ভবাদিগণকেও স্বীকার করিতে হইবে—তৈল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও তাহার সম্বন্ধ ছিল, তজ্জন্য পূর্ব্বেও তৈল অব্যক্ত-ভাবে তিলে বর্ত্তমান ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে, যাহা আছে তাহা উৎপন্ন করার জন্য আবার যত্ন কেন? উহার উত্তর এই যে তিলের মধ্যে তৈল অব্যক্তভাবে আছে—

তাহা ব্যক্ত করার নামই উৎপাদন; যেমন অন্ধকারে কোনও বস্তু থাকিলে আলোক দ্বারা তাহার বাধা সরাইয়া ফেলা হয়—ইহাতে সেই বস্তুটী উৎপন্ন হইল ইহা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং এই মতে কোন বস্তুই বিনষ্ট হয় না—কারণরূপ হইতে কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ও ভক্তিপ্রবর্ত্তক সমুদয় মতবাদিগণ এই মতবাদের পরিপোষক। এই পরিণামবাদই প্রায় সকলের উপজীব্য, সুতরাং অদ্বৈতবাদ ইহাদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য আমরা বিবর্ত্তবাদ উল্লেখ করিতেছি।

বিবর্ত্তবাদ, মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বহু নামে ইহা আখ্যাত হয়। ইহার যথার্থ নাম অনির্ব্বচনীয় বাদ। যাহা দেখি, যাহার স্বরূপ অপলাপ করিতে পারি না অথচ বিচারের দ্বারা যাহার বাধ হয়—ভাষায় প্রকাশের কিছু থাকে না, তাহারই নাম মায়াবাদ বা অনির্ব্বাচ্যবাদ।

অন্যান্য বাদিগণের বিরুদ্ধে ইঁহারা যাহা বলেন, তাহা প্রথমে লক্ষ্য করা যাউক। পরিণামবাদিগণ বলেন—কার্য্যসমষ্টিই কারণ। একই বস্তু অব্যক্ত হইলে তাহাকে কারণ বলে এবং ব্যক্ত হইলে তাহাকে কার্য্য বলে। এ মত বিচারসহ নহে, কারণ সামনে একখণ্ড ঝিনুক দেখিলাম, দূর হইতে দেখিলে উহাকে রূপা বলিয়া মনে হয়। ইহা কি ভ্রান্তি বা সত্য, অনেকেই কিন্তু ভ্রমে উহা গ্রহণের জন্য হাত বাড়াইয়া দেন, কারণ উহা তাঁহার নিকট সত্যই রৌপ্য বলিয়া মনে হয়। তদ্রূপ এই যে জগতে ঘট, পট ইত্যাদিকে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা ভ্রান্তি নহে ইহা কে বলিবে। উহাও যে ঝিনুকে রৌপ্যভ্রান্তির মত নহে, তাহার কি প্রমাণ? যখন আমরা ঝিনুককে রৌপ্য মনে করি, তাহার পূর্ব্বক্ষণে শুক্তিজ্ঞান থাকিলে কখনও রজত বুদ্ধি হইত না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় শুক্তিজ্ঞানের অভাবই রজতবুদ্ধির কারণ। বিবর্ত্তবাদিগণ ইহাকেই অবিদ্যা বা ভ্রান্তি বলেন, ইহাও তাঁহাদের মতে

ভাব বস্তু। কারণ উহার দুইটী কার্য্য। একটী আবরণ, অপরটী বিক্ষেপ। যাহার জ্ঞান থাকে না বা যাহা আমার নিকট প্রকাশ পায় না তাহার নাম আবরণ, এই অজ্ঞানাখ্য আবরণই বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে দেয় না। তৎপর "শুক্তি" না বুঝিয়া "ইহা রজত" বলিয়া যে ব্যবহার করি, তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি। অজ্ঞান অভাব বা শূন্য হইতে পারে না; কারণ অজ্ঞান বস্তুকে আবরণও করে, অন্যরূপে প্রকাশও করে। অভাব কাহাকেও আবরণ করে না বা অন্যরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। তজ্জন্য জ্ঞানের অভাবের নাম অজ্ঞান, ইহা স্বীকৃত হয় না।

এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাই আত্মার বিক্ষেপশক্তি এবং আবরণশক্তি এবং উহারই নাম মায়া, তাহা সৎ কি অসৎ ইহা কেহই নিরূপণ করিতে পারে না।

আমরা একই মাটীকে, কখনও ঘট বলিয়া ব্যবহার করি, কখনও পিণ্ড বলিয়া ব্যবহার করি, কখনও চূর্ণ বলিয়া ব্যবহার করি। এই ভাবে মাটী অভিন্ন হয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহারা কি সমুদয় এক অথবা পৃথক্ পৃথক্? মাটী ও ঘট যদি একই বস্তু হয়, তবে যাহাকে আমরা মাটী বলিয়া থাকি, সে সকলই ঘট বলিয়া বুঝিতে হইবে। চূর্ণ, পিণ্ড এবং ঘট তিনই মাটী। মাটী হইতে মাটীর যদি কোন ভেদ না থাকে, তবে পিণ্ড হইতে ঘটের ভেদ থাকিবে কেন? এই কারণেই মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু কার্য্য মায়া দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত।

স্বপ্নাবস্থায় কত শত বৈচিত্রময় বস্তু প্রতিভাত হইতেছে।—কত দেশ, কত পর্ব্বত, কত কত অলৌকিক বস্তু দর্শন হইতেছে—জাগরণ-কালে তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। অথচ স্বপ্নাবস্থায় তাহা লইয়া ব্যবহার চলিতেছে। ব্যবহারের বস্তু অলীক কিন্তু ব্যবহার সত্য।

যাহা একরূপে থাকে না, প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হয়, তাহারই নাম মিথ্যা। এই জন্যই জগৎ মিথ্যা বা পরিবর্ত্তনশীল।

ইহার প্রকৃত স্বরূপ কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, ব্যবহার—কালে ইহা সৎ বলিয়া মনে হয় কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহা পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং ইহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। কারণ সৎ চিরদিনই এক অবিকৃত এবং যাহা অসৎ তাহা পরিবর্ত্তনশীল। তাই এ জগত অলীক মায়াময়। একটী বস্তু ছাড়া এ সংসারের সমুদয়ই পরিবর্ত্তনশীল ও বিনাশী। এই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুর নামই ব্রহ্ম, আত্মা ও জ্ঞান।

যে জ্ঞান দ্বারা জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞান সর্ব্বদাই একরূপ। জ্ঞানের বিষয়গুলি পরস্পর পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু প্রকাশাত্মক জ্ঞান সর্ব্বদাই অপরিবর্ত্তনীয়।

ঘট বলিলে আমরা বুঝি,--হয় ঘট ছিল, না হয় ঘট আছে কিংবা হইবে। "ছিল" "আছে" বা "হইবে" এই তিনটী ঘটের সত্তা ভিন্ন আর কিছু বুঝা যায় না, কেবল কালের পার্থক্য অনুমিত হয়। ঘট, পটাদি সমুদয় অনুভবকালে সত্তার সহিত মিলিত হইয়া যায়, কারণ—ঘট, মঠ আদি সকলই সৎ বলিয়া ব্যবহার করি। এইরূপ সর্ব্ব বস্তুর সহিত সত্তা মিশ্রিত হইয়া যায়। এইরূপে জ্ঞানের যত প্রকার বস্তু আছে সমুদয়ই সতের সহিত অভিন্ন হইয়া ব্যবহৃত হয়। ঘট ও সৎ অভিন্ন পদার্থ, পট ও সৎ অভিন্ন পদার্থ, কিন্তু ঘট ও পট পরস্পর অভিন্ন হইবে না কেন? ইহারই নাম মায়া। যাহাকে সৎ হইতে অভিন্ন বলা যায় না এবং যাহা সৎ হইতে ভিন্নও হইতে পারে না তাহারই নাম কার্য্য এবং তাহারই নাম মায়া। ইহাই জগতের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ সমুদয় মায়াময়।

যদি বলা যায়, ইহার মূলে নিত্য জ্ঞান নাই ; উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিবর্ত্তবাদী উহাকে ক্ষণিক স্বীকার করেন না, তাঁহারা জ্ঞানকে নিত্য বলেন, কারণ—জ্ঞানের আদি বা অন্ত কেহ কোন কালেও দেখে নাই—ব্যবহারকালে আমরা আত্মার প্রকাশময়তা কোন সময়ই অস্বীকার করি না।

যে আমি শৈশবকে অনুভব করিয়াছি, সেই আমি যৌবনেও আছি এবং সেই আমিও বার্দ্ধক্যেও আছি। আমিত্ব বা সত্তা কখনও লুপ্ত হয় না। অথচ নানাপ্রকার ব্যবহার হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে ; তাহার অনেকই স্মরণপথে আসে না, কিন্তু আমি ছিলাম না ইহা কখনও অনুভূত হয় নাই। মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায়,—ঘট, পট, পিণ্ড ও চূর্ণ মধ্যে মৃত্তিকার ন্যায়, প্রকাশময় সত্তা সর্ব্বদাই রহিয়াছে। উহা শরীর নহে, কারণ শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে কিন্তু আত্মা বাড়েও নাই কমেও নাই। যদি বল, সুষুপ্তিকালে আত্মা থাকে না, কারণ জাগ্রত ও স্বপ্নে আমরা আত্মাকে অনুভব করি, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় কিছুই অনুভূত হয় না ; কিন্তু প্রকৃত কথা সুষুপ্তি একেবারে জ্ঞানহীন অবস্থা নহে। যদি সুষুপ্তিকে আমরা না জানি তবে কেমন করিয়া বলিব আমি সুষুপ্ত ছিলাম। সুষুপ্ত অবস্থায় যদি না জানি ইহা বলি, ও জাগ্রত অবস্থায় জানি, ইহা বলি তাহাতেও জানাই সিদ্ধ হয়। কারণ জাগ্রত অবস্থাতে কোন বস্তুর অনুমান করিতে হইলে, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাহার অগ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ জ্ঞান নাই সে পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করিতে পারে না। ফলে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, জাগরণ ও স্বপ্ন যেমন আমার অবস্থাদ্বয় সুষুপ্তিও তদ্রূপ তৃতীয়াবস্থা।

জাগরণ ও স্বপ্ন কার্য্যাবস্থা এবং সুষুপ্তি কারণাবস্থা। এই সুষুপ্তিই মূল অজ্ঞানের আবরণশক্তি, ইহারই প্রভাবে আত্মার-প্রকাশ

জ্ঞান এবং সত্তা আবৃত হইয়া থাকে। জাগ্রত ও স্বপ্ন সেই মূল অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি। ইহারই প্রভাবে আমাদের সম্মুখে অনন্ত প্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাই কার্য্য কারণের একমাত্র মূল তত্ত্ব।

এইবার আমরা দেখাইব যে, পরমাণুবাদ ও পরিণামবাদ দুইই যুক্তি-সহ নহে।

পরমাণুবাদিগণ বলেন যে, একটী কোন স্থূল পদার্থ—সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিতে করিতে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে তাহা আর ভাগ করা যায় না, সেই সূক্ষ্মতম অংশের নামই পরমাণু। এই পরমাণু নিত্য অর্থাৎ ইহার আর অংশ হয় না। দুইটী অবয়ব পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বস্তুর উৎপত্তি হয়। এইরূপেই সমুদয় জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে,—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমাদের কথা এই যে পরমাণুগুলিকে নিত্য মানিব কেন অর্থাৎ তাহার আর অবয়ব হইতে পারে না ইহা বলার হেতু কি? পরমাণু-বাদী বলেন—যদি পরমাণু সাবয়ব হয় অর্থাৎ ইহার কোথায় বিশ্রাম না থাকে—তাহা হইলে জগতে, ছোট বড় ইত্যাদি বিভাগ থাকিতে পারে না—অথচ এ ব্যবহার সর্ব্বদাই দেখিতেছি। একটী পর্ব্বত ও সর্ষপ পরস্পর অতি বিসদৃশ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ঐ সর্ষপের অবয়ব ধারা যদি অনন্ত হয় অর্থাৎ ভাগ করিতে করিতে উহার কোথাও পরিসমাপ্তি না হয় তাহা হইলে সর্ষপের অবয়ব অনন্ত স্বীকার করিতে হইবে। ঐরূপ পর্ব্বতকে যদি ক্রমাগত অংশ করা যায় এবং তাহার বিশ্রান্তি না হয় তবে তাহাকেও অনন্ত বলিতে হইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে সর্ষপের অবয়বও অনন্ত এবং পর্ব্বতের অনন্ত অবয়ব। কিন্তু ইহার পরিমাণ দ্বারা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বলিয়া সকলেই

বুঝি, সুতরাং মানিতে হইবে, সর্ষপের পরমাণু সংখ্যা অল্প এবং পর্ব্বতের বহু। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ঐ পরমাণু নিত্য এবং নিরবয়ব।

উত্তরে—আমরা বলি—যদি পরমাণুগুলি একেবারে নিরবয়ব হয়, তবে দুইটী পরমাণুর সংযোগ হইবে কি প্রকারে? দুইটী মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক তিনটী দ্ব্যণুকে একটা ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়, ইহাই তাঁহাদের উক্তি। এখন কথা এই যে, সংযোগের স্বভাব এই যে উহা যে দ্রব্যের ধর্ম্ম, তাহার কোন এক অংশে উৎপন্ন হইবে। যদি আমি উত্তর মুখে দাঁড়াই, কেহ সামনের দিকে আসিয়া মিলিত হইলে উত্তর দিকের সহিত সংযুক্ত হইবে, এইরূপ পিছন দিক্ হইতে সংযুক্ত হইলে দক্ষিণ দিকে হইবে। সংযুক্ত সর্ব্বাংশে হয় না, যদি তাহা হয়, তবে তাহাকে সংযোগ না বলিয়া এক বলিতে হইবে। সুতরাং বলিতে হইবে সংযোগ এক অংশে হয়; পরমাণু কিন্তু নিরবয়ব ও অংশহীন, সুতরাং পরমাণুর মিলন একেবারেই অসম্ভব। আর পরমাণু যদি সাবয়ব হয় তাহার অবয়ব ধারা অনন্ত হওয়াতে জগতে কোন প্রকার ব্যবহার চলিতে পারে না, সুতরাং পরমাণুবাদ সর্ব্বতোভাবে অমান্য।

পরিণামবাদিগণ বলেন—প্রলয়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটী গুণ পরস্পর সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টির প্রাক্কালে তাহাতে বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে অভিভূত করিয়া ব্যক্ত সৃষ্টির আরম্ভ হইয়া থাকে। রজোগুণই ক্রিয়াশক্তি, সুতরাং তাহারই ক্রিয়া দ্বারা প্রথম বৈষম্য উৎপন্ন হয়। তারপর অবিবেকী চৈতন্য তাহার সহিত মিলিত হইয়া প্রপঞ্চের ধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ নিজের উপর আরোপ করে—এই রূপেই তাহার সংসার হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এইযে—ত্রিগুণের বৈষম্যাবস্থা আসার কারণ কি? সকল গুণই যখন সমানভাবে অবস্থান করে, তাহার নামই সাম্যাবস্থা

বা অব্যক্তাবস্থা, যে সময়ে কোন কার্য্যই ব্যক্ত নাই, সুতরাং কোন আগন্তুক কারণ তাহাকে ব্যক্ত করিবে। আর যে বলা হয় প্রকৃতিই সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জীবকে ভোগ করাইবার জন্য প্রবৃত্ত হয়—তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইবে, কারণ প্রকৃতিও জড়। জড় কখনও কোনও কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যদি ইহাই প্রকৃতির স্বভাব বলা হয়, তাহাও হইতে পারে না, কারণ সৃষ্টির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার সে স্বভাব ছিল না, পরমুহূর্ত্তে আসিল কি প্রকারে? স্বভাব কেহ কখনও ত্যাগ করে না। অগ্নির স্বভাব দাহ; অগ্নি আছে অথচ দাহ-শক্তি নাই, ইহা কোন কালেই হইতে পারে না। তদ্রূপ কার্য্যপ্রবৃত্তি যদি প্রকৃতির স্বভাব হয় তাহা চিরদিনই থাকিবে। কোন সময় সে তাহার স্বভাব চ্যুত হইবে না। সুতরাং প্রলয় কোন কালেই হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি ক্রমাগতই হইতে থাকিবে, সুতরাং সাম্যাবস্থা আর সিদ্ধ হইল না। এই সব কারণে পরিণামবাদিগণের মতও অগ্রাহ্য। মায়াবাদই ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করে অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি কি প্রকারে হইয়াছে বাক্যদ্বারা নির্ণয় করা যায় না, সুতরাং তাহা অনির্ব্বচনীয়। অতঃপর বেদান্তশাস্ত্রানুযায়ী নিদিধ্যাসন-প্রণালী আলোচনা করা যাইতেছে—

নিদিধ্যাসনপ্রণালী সাধকের নিমিত্ত চারিটী স্তরে বিভক্ত যথা —বাগ্‌ভূমি, মনোভূমি, অহঙ্কারভূমি ও মহত্তত্ত্বভূমি। বাগ্‌ভূমি জয় হইলে বাক্যাদি ইন্দ্রিয়কর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া মনোবৃত্তি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। শুধু দেহধারণোপযোগী কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহা দ্বারা আর কিছু সম্ভব হয় না। মনোভূমি জয় হইলে সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ কামনা তাঁহার নিঃশেষে নাশ হয়। অহঙ্কারভূমি জয় হইলে আমি আমার ইত্যাদি বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়, সুতরাং দেহ এবং দেহসম্বন্ধ-বিশিষ্ট কোন বস্তু বা ব্যক্তির

প্রতি তাঁহার আমিত্ব থাকে না। ক্রমশঃ এই ভাবের পরিণাম অবস্থায় শুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

এক্ষণে ইহার অভ্যাসপ্রণালী বলা যাইতেছে। প্রথমে নির্জ্জন নিঃসঙ্গ স্থান স্থিরকরত স্থির অচঞ্চলভাবে আসনে উপবেশন করিতে হইবে, পরে আমি এই দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সর্ব্ব অংশেই আমি বর্ত্তমান এইরূপ চিন্তা কর। দীর্ঘকাল এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে দেহ হইতে আমি পৃথক্ এবং দেহের দ্রষ্টা আমি, সুতরাং দেহ আমার দৃশ্য এইরূপ ভাব উদিত হইয়া আনন্দময় করিয়া তুলিবে এবং তাহার ফলে দেহের যে রোগ শোকাদি বা দেহসম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মীয়াদির নিমিত্ত কোন প্রকার দুঃখ আর অভিভূত করিতে পারিবে না। ক্রমশঃ শুধু শ্বাস প্রশ্বাসমাত্র অনুভূত হইতে থাকিবে। সর্ব্বদা এইরূপ অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ 'আমি বায়ুময়' এই ধারণা হইবে। সুতরাং অন্নময় কোষের ক্রিয়া সেখানেই শান্ত হইল এবং প্রাণময় কোষের পরিচয় সাধকের নিকট জ্ঞাত হইল। তখন তিনি প্রাণের সর্ব্বত্র আছেন—এইরূপ চিন্তা করিতে অভ্যাস করিবেন, তাহার ফলে ক্রমশঃ তাঁহার আপনাপনি শ্বাসরোধরূপ কুম্ভক হইতে থাকিবে এবং বহু জন্মার্জ্জিত কর্ম্মসমুদয় মনোমধ্যে স্বপ্নের ন্যায় উদিত হইতে থাকিবে। ক্রমশঃ পূর্ব্বজন্মাদি স্মরণপথে পতিত হইবে এবং আরও অগ্রসর হইলে তিনি দেহ হইতে ইচ্ছামত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণাদিরূপ নানাপ্রকার শক্তির অনুভব করিতে থাকিবেন। সাধক এই অবস্থায় 'মনোময়কোষে' আরোহণ করিয়া নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া অবধারণ করিবেন। তৎকালে তিনি মনের সমুদয় বৃত্তির উদয় ও লয়াবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং ইহা স্থির করিবেন যে, তাঁহা হইতেই সমুদয় বৃত্তির উদয় ও লয় হইতেছে সুতরাং

তিনি তাহার মূল কারণ। সেই অবস্থায় সমুদয় বৃত্তিপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া জগতের সমুদয় ক্রিয়া কারণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। এই অবস্থা স্থায়ী হইলেই মনোময়কোষ জিত হইল, সুতরাং তিনি স্বপ্নাবস্থার অতীত হইলেন। তদনন্তর তিনি সুষুপ্তাবস্থা 'বিজ্ঞানময়কোষে' উপনীত হইয়া তাহাকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি নিজেকে জ্ঞানস্বরূপ এবং তাঁহার উপরে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত, এইরূপ জানিবেন। এইরূপ জ্ঞাতৃভাব লোপ পাইলে তিনি সর্ব্বাত্মরূপে নিজেকে অনুভব করিবেন। সুতরাং তাঁহার নিকট সর্ব্ব বস্তু প্রাপ্য হইয়া যাইবে এবং তিনি নিজেকে সুখময় বলিয়া অনুভব করিবেন। এই ভাব দৃঢ় হইলে তাঁহার বিজ্ঞানময়কোষ জিত হইল বুঝিতে হইবে, এবং সুষুপ্তিভাব তিরোহিত হইয়া তাঁহার ব্রহ্মাকারা বৃত্তি অনুক্ষণ প্রবাহিত হইবে, সুতরাং আত্মা বিজ্ঞানময় কোষের পারে ইহা অনুভব করিবেন। এইবার তাঁহার আনন্দময় কোষের অনুভব হইতে আরম্ভ হওয়ায় আত্মার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ দেখিতে পাইবেন কিন্তু সাময়িক ভোক্তৃভাব উদিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বিজ্ঞানময় কোষে লইয়া যাইবে, কারণ এই আনন্দময় কোষ হইতেই জীব ও জগদ্ভাব সমুদিত। বিজ্ঞানময়কোষে গমন-কালীন আনন্দময়কোষের অবস্থা স্মরণপূর্ব্বক, ভোক্তৃভাবে ভোগ্য ও ভোগ অনুভব করিতে হইবে। এইরূপে বিজ্ঞানময়কোষ নিরুদ্ধ হইয়া আনন্দময়কোষে পূর্ণ অবস্থিতি অভ্যাস হইলে ক্রমে স্থূল, সূক্ষ্মাদি দেহ নষ্ট হইয়া একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম অবশিষ্ট রহিবে।

এইরূপ সমাধিলাভের কয়েকটী বিঘ্ন উদয় হয় তাহারা কষায়, বিক্ষেপ রসাস্বাদ ও লয় নামে পরিচিত। তাহাদিগকে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যব

দ্বারা জয় করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ে যত্নের নাম অভ্যাস, তদ্বারা বিক্ষেপ দূরীভূত হইবে।

পর ও অপর ভেদে বৈরাগ্য দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অপর বৈরাগ্য আবার চারিভাগে বিভক্ত। যথা—যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার।

গুরু এবং শাস্ত্রবাক্য দ্বারা জগতের সার এবং অসার পদার্থ নিশ্চয় পূর্ব্বক ভোগত্যাগে যে যত্ন উদিত হয়, তাহার নাম 'যতমান'। ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ ভাবে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি অবধারণ করার নাম 'ব্যতিরেক'। ঐরূপ অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি রোধ করিয়া ইচ্ছামাত্র কোন এক বিষয় মনে অবশিষ্ট থাকিলে তাহাকে 'একেন্দ্রিয়' বলা হয়। যে অবস্থায় কোন বস্তুতেও তৃষ্ণা থাকে না, শুধু প্রসন্নতারূপ বিতৃষ্ণা উদয় হয় তাহাকে 'বশীকার' বৈরাগ্য বলে। চারি প্রকার বৈরাগ্যের পরিপাকাবস্থায় গুণত্রয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণাবশতঃ যে আত্মানাত্মবিবেক উপস্থিত এবং তজ্জনিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় তাহারই নাম 'পরবৈরাগ্য।' এই বৈরাগ্যের বলে বিঘ্নগুলি জিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধনা ও গুরুবাদ।

আমরা এতদূর আলোচনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা কি প্রকারে জীবনে পরিণত করা যায়, তাহা দেখাইলাম। এইবার তাহার পূর্ব্ব সাধনপ্রণালীসম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতেছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে যথা—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৯
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১২

ত্রয়োদশাধ্যায়।

অর্থাৎ "নিজগুণে শ্লাঘাশূন্যতা, দম্ভপরিহার, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা ও আহারসংযম, ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুতে বিরাগ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ দোষের সম্যক্ দর্শন, পুত্রাদিতে প্রীতিবর্জ্জন ও তাহাদের সুখদুঃখে নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা, লাভ বা হানিতে চিত্তের সমতাবস্থা, আমাতে

অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জনস্থানে বাস, জনসঙ্গে বিরাগ, আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা, আত্মা এবং অনাত্ম বস্তুর সম্যক্ জ্ঞানপূর্ব্বক—এবং 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদার্থে বুদ্ধি স্থিরতা, এই সমুদয় জ্ঞানের সাধন। ইহা ভিন্ন সমুদয় অজ্ঞানের জনক।" এই বিংশতি প্রকার গুণ যাঁহার জীবনে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাকেই জ্ঞান সাধনসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। যদি কাহাকেও এই গীতাকথিত জ্ঞানের সাধনশূন্য দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ তিনি লোকের নিকট নিজেকে জ্ঞানী বলেন তাঁহাকে জ্ঞানবন্ধু বলিয়া জানিতে হইবে। জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধন সমুদয় লাভ করিতে হইলে জ্ঞানীগুরু আশ্রয় করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উপনিষদ্ বলেন,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'--

"তাঁহাকে জানিবার মিমিত্ত শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রুতির রহস্য যিনি সম্যক্ জানেন এবং যিনি ব্রহ্মকে আত্মরূপে জ্ঞাত আছেন এমন গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া যাইতে হইবে।" গীতা বলেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" ৩৫।৪র্থ অঃ

অর্থাৎ "জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট যাইয়া প্রণিপাত, সম্যক্‌রূপ প্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা সেই জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে।"

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—ছান্দোগ্য ৬।১৪।২

"যাঁহার গুরু আছেন তিনিই জানেন।" অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট ব্যক্তিই তাঁহাকে জানিতে পারে।

"আচার্য্যাদৈব বিদ্যা বিদিত্বা"—ছা ৪।৯।৩

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

অর্থাৎ "যাঁহার দেবতা ও গুরুতে পরা ভক্তি আছে তাঁহারই নিকট মহাত্মগণকথিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ হয়।" ভগবান্ বলিতেছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

অর্থাৎ "আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে সুতরাং তাঁহার কোনরূপ অবমাননা করিবে না, মানুষদেহধারী হইলেও তাহাকে প্রাকৃত মানবের মত মনে করিবে না, কারণ তিনি সর্ব্বদেবময়" অর্থাৎ সমস্ত দেবতাতত্ত্ব তাঁহা হইতে প্রকট হয়। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হ'য়ে সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জল করয়ে সিঞ্চন॥"

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ-প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রই একবাক্যে গুরুবাদ স্বীকার করিতেছেন এবং গুরু ভিন্ন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গুরুকরণ একটী ভীষণ সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি স্বয়ং ধীর এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী মানবগণ স্থির করিয়াছেন যে,

(১) ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ গুরু হইতে পারেন না। মনুষ্যকে গুরু বলা অতিপাতক মধ্যে গণ্য এবং মনুষ্য পূজার নামান্তর মাত্র। অভ্রান্ত গুরুবাদ ঘৃণ্য ইত্যাদি।

(২) কতকগুলি লোক বলিতেছেন যে ভগবানের কিছু করার ক্ষমতা নাই এবং মুক্তিপর্য্যন্তও গুরুর কৃপায় হইবে অর্থাৎ গুরুই মুক্তিদাতা।

যখন ভগবানের ইচ্ছা হয়, তখন তিনি নরদেহে অবতীর্ণ হইয়া গুরুরূপে পাপী-তাপীদিগকে স্বীয় করুণায় উদ্ধার করিয়া লইয়া যান।

(৩) সর্ব্বজাতীয় লোকই গুরু হইতে পারে।

(৪) কেহ বলিতেছেন, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুক্তি অনিবার্য্য, আর সাধন ভজনের, কোন প্রয়োজন নাই। মন্ত্রশক্তিয় সহায়তায় বিনা সাধনায় চতুর্ব্বর্গফলের পর পারে অবস্থিত যে প্রেম, তাহা লাভ করা অতি সহজ। সুতরাং তপস্যাদির কোন প্রয়োজন নাই।

(৫) কেহ বলিতেছেন গুরুই উদ্ধারকর্ত্তা সুতরাং তাঁহারই নাম গ্রহণ কর।

(৬) কেহ বলিতেছেন দীক্ষাগ্রহণ তান্ত্রিকতা, সুতরাং তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। ব্যাকুলতাসহকারে নামগ্রহণ করিলেই তিনি উদ্ধার করিয়া থাকেন।

(৭) কেহ বলিতেছেন বংশপরম্পরায় যিনি গুরুপদে বৃত হইয়াছেন তিনিই গুরু। তাঁহাকে ত্যাগ করিলে ইহকাল, পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়।

(৮) কেহ বলিতেছেন যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ তাঁহারাই গুরুর যোগ্য। অন্য কুলগুরু প্রভৃতির দ্বারা কোন প্রকার উন্নতিরই আশা নাই।

এরূপ পরস্পর বিবদমান অনেকগুলি মত বর্ত্তমান সময়ে দেশে উপস্থিত হইয়া ভয়ানক অশান্তির অনল প্রজ্বালিত করিয়াছে, তজ্জন্য শাস্ত্রানুসারে প্রকৃত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতেছে।

(১) যাঁহারা গুরুবাদ স্বীকার করেন না তাঁহারা উভয়কুল ভ্রষ্ট, তাঁহারা শাস্ত্র বা মহাপুরুষ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। সহজ সরল বুদ্ধিতে যাহা সত্য মনে হয় তাহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং

তাঁহাদের মত অতি হেয় এবং পরিত্যাজ্য। কারণ, জন্ম হইতে মরণ-পর্য্যন্ত কাহারও বুদ্ধি এক ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে এবং স্থির ছিল বা আছে এরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে বা লৌকিক দৃষ্টান্তে পাওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তেই জন্মান্তরীণ সংস্কার, শিক্ষা এবং সংসর্গগুণে পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর নিরূপণ করিতে চান, তাঁহারা যে পথভ্রষ্ট তাহা কাহাকেও বলিতে হয় না। এমন কি ক, খ, শিখিতে হইলেও বিনা গুরুর সাহায্যে শিক্ষার উপায় নাই। অথচ তাঁহারা বলেন গুরুকরণ অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান কাহাকে বলে? বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া নিত্য নূতন মত গ্রহণ করিতেছেন এবং পরিত্যাগ করিতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও তাঁহারা বলিতেন, কতকগুলি মূল ধাতু রহিয়াছে, যাহার পরিবর্ত্তন কখনও হয় না, আবার এখন তাঁহাদেরই পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে একই বস্তু নানারূপে রূপান্তরিত হইতেছে। পারদ, সোনায় পরিণত হইয়াই তাঁহাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং সেই বিজ্ঞানবিদের বচন যাঁহাদের উপজীব্য, তাঁহাদের মত কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? জড়-বিজ্ঞান যেরূপ কার্য্যকারণ দেখিয়া অনুমিত হয় এবং পরিশেষে সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, অধ্যাত্মবিজ্ঞান তাহা নহে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানানু-শীলন করিতে হইলে মনের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিনিরোধ করিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শান্ত করিতে হয়। পরে যাহা অনুভূত হয়, তাহাই সত্য বলিয়া মান্য হয়। তথাকথিত বিজ্ঞানবাদিগণ এতাদৃশ অলৌকিক সত্যের ছায়াও বুঝিতে সমর্থ নহেন, সুতরাং তাঁহাদের শিষ্যগণ গুরুকরণ স্বীকার করিবেন কি প্রকারে? বিজ্ঞানবিদ্‌গণও পূর্ব্ব প্রচারিত সত্যের উপর চিন্তার দ্বারা নূতন কিছু আবিষ্কার করিতেছেন। সেই চিন্তারাশিই তাঁহাদের গুরুস্থানীয় সুতরাং গুরুবাদ অভ্রান্ত। মানুষ চিন্তা করে, মানুষ দ্বারাই

সমুদয় ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং মানুষ ভিন্ন আর কেহ গুরু হইতে পারে না। আর যদি গুরুর প্রতি সম্মান করা প্রয়োজনীয় হয়, তবে মানুষভিন্ন আর কাহাকে করিবে? নিরাকার ভগবান হইতে পারে না, বা নিরাকার বস্তু সর্ব্ব প্রকার উপাসনার বাহিরে। যদি শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায়, তবেই গুরু স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী এই গুরু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—শিক্ষা এবং দীক্ষা গুরু। যাঁহার নিকট হইতে কোন বিষয় শিক্ষা করা যায় তাঁহাকেই শিক্ষাগুরু বলা যায়; কিন্তু দীক্ষা শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ অন্য বস্তুকে বুঝায়, তজ্জন্য সে শব্দ প্রতিপাদ্য অর্থ বুঝিতে হইলে সেই শাস্ত্রের মীমাংসিত সত্যকে বুঝিতে হইবে। বেদানুযায়ী দীক্ষা শব্দ দ্বারা নানা প্রকার ক্রিয়াসাধ্য অনুষ্ঠানসমূহ বুঝা যায়। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে হইলে তৎকার্য্যে অভিজ্ঞ গুরুর নিকট অনুষ্ঠানগুলি শিক্ষা করিতে হয়। তাহাকে দীক্ষা বলা যায়। যেমন রাজা যুধিষ্ঠির মুনিবর ধৌম্যের নিকট অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে দেবতাবিশেষের দর্শন নিমিত্ত মন্ত্রাদি গ্রহণ করাকে দীক্ষা বলা হয়। যথা:—

"দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥
দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥
অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥"

হরিভক্তি বিলাস

"যদ্দ্বারা দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পাপের ক্ষয় হয়, তন্ত্রবিৎ মুনিগণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। জপ, তপঃ সকলেরই মূল দীক্ষা। যে কোন আশ্রমেই থাকুক না কেন, দীক্ষা ভিন্ন সমুদয় নিষ্ফল। অদীক্ষিত ব্যক্তি জপ, পূজাদি যাহাই করুক না কেন, প্রস্তরে বীজ-বপনের ন্যায় তাহার সমস্তই নিষ্ফল।"

এইত শাস্ত্রের কথা। প্রথমেই বলিয়াছি, যে বস্তু লাভ করিতে হইবে, তাহার জন্য উপযুক্ত অনুষ্ঠান না করিলে পাইবার কোন আশাই নাই। সুতরাং যাহারা তাহাতে পরাঙ্মুখ, তাহাদের কোন উপায়ই নাই। জড় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি দীক্ষা এবং গুরু অযৌক্তিক হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান এক বস্তু নহে। শাস্ত্র গুরুর প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্যক্‌রূপ বোধের নিমিত্ত আরও কিছু বলা যাইতেছে। যথা—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে,
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-,
ন্নিশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"—ভাগবত ১।১১।২৯

"অর্থাৎ ধীর ব্যক্তি বহুজন্মান্তে সুদুর্ল্লভ, পুরুষার্থপ্রদ, অনিত্য মানব-দেহ লাভ করিয়া যাবৎ মৃত্যু না আগত হয়, তাবৎ সর্ব্বদা মোক্ষলাভার্থ যত্নবান্ হইবেন, নতুবা পুনরায় জন্ম-মরণ-প্রবাহে পতিত হইতে হইবে। কারণ, মুক্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিষয় সকল যোনিতেই অনুভূত হয়।"

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"
—ভাগবত ১১।২০।১৭

"ভগবান্ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অনুকূল বায়ুরূপ আমাকর্ত্তৃক প্রেরিত, ফলভোগের মূল যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত সুদুর্লভ মানবদেহরূপ তরণী লাভ করিয়াও, সংসারসাগর উত্তীর্ণ না হয়, তাহাকেই আত্মঘাতী বলা হয়।"

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"—ভাগবত, ১১।৩।২১

"সুতরাং যিনি মোক্ষরূপ পরম কল্যাণের কামনা করেন, তিনি বেদাখ্য শব্দব্রহ্মের ন্যায়তঃ ব্যাখ্যায় পারদর্শী এবং পরব্রহ্মে একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণ গুরুর আশ্রয় লইবেন।"

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ॥—ভাগবত ১০।৮৭।৩৩

"হে অজ! যাহারা ইহলোকে শ্রীগুরুর চরণ পরিহারপূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণসমূহকে বশীভূত করিয়া, অদমিত মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে যত্নবান্ হয়, সেই সকল ব্যক্তি কর্ণধারহীন তরণীস্থিত বণিগ্‌জনসমূহের জলধিগর্ভে পতনের ন্যায়, উপায়ক্লিষ্ট ও বহুদুঃখাকুল হইয়া ভবসাগরে নিপতিত হয়।"

যাঁহারা এই সমুদয় দেখিয়াও গুরুবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের অস্তিত্বও আমরা মানিতে পরাঙ্মুখ। যদি কেহ বলেন, ভ্রমপ্রমাদ মনুষ্য-মাত্রেরই হইয়া থাকে, সুতরাং গুরুর ভ্রান্তিতে শিষ্যের নাশ অবশ্যম্ভাবী; আমরা তাহা স্বীকার করিতে অসমর্থ। কারণ, পরীক্ষাদ্বারা পরস্পরের যোগ্যতা অনুসন্ধান করিয়া গুরু বা শিষ্যরূপে বরণ করা কর্ত্তব্য।

যথা মন্ত্রমুক্তাবল্যাং--

"তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাত্বাঽন্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥"

"একবর্ষ সহবাস দ্বারা পরস্পরের স্বভাব বিদিত হইলে, উভয়ের গুরুতা এবং শিষ্যতা পরিজ্ঞাত হইতে পারে। অন্যরূপে জানিতে পারা যায় না, ইহা স্থির।" সুতরাং গুরু-শিষ্য-ব্যবহার অসম্ভব নহে।

"নাসংবৎসরবাসিনে দেয়ম্।"

—শ্রুতি।

"সংবৎসর বাস ভিন্ন দীক্ষা দিবেন না।"

"সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥
রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥"

—তন্ত্রসারধৃতবচনম্।

"সদ্‌গুরু এক বৎসর যাবৎ নিজ আশ্রিত শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন। অমাত্যের দোষসমূহ যেরূপ নৃপতিতে এবং ভার্য্যাকৃত পাতক যেমন নিজ পতিতে উপগত হয়, সেইরূপ গুরুদেবও শিষ্যার্জ্জিত পাতকপুঞ্জ নিশ্চিত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

এই সমুদয় না দেখিয়া গুরু-শিষ্যকরণের ফল সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষই গুরু হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি শাস্ত্র যেরূপ ব্যবহার করিতে বলেন, তাহাতে মনুষ্য পূজ্যই হউন বা যাহা কিছুই হউন, করিতেই হইবে। যথা—

"উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ॥

নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রমেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন॥

—কূর্ম্মপুরাণ, ব্যাসগীতা।

"নিরন্তর গুরুর নিমিত্ত জলপূর্ণ কলস, কুশ এবং সমিধ্ আহরণ করিবে; সর্ব্বদা অঙ্গের এবং বস্ত্রের মার্জ্জন ও লেপন করিবে। শ্রীগুরুর নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, আসন, ছায়া, ও ভোজনাধার-ত্রিপদিকা লঙ্ঘন করিবে না।"

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকম্।
স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥

গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, পাদপীঠ, স্নানজল ও ছায়া কখনও লঙ্ঘন করিবে না।

"গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ॥"—দেবী-আগম।

গুরুদেবের সম্মুখে পৃথক্ পূজা ও অভেদোক্তি বর্জ্জন করিবে ও তাঁহার সম্মুখে মন্ত্রদান, ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে না।

"যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥"—নারদ।

যেখানে যেখানে গুরুর দর্শন হইবে, সেই সেই স্থলে করজোড়ে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে দণ্ডবৎ হইবে।

"নোদাহরেৎ গুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতম্॥
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্ বৃত্তিমাচরেৎ।
ন চাবিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥"—মনুস্মৃতি।

পরোক্ষেও গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবে না ও শ্রীগুরুর গতি, স্বর এবং চেষ্টার অনুকরণ করিবে না। শ্রীগুরুর গুরুদেব সন্নিহিত হইলে তাঁহার প্রতি গুরুবৎ আচরণ করিবে। গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত না হইলে নিজ জনক-জননীপ্রভৃতি গুরুগণকেও প্রণাম করিবে না।”

গুরুর প্রতি শিষ্যের এইগুলি নিত্য কর্ত্তব্য। সুতরাং গুরুতা বা শিষ্যতা স্বীকার করিলেই এইগুলিও মানিতে হইবে।

(২) গুরুভিন্ন মুক্তিদাতা কেহ নাই, ইহা অপসিদ্ধান্ত। পরোক্ষরূপে গুরু মুক্তিদাতা হইতে পারেন, কিন্তু সাক্ষাৎরূপে মুক্তিদাতৃত্ব কাহারও নাই। জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়, সুতরাং যিনি জ্ঞানদানের সহায়তা করেন, তাঁহাকেও তদ্রূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ, উহা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং গুরু প্রত্যক্ষ মুক্তিদাতা হইতে পারেন না। ভগবান্ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে তিনি অবতীর্ণ হইয়া মন্ত্র দিতে আরম্ভ করেন, ইহা বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয় বা তাঁহার স্বরূপের হানি হয়। ষড়ৈশ্বর্য্য যাঁহাতে আছে, তিনিই ভগবান্, অথবা জগতের উৎপত্তি, বিনাশ, প্রাণিগণের গতি, আগতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে যিনি জানেন, তিনিই ভগবান্।

সম্প্রদায়-বিশেষে ভগবত্তা এক এক জনের স্কন্ধে আরোপিত হয়। যাই হোক, তাঁহার শরীরধারণ করিয়া মন্ত্রদান করার কথা কোন শাস্ত্রে নাই বা অশরীরিরূপেও তাহা কোন কালেই হয় নাই। এখন যদি হয়, তবে তাহা প্রেতের কারখানা বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, মুক্ত পুরুষের কোন প্রকার বাসনা থাকে না। শাস্ত্র বলেন,—

“মন্ত্রপ্রদানকালে তু মানুষো নগনন্দিনি !
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালো মহেশ্বরি ॥”

—যোগিনীতন্ত্র।

"মন্ত্রদানকালে মানুষের শরীরে মহাকাল আবিষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ, তিনিই সকল গুরুর গুরু।" এইরূপ অবস্থায় সকল গুরুই ভগবানের প্রতীক, সুতরাং তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের দাবী করিবার কিছু নাই বা সদ্‌গুরু হইয়া মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই।

(৩) শ্রুতি বা স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহাকেও আচার্য্যের আসন দেওয়া হয় নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও তাহা কথিত হয় না। যথা—

"ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয়-সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষিচিতঃ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি॥
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
স্বজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে!
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা॥"

—নারদপঞ্চরাত্র।

"সর্ব্বকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাবতীয় বর্ণের প্রতিই মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। হে দ্বিজসত্তম! ব্রাহ্মণগুরুর একান্ত অভাব হইলে শান্তাত্মা, সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাবিধানবিৎ, শাস্ত্রবেত্তা, সৎক্রিয়াপরায়ণ, সিদ্ধিত্রয়সমন্বিত (মন্ত্র, গুরু ও দেবসাধনে অভিজ্ঞ) ক্ষত্রিয়কে আচার্য্যত্বে অভিষিক্ত করিবে। ক্ষত্রিয় গুরু হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই তিন জাতিকে মন্ত্র দিতে পারেন। যদি ক্ষত্রিয়ের অভাব হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গুণসম্পন্ন বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিদ্বয়কে দীক্ষা দিতে পারেন। ঐরূপ গুণশালী শূদ্রও স্বজাতীয় শূদ্রের প্রতি মন্ত্র-

দানাদিরূপ অনুগ্রহ ও অভিষেক করিতে পারেন।" ইহা ব্রাহ্মণগুরুর সর্ব্বথা অভাব হইলে বুঝিতে হইবে। কারণ, অন্য কোন বর্ণই গুরু হইতে পারেন না।

"বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথ বান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্র নাশঃ সাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥"

—নারদপঞ্চরাত্র।

"স্বদেশে বা অন্যত্র বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু বর্ত্তমান থাকিতে যে যথা তথা উহার বিপরীতাচরণ করে, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক—উভয় প্রকার অর্থের হানি হয়। অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধিই আচরণীয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা প্রতিলোমানুসারে দীক্ষা প্রদান করিবে না, অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণকে দীক্ষা দিবে না।" মনুস্মৃতি বলেন—

"শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥"

শ্রদ্ধাযুক্তঃ শুভাং দৃষ্টশক্তিং গারুড়াদিবিদ্যাম্, অবরাচ্ছূদ্রাদপি গৃহ্ণীয়াৎ, অন্ত্যশ্চাণ্ডালো জাতিস্মরাদের্বিহিতযোগপ্রকর্ষাদ্ দুষ্কৃতশেষভোগার্থমবাপ্ত-চণ্ডালজন্মতঃ পরং ধর্ম্মং মোক্ষোপায়ম্ আত্মজ্ঞানম্ আদদীত।"

—কুল্লুকভট্টটীকা।

"শূদ্রপ্রভৃতিরও নিকট গারুড়াদিবিদ্যা শিক্ষা করিবে। যিনি দুষ্কৃত-শেষ ভোগের নিমিত্ত জাতিস্মর হইয়াও নীচ চণ্ডালগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এমন যোগিশ্রেষ্ঠের নিকট মোক্ষোপায় আত্মজ্ঞান গ্রহণ করিবে।"

অনেকে, এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটই দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারা যায়, এরূপ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কারণ, জাতিস্মর ব্যক্তি দুর্লভ। ব্রাহ্মণভিন্ন কাহারও নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে চণ্ডালসংসর্গজনিত পাতক অবশ্যম্ভাবী। যোগীর চণ্ডালগৃহে জন্ম অসম্ভব নহে। কারণ, প্রারব্ধক্ষয়ের নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দেহই আশ্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতেও মন্ত্র-গ্রহণের কথা উল্লিখিত নাই।

(৪) ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সদ্‌গুরুও বর্ষপরিমিতকাল শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা দান করিবেন, নতুবা শিষ্য পাপ অর্জ্জন করিলে, তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং যাঁহারা দর্শনমাত্রেই শিষ্য করিয়া থাকেন এবং দৈনন্দিন শিষ্যসংগ্রহ করাই যাঁহাদের একমাত্র কার্য্য, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর সদ্‌গুরু, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের নিজেদের গতি মৃত্যুর পর প্রেতলোক এবং শিষ্যগণও গুরুর সহিত বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক অনন্তকাল মুক্তিরস আস্বাদন করিবেন, সন্দেহ নাই। মন্ত্রশক্তির বলে সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, এইরূপ তাঁহারা বলেন। কিন্তু বিনা তপস্যায় কাহারও কিছু হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ ইতিহাস বা পুরাণে নাই। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগে কেহ কখনও এইরূপ কথা বলেও নাই ; এরূপ ঘটনা হওয়া তো দূরের কথা। কলিযুগে যাঁহারা এরূপ বলিতেছেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা কলির দ্বারা আবিষ্ট।

(৫) গুরু উদ্ধার করেন না, উদ্ধারের কারণ হন। তজ্জন্য তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা বলা হয়, কিন্তু তাঁহার নাম জপ করিলে উদ্ধার হইবে, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ। গুরুবীজ ধ্যান দ্বারা পরম গুরুর কৃপা পাওয়া যাইতে পারে, ইহা শাস্ত্রের উক্তি। তজ্জন্য পূর্ব্বে গুরুগণ শিষ্যকে বীজ ধ্যান

করিতে আদেশ করিতেন। আধুনিক গুরুগণ মানের লাঘব হয় বলিয়া, তাহা করিতে নারাজ। গুরু যদি মুক্ত পুরুষ হন, তাঁহার চিত্তধ্যান দ্বারা শিষ্য সমাধিলাভ করিতে পারে, ইহা পাতঞ্জলসূত্রে লিখিত আছে যথা—

"বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।"

"নিস্পৃহের সংস্পর্শে পড়িলে তদীয় চিত্তে চিত্ত সংলগ্ন হইলে মনের মলিনতা কাটিবে।"

(৬) দীক্ষাগ্রহণ তন্ত্রমতে হইলেও, তাহা করণীয়। কারণ, যেরূপেই হউক না, দীক্ষাভিন্ন কাহারও কিছু হয় নাই, দীক্ষার মন্ত্রাদি সকলই তন্ত্রশাস্ত্রপ্রতিপাদিত। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, সমুদয়ই তন্ত্রশাস্ত্রানুগামী; বর্ত্তমান সময়ে কৃতজ্ঞতা-স্বীকার মহাপাপ, তজ্জন্যই এইরূপ ঢেউ উঠিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ অথবা দেবতাদর্শন—সমুদয়ই দীক্ষাসাপেক্ষ, কেবল অনুষ্ঠানের প্রকারান্তর থাকিতে পারে বা অন্য নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শাস্ত্রবিধি-শূন্য হইয়া নাম করিলে বা হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে পারিলে, যদি কিছু হইত, তাহা হইলে সাধারণের এই দুর্দ্দশা দেখিতে হইত না। অশাস্ত্রীয় যথেচ্ছাচার, ধর্ম্মের ভাণে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। পতিতোদ্ধারের জন্য যে কোন উপায়ে নামগ্রহণের উপদেশ আছে, তাহাও কাহারও দ্বারা উপদিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা নামগুলি অক্ষরভিন্ন আর কিছুই নহে।

(৭) কুলগুরু ত্যাজ্য নহে। কারণ, কুলগুরু কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরণের সহায়তা করিয়া থাকেন। পৈতৃক গুরুবংশ যদি না থাকে, অথবা কুলগুরু পাতিত্যাদি-দোষযুক্ত হন, তবেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু গ্রহণ করা যায়। এতদ্ভিন্ন উন্নত বিষয়ের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শরণ লইতে পারা যায়। যাঁহাদের তান্ত্রিকমতে গুরুকরণ

হইয়া থাকে, তাঁহারা পঞ্চ উপাসনার কোন একটী উপাসনায় ব্রতী হন। তাঁহাদের মন্ত্রাদি দুই রূপে সম্পাদিত হয়। প্রথম জাতকের অনুকূল রাশি, চক্র বিচার করত পিতৃ-পিতামহাদির ধারা অনুযায়ী, অথবা স্বীয় প্রকৃতির অনুকূল। সুতরাং গুরুর মন্ত্রাদি নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিদ্যা থাকিলেই যথেষ্ট। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশূন্যতা হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক ইত্যাদি সংস্কারের অভিলাষী হন, তাঁহারা, মন্ত্রদাতা গুরু অসমর্থ হইলে, অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট তত্তৎসংস্কার গ্রহণ করিবেন। তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। যথা—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

অযোগ্য গুরু হইলেই সর্ব্বত্র সঙ্কট। উপনিষৎ বলেন,—

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানাঃ।"
"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

"এই আত্মা হীন ব্যক্তির দ্বারা কথিত হইলে বিজ্ঞাত হন না। কারণ, বহুপ্রকার চিন্তার দ্বারাও তাঁহাকে জানিতে পারা সুকঠিন।" "স্বয়ং অবিদ্যাগ্রস্ত অথচ নিজেকে ধীর এবং পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, এমন ব্যক্তি অন্ধদ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ সাধন করে।" ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট জ্ঞান উপদেশ গ্রহণ অনুচিত। তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী নিম্নলিখিত গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই গুরুর উপযুক্ত—

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দ্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥

আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহ-শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥" তন্ত্রসার।

"যাঁহার অন্তঃকরণ শান্ত, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, যিনি বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, যিনি শুচি, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান্, যিনি আশ্রমী (গৃহস্থ), যিনি তন্ত্রমন্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন এবং যিনি অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ করিতে সমর্থ, তিনি গুরু বলিয়া অভিহিত।" নিম্নলিখিত গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুনামের অযোগ্য,—

"শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতশ্চাধিকাঙ্গকঃ॥
হীনাঙ্গী কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দ্দোষৈর্বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥"—তন্ত্রসার।

"শ্বেতকুষ্ঠ অথবা গলৎকুষ্ঠযুক্ত, অন্ধ এবং বামন, কুনখী, শ্যাবদন্ত, স্ত্রৈণ, অধিকাঙ্গবিশিষ্ট অথবা হীনাঙ্গ, কপটী, চিররোগী, বহুভোজনশীল, মিথ্যাবাদী এই সমুদয়দোষযুক্ত ব্যক্তি গুরুপদে বৃত হইতে পারেন না।" এতদ্ভিন্ন গুরু উৎপথগামী হইলে, তাঁহার সঙ্গ না করিয়া দূরে অবস্থান করিতে হয়। প্রথমেই ভ্রান্তিক্রমে যদি অনুপযুক্ত ব্যক্তি গ্রহণ করা হয়, তবে অন্য জ্ঞানলাভের জন্য অন্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অসংযমী ও অজ্ঞানীর (মন্ত্রতন্ত্রাদি অনভিজ্ঞ) নিকট উপদেশ অতি ভয়াবহ, কারণ তিনি নিজে কিছু জানেন না, অন্যকে কি শিক্ষা দিবেন? তাঁহার শিক্ষায় সংযমহীনতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা মিশ্রিত হইয়া, সাধককে প্রতিপদেই বিপরীত পথে চালিত করিতে পারে। তাহার ফলে হঠাৎ উৎকট ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া, দেশের এবং ব্যক্তিগত প্রত্যেকেরই সর্ব্বনাশ সাধন করে। যাঁহা হইতে মন্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়, তিনিই তন্ত্র ও বেদশাস্ত্রে গুরু বলিয়া গণনীয়। তাঁহার উপদেশে এমন কিছু পাওয়া

যায়, যাহাতে শিষ্যের জীবনের গতি গুরুর ভাবে ভাবিত হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। এই ভাবলাভই শিষ্যত্বগ্রহণের একমাত্র কারণ, যাহার প্রভাবে ভাবের পরিপক্কাবস্থায় শিষ্য ভাবাতীত হইয়া ব্রহ্মপদবীতে আরূঢ় হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়, ইহার অত্যন্ত ব্যভিচার হওয়ায় হঠাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া যাইতেছে। এই ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মোহ বা মায়া কিছুই ঘুচিতেছে না, তাই মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মজ্ঞান বিনু নারীনর কহহিঁ ন দুসরি বাত।
কৌড়ী লাগি লোভবশ করহি বিপ্র গুরুঘাত॥" রামায়ণ।

অর্থাৎ "ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন নর, নারী কিছুই আলোচনা করে না, কিন্তু একটী কাণাকড়ির লোভে ব্রাহ্মণ বা গুরুহত্যা করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না।"

গৃহস্থের সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা লওয়া শাস্ত্রসঙ্গত নহে। শাস্ত্র বলেন—

"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা সা ন কল্যাণদায়িকা॥" গণেশবিমর্ষিণী।

অর্থাৎ সন্ন্যাসী, পিতা, বনবাসী বা উদাসীনের নিকট গৃহীত দীক্ষা কল্যাণকর নহে। শাস্ত্রে আশ্রমভেদে দীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যথা—

"উদাসীনো হ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥" কুলচূড়ামণি।

অর্থাৎ উদাসীন উদাসীনের, বনবাসী বনবাসীর এবং যতি যতির গুরু হইবেন। সাধারণ দৃষ্টিতে শাস্ত্রের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। সন্ন্যাসীর উপদেশ ত্যাগ-বৈরাগ্যপূর্ণ, তদনুযায়ী চলিলে বেশী দিন ধাঁধার সংসার চলে না। গৃহস্থ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করে; তাহার ভিতরে বৈরাগ্য আসিলে তেমন শান্তির সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব,
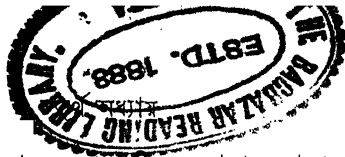
সুতরাং ধন ও ঐশ্বর্য্যহীনতা অবশ্যম্ভাবী। তাহা ছাড়া সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থোচিত আচারনিষ্ঠাশূন্য হওয়াতে গৃহিধর্ম্মের পক্ষে বিশেষ হানিকর হয়। তজ্জন্য শাস্ত্রে গৃহীকে অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু যিনি জ্ঞান, ভক্তির কাঙ্গাল এবং মোক্ষপথের যাত্রী, তাঁহার জন্য শাস্ত্র সন্ন্যাসীর নিকটও দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা—

"তীর্থাচারযুতো মন্ত্রী জ্ঞানবান্ সুসমাহিতঃ।
নিত্যনিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যাদ্ভৌতিকোঽপি চ ॥"

শক্তিযামলে।

অর্থাৎ "তীর্থাচারযুক্ত, মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী সংযতেন্দ্রিয়, নিষ্ঠাবান্ যতিকে গুরু করা যাইতে পারে।" অথবা উক্তলক্ষণসম্পন্ন সন্ন্যাসী গুরুর নিকট সন্ন্যাসী শিষ্য দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু আজকাল সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে এবং শাস্ত্র ও সদাচারভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে। তজ্জন্য মানব-মাত্রেরই বিচারপূর্ব্বক গুরুগ্রহণ করা উচিত। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেই জাতি ঘুচিয়া যায় না, পরমহংসাবস্থায় তাহা সম্ভব। কিন্তু তাহা দেবতারও দুর্ল্লভ।

(৮) সিদ্ধ পুরুষ শিষ্য করিতে চান না, তাঁহার নিকট পৌঁছিতে হইলে, তাঁহাকে চিনিতে হইলেও তজ্জাতীয় গুণে গুণী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ পাইয়াছেন বা চান, তাঁহারা নিজেরা কতটা উপযুক্ত একবার চিন্তা করিয়াছেন কি? শিষ্যের লক্ষণ দেখিলেই চক্ষুঃ স্থির হইবে যথা,—

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং—

"শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনয়ী প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥
কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতা-প্রবণঃ কায়মনো-বাগ্‌ভির্দিবানিশম্॥
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদি-লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥"

"শিষ্য শুদ্ধকুলসম্ভূত, শ্রীমান্, বিনয়ী, প্রিয়দর্শন, সত্যভাষী, পবিত্র-চরিত, মহামতি, দম্ভহীন, কামক্রোধশূন্য, গুরুপাদদ্বয়ে ভক্ত, কায়মনো-বাক্যে অহর্নিশ দেবতার প্রতি অনুরক্ত, নীরোগ, অশেষ-পাতকজয়ী, শ্রদ্ধাবান্, নিত্য দেবতা, বিপ্র ও পিতৃগণের পূজায় রত, যুবা, নিখিল-ইন্দ্রিয়বিজয়ী ও করুণানিধান হইবেন। উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত শিষ্যই দীক্ষাধিকারী হইয়া থাকেন।

যাঁহারা শুধু গুরুর স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি পাইতে চান, অথবা নিজেকে সদ্‌গুরুর শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, একবার তাঁহারা নিজেদের অন্তঃকরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন—তাঁহারা আত্মপ্রতারক কিনা? শতকরা নিরানব্বই জন বাদ যাইয়া একজনও যদি অবশিষ্ট থাকেন, তবেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যাইবে। এই সব দেখিয়া আমরা বলি, সিদ্ধ পুরুষ ভিন্ন পরম্পরাক্রমে উপদেশপ্রাপ্ত সাধক এবং ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকও গুরু হইতে পারেন, বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত সদাচারসম্পন্ন অল্পবিত্ত ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন, নতুবা সমাজ এবং জাতি এককালে উৎসন্ন যাইবে। স্বকুলানুযায়ী সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া, যাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চতর

জ্ঞানলাভের অভিলাষী হন, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। গুরুকুলেরও অসন্তুষ্ট হইবার কারণ নাই, শিষ্যদেরও নাচিবার সুযোগ নাই। স্বীয় স্বীয় পদানুযায়ী সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে গুরুকরণ সম্বন্ধে যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বংশানুক্রমিক ধারায় যাঁহারা গুরুগিরী করিয়া আসিতেছেন, অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের বংশ নির্ব্বাণোন্মুখ। যাঁহারা অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ ইংরাজীবিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়া পিতৃপুরুষোচিত জপ তপঃ বিসর্জ্জন দিয়া নব্য সভ্যের দলে যোগদানপূর্ব্বক, মানব-জনমের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। কেহ বা বিদ্যাহীন ও সাধনশূন্য, কেহ বা বিদ্যাভিমানী ও ভজনবাদী। সুতরাং যাঁহারা শিষ্য হইবেন, তাঁহারা স্থির করিলেন—এই সব অপদার্থ লোকের আশ্রয় লওয়া বিড়ম্বনা। অতএব উপযুক্ত গুরু নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

অপর কতকগুলি মহাপণ্ডিতেরা গুরুবাদকে মনুষ্যপূজার নামান্তর বলিয়া, সমাজ হইতে এইরূপ প্রথা যাহাতে চিরতরে দূর করিতে পারা যায়, তাহার নিমিত্ত কটিবদ্ধ হইয়াছেন। এই দুঃসময়ে এই সব সুযোগ অবলম্বন করিয়া কতকগুলি অবিবাহিত স্বামী বা ব্রহ্মচারীর দল, কতকগুলি অবতারের পোষাকপরা ধূর্ত্তদল, এবং কতকগুলি নির্ব্বিকল্প সমাধির পর পারে অবস্থিত গুরুদল, দেশোদ্ধার এবং পতিতোদ্ধাররূপ মহাব্রত লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বামীর ভালবাসা অতি হেয় পার্থিব, বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে অহৈতুক প্রেমের চরম পরিণামে কি পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহাদের উপদেশমাত্রেই লাভ হইবে বলিতেছেন।

এইরূপ মতবাদ আড়কাটি দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া, তাঁহারা ভবপারে যাইবার কুলী সংগ্রহ করিতেছেন এবং বিনা সাধন, ভজনে শুধু সেই সব গুরুদলের আশ্রয় গ্রহণমাত্রেই, বেদ যাঁহার অস্তিত্ব জানে না, ঋষি মুনিগণ যে পদ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না, আজ পর্য্যন্ত যাহা কেহ কখনও শুনে নাই বা দেখে নাই এমন যে গুপ্ত অমৃতধাম, তাহার দরজা খুলিয়া দিতেছেন। আর সেই অমৃত-পিপাসু যাত্রীগণ স্বল্প সময়েই কৃষ্ণ, কালীপ্রভৃতি পৌরাণিক দেবতাগণ দর্শন করিয়া পরপারে অবহেলে চলিয়া যাইতেছেন। কেহ বা মন্ত্রশক্তির অমোঘ কৃপায়, আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামপ্রভৃতি অতি কষ্টসাধ্য ক্রিয়াসমূহ আপনা আপনি নিজ শরীরে উপলব্ধি করিতেছেন। কেহ বা সূক্ষ্ম শরীরে যাতায়াত করিয়া নিজ ভক্তবৃন্দের নয়নসমক্ষে উপনীত হইয়া তাঁহাদের তাপিত প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করিতেছেন। কেহ বা প্রত্যক্ষ অবতীর্ণ হইয়া মন্ত্রাদি প্রদান করিতেছেন। কেহ বা শিষ্যের আকাঙ্ক্ষিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা বা ভোগোপকরণসমীপে উপনীত হইয়া ভোগ করিতেছেন। আবার কেহ বা জ্ঞাননয়ন উদ্ঘাটিত করত সকলজীবনাধার প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্য্য-নারায়ণকে স্বীয় ক্ষমতায় আবদ্ধ করিয়া ফলমূলাদি উৎকৃষ্ট পদার্থসমূহ নিমিষেই উৎপাদন করিতেছেন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় আর চিন্তা নাই। এইবার কলিহত জীবগণ সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। সত্যের বিমল আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইল। আর অভিজাত ব্যক্তিগণ অত্যাচার করিতে পারিবেন না। এবার সমুদয় জাতি পুনরায় এক ব্রাহ্মণজাতিতে পরিণত হইল। আমরা এ সকল গুরুদলের কৃপায়, শীঘ্রই সকল যন্ত্রণার পারে যাইয়া শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। জপ, তপঃ, ধ্যান, জ্ঞানের, সাধনার কোন প্রয়োজন নাই। আসুন কে

কোথায় আছেন, আসুন, পরম দয়াল অবতারগণ ও গুরুগণ সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর ভয় নাই। সংযমের প্রয়োজন নাই, সত্যের প্রয়োজন নাই, যাঁহার যাহা প্রাণে চায়, তাহাই করুন, তাহাতে আপত্তি নাই। কেবল তাঁহাদের শরণাপন্ন হউন ; ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র—সর্ব্বস্ব তাঁহাদের চরণে "আপনারই" বলিয়া ঢালিয়া দিন, অচিরাৎ পরম পদের অধিকারী হইতে পারিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা সন্দিগ্ধবাদী, সুতরাং প্রতিপদেই সন্দেহ আমাদের মজ্জাগত। তাই কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে স্বামী, সন্ন্যাসী, অবতার ও গুরুগণ, এইরূপ পরহিতচিকীর্ষাবৃত্তি কি আপনাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম্ম, অথবা ইহা সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছেন? আপনারা যে সমস্ত নাম ধারণ করিয়াছেন, তাহার কি কোন সার্থকতা আছে, অথবা উহা স্বয়ংসিদ্ধ নাম ও অহৈতুক? আমরা জগতের সকলেই জানি যে, কারণভিন্ন কার্য্য হয় না। সকল কাজেরই কোন না কোন হেতু আছে। আপনাদের অহৈতুক নাম, অহৈতুক প্রেম এবং অহৈতুক লীলাবিলাস। কিন্তু আমরা উহা স্বীকার করি কি প্রকারে? আপনারা কেহ মূর্ত্তিমান্ কলি, কেহ কলিচর, কেহ বা তাহার আড়কাঠি, নতুবা সর্ব্বদা জনসঙ্গ করিয়া, সাধনা ত্যাগ করিয়া, মুখে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, আহার-বিহারে স্বেচ্ছাচারী হইয়া ও যুবতীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া স্বামীজি নাম ধরিলেন কি প্রকারে? আপনাদের সম্বল গেরুয়া ও ভোজন সর্ব্ববিধ সুস্বাদু অখাদ্য বা কুখাদ্য অন্ন। কারণ, আপনারা নিজেকে শুদ্ধ আত্মা বলিয়া জানেন। আপনাদের এই জানা শব্দের অর্থ কি? তাহাও এতদিনে বুঝিতে পারিলাম না।

হে অবতারগণ! আমরা রাম, কৃষ্ণপ্রভৃতিকে অবতার বলি, কিন্তু আপনাদিগকে পারি না, তাহার কারণ কি? আপনারা কি আমাদের

পাকাধানে মই দিয়াছেন? তাহা নহে। তবে কেন আমাদের এ প্রবৃত্তি? তাহার কারণ 'ভগবান্' শব্দের দ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্তগুণসম্পন্ন মানবদিগকে বুঝায়। কিন্তু আপনাদের কোন ঐশ্বর্য্য নাই, বরং উহা আপনারা হেয়জ্ঞান করেন। আপনারা নিজেদের কি হইবে, তাহা জানেন না। কারণ, আপনারা সঙ্কল্পশূন্য। বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মপ্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অবতারদিগের কাজ। কিন্তু আপনারা বেদের মুখে চূণকালী না দিলে উদারতা দেখাইতে পারেন না। তাই বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত নিশাচরের কথিত বলিয়া প্রচার করেন। আপনারা এতগুলি উপস্থিত থাকিতেও গোবংশ ধ্বংসপ্রায়; ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগে জনপদ ধ্বংসপ্রায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে প্রতিগৃহ উৎসন্নপ্রায়। আপনাদের নিকট স্ত্রীলোকদের মর্য্যাদার মূল্য বচনমাত্র হইয়াছে; রেলে, ষ্টীমারে, ঘরে, বাহিরে পাদুকার আঘাতে অনেকেই প্লীহা ফাটিয়া ভবযাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে। আপনারা অবতার!

হে গুরুগণ! আপনারা সকল জীবকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন এবং করিতেছেন ও অহৈতুকী কৃপা দ্বারা মানবমাত্রেরই চরম সত্য উপলব্ধি করাইতেছেন। আমরা জানিতাম, ভগবদ্দর্শন হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি দূরে যায়, সমুদয় সংশয় দূর হয় ও সমুদয় কর্ম্মবন্ধন ক্ষীণ হয়। আপনাদের এ সব নিশ্চয়ই হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি। কিন্তু আপনারা প্রতি বৎসর সন্তানের জনক হইতেছেন কি ব্রহ্মযুক্ত হইয়া? পিতামাতাকে তাড়াইয়া দেন কি অসভ্য বলিয়া? কর্ম্মবন্ধন আপনাদের নিশ্চিতই নাই, কারণ সকলের বন্ধনস্বরূপ কামিনী-কাঞ্চন আপনাদের চরণতলে দিনরাত লুণ্ঠিত? তখন এ প্রশ্ন নিরর্থক সন্দেহ নাই।

হে শিষ্যগণ! আপনাদের বাহাদুরী সকলের উপর। কারণ

আপনারা বৃন্দাবনের গোপিনীদিগের মত গুরুদিগের বাঁশী শুনিলেই জাতি ও ব্যক্তি-বিচার পরিত্যাগ করিয়া বৎসহারা গাভীর মত ছুটিয়া যান ও অল্প সময়েই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় প্রেমলাভের নিমিত্ত ভ্রমরের মত এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বেড়াইতে থাকেন এবং অচিরাৎ একটী বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত হইয়া বেদ ও তৎপ্রতিপাদ্য গোঁড়ামির মাথায় পদাঘাত করিতে থাকেন। আপনারা কেহ বা স্বপ্নে মহাপুরুষের কৃপালাভ করিতেছেন, যাহার ফলে মহাপুরুষত্ব সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। কখনও শুনিয়াছেন কি যে, স্বপ্নে রাজা হইলে কেহ রাজ্য পায়? উহা সম্পূর্ণই অলীক। স্বপ্নে মন্ত্র না পাওয়া যায়, এরূপ নহে, তাহাও উপযুক্ত গুরুর নিকট সংস্কার করাইয়া গ্রহণ করার ব্যবস্থা তন্ত্রেই আছে। যথা—

"স্বপ্নে লব্ধে চ কলসে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্।
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা বিফলং ভবেৎ॥"

—তন্ত্রসার।

"ইদন্তু গুরোরভাবে, তৎসত্ত্বে তস্মাদেব গৃহ্লীয়াৎ"।

গুরুপূজা করিতে হইবে বা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, এইরূপ গুরুবাদ স্বীকার করিতে লজ্জা হয়, তাই আপনারা স্বপ্নেই সিদ্ধ হইতেছেন। আপনারা কেহ বা ভুঁইফোঁড়, (স্বয়ংসিদ্ধ) অর্থাৎ জন্ম হইতেই সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত। আপনারা সব হইতে পারেন, এতটুকুই দুঃখ যে, আপনাদের প্রেমের জ্বালায় কুক্কুট হইতে আরম্ভ করিয়া গোগুলিপর্য্যন্ত নিঃশেষ হইতে চলিল। ভবিষ্যতে আপনাদের এ প্রেমের পরিণাম কি হইবে, তাহা বর্ত্তমান সময়েই অনেকটা বুঝিতেছেন, আর বাকীটুকুর পথ আপনাদের গুরুরা পরিষ্কার করিয়া যাইতেছেন।

অচিরাৎ ঐ প্রেমের ধ্বজা বহন করিয়া আপনারা জাতি, ব্যক্তিত্ব, সমাজ—সমস্ত হারাইবেন এবং এক বিরাট্ ব্রহ্মের পাদুকার সহিত মিশিয়া যাইবেন। কাহাকেও কিছু বলিবার নাই। কারণ, আপনাদের ঈশ্বর সব করাইতেছেন। সুতরাং নির্ব্বিবাদে লীলা করিতে থাকুন। যে দেশে একদিন সর্ব্বত্যাগী মহাত্মগণ পরমাত্মধ্যানে মনোনিবেশপূর্ব্বক নিরাহারে, একাহারে বা অর্দ্ধাহারে হিংস্রজন্তুসমাকুল গভীর অরণ্যে বা পর্ব্বতের গুহায় নির্ভয়ে অহিংসাব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেন, যাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ দধীচি মুনির ন্যায় পরার্থে আত্মত্যাগী মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহার গতপ্রাণ দেহাস্থি দ্বারা প্রস্তুত বজ্রাস্ত্র, সমুদয় আসুরিক বলের প্রতিরোধক হইয়াছিল, আজ সেই দেশে তাঁহারই সন্তানগণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপ্তির ফলে দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে প্রয়াণ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম কি হইতে পারে? দুঃখের বিষয়, এইরূপ হীন আদর্শ নরগণ আজ ঈশ্বরের আসন অধিকার করিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাদের বিজয়ঢক্কা সর্ব্বত্র নিনাদিত করিতেছি। যে দেশে কপোত কপোতীর রক্ষা বা শ্যেনপক্ষীর তৃপ্তির নিমিত্ত রাজর্ষি শিবি, আত্মশরীর ছিন্ন করিয়া হাস্যমুখে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া মাংস দিয়াছিলেন, আজ সেই দেশে, ত্যাগই যাহাদের জীবনব্রত—সেই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ ভোগের মধ্যে যোগের পতাকা উড়াইয়া বেড়াইতেছেন, এবং সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা বলিয়া পূজা পাইতেছেন। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মের আর কি গ্লানি হইতে পারে? যে দেশে অষ্টমবর্ষীয় বালক সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়া আচার্য্যপদে আরূঢ় হইয়াছিলেন, এবং হিমাচল হইতে কুমারিকা-পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শাস্ত্রজ্ঞ বুধমণ্ডলীর ভীতি উৎপাদন করত বেদসম্মত ধর্ম্ম স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি আজ সেই দেশে পল্লবগ্রাহী,

পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির দ্বারা বুদ্ধিজীবিমাত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

যথায় রাজপুত্র শাক্যসিংহ সর্ব্বত্যাগী হইয়া ক্ষুদ্র হংসশাবকনিমিত্ত স্বীয় প্রাণ অবহেলায় বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, যাঁহার ত্যাগের তুলনা জগতে কেহ কখনও কল্পনায় আনিতে সমর্থ হয় না, তিনি আজ বাচালতা দ্বারা আত্মসমর্থনকারী মানবের সহিত সমপদবীতে তুলনা-প্রাপ্ত। যিনি বাল্যকালে চপলতায় সর্ব্ববিজয়ী, যৌবনারম্ভে যিনি ভারত-বিজয়ী পণ্ডিতের দন্তচূর্ণকারী, এবং হরিনাম-বন্যায় সর্ব্বলোকের প্রাণে প্রেমের সঞ্চারকারী, যাঁহার ব্যাকুল ক্রন্দনে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারভূতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দিতে বাধ্য হন, যাঁহার ভগবৎ-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বৃদ্ধকালের একমাত্র অবলম্বন পুত্রকেও, শচীমাতা সর্ব্বত্যাগে অনুমতি দিয়াছিলেন, যাঁহার শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত নামশ্রবণে পশুপক্ষী স্থির হইয়া ধ্যানস্থ হইত, বৃক্ষের পত্র চলনরহিত হইত, রাখালগণ উন্মত্ত হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেম-বিতরণে সমর্থ হইত। যিনি সন্ন্যাসাবস্থায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করার নিমিত্ত হরিদাসকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই প্রেমাবতার কলিকলুষ-নাশন গৌরাঙ্গদেব আজ সামান্য ভেল্কীবাজ শিশ্নোদরপরায়ণ, কামিনী-কাঞ্চনসর্ব্বস্ব, সর্ব্বভোজী, বেদনিন্দক মূর্খাধমদিগের সহিত সমাসনে স্থাপিত। আর কি দেখিতে চাই, আর কি শুনিতে হইবে, তাহা ভাবিলেও প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। মনে হয়, ধমনীতে যেন আর রক্তসঞ্চালন না হয়। আমরা নিশ্চয়ই অনন্তপাতকের ফলভোগ করিতে আসিয়াছি। নতুবা এই দুঃসময়ে জন্ম হইবে কেন? যাই হউক, ইহার মধ্যেই বাস করিতে হইবে। দন্তমধ্যে অবস্থিত জিহ্বার ন্যায়, কোনরূপে দিনযাপন করিতেই হইবে। তাই অরণ্যে রোদন করা যাইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ম্মফলের দায়ে যাঁহারা জ্বলিয়া মরেন, দিবানিশি যন্ত্রণায় অধীর হন, তাঁহাদের নিমিত্তই কিছু বক্তব্য আছে। কারণ, আমরাও ঐ দলের। ঐ দলও আছে। কারণ, কলির সম্পূর্ণ অধিকার এখনও হয় নাই।

বেদ ও তন্মূলক স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র—এই তিন মতে গুরুকরণ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দ্বিজাতিগণ, উপনয়ন-সংস্কার-নিমিত্ত, গায়ত্রীদাতা গুরু গ্রহণ করিতেন এবং গুরুগৃহে বাস করত বেদাভ্যাস করিতেন। গায়ত্রীদাতা গুরুই আচার্য্যনামে অভিহিত হইতেন। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় কঠোর সংযম অভ্যাস এবং বেদাধ্যয়ন করিতে হইত। সংযমের পরিপক্কাবস্থায় ইচ্ছানুসারে কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অথবা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতেন; উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীরা দারগ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপন করত বৈদিক মন্ত্রাদি-দ্বারা দেবতাগণের আরাধনা করিতেন, তজ্জন্য মন্ত্রাদি অভিজ্ঞ, পুরোহিত, ঋত্বিক্‌প্রভৃতি নামধারী আচার্য্যগণকে গুরুপদে বরণ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বাসনার পরিপক্কাবস্থায় জ্ঞানফলের পরিণামস্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাস বা পরমহংসাবস্থায় উপনীত হইবার জন্য সর্ব্ববেদার্থতত্ত্ববিদ্‌ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কেহ বা জ্ঞানেচ্ছার নিমিত্ত বিবিদিষা-সন্ন্যাস-নামক ত্যাগব্রত অবলম্বন করিতেন। ঐ সন্ন্যাসে অন্য জাতির অধিকার ছিল না। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা দ্বারাই তাঁহাদের অতি-কষ্টোপার্জ্জিত জ্ঞানধনে ধনী হইয়া অমৃতত্ত্বলাভের অধিকারী হইতেন। কালক্রমে বৈদিক ধর্ম্মসমূহের কঠোরতাহেতুও সাধনে সামর্থ্য-হীনতার

নিমিত্ত পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ সাধারণের নিমিত্ত স্বল্প-পরিশ্রমসাধ্য দেবতা উপাসনার প্রণালী পুরাণসমূহে লিপিবদ্ধ করেন। তদনুযায়ী কতকগুলি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমে কলির মানবের অল্পায়ুঃ-নিবন্ধন এবং শারীরিক কষ্ট ও মানসিক দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত নানাতন্ত্ররূপেও অনেক শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা অধিকারিবিশেষের জন্য বেদমূলক শাস্ত্রমতানুযায়ী সাধনাসমুদয় ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এক্ষণে শিষ্যের কর্ত্তব্য বৈদিক মতে নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে। মনু বলেন—

"বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥" ১২।৮৩

"উপনিষদাদের্বেদস্য গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ আবর্ত্তনং তপঃ কৃচ্ছ্রাদিজ্ঞানং ব্রহ্মবিষয়ম্ ইন্দ্রিয়জয়োঽবিহিতহিংসাবর্জ্জনং গুরুশুশ্রূষেত্যেতৎ প্রকৃষ্টং মোক্ষসাধনম্।"

"অর্থসহিত উপনিষদাদির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ অথবা প্রাণায়ামাদি তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা; গৃহস্থ হইলে শাস্ত্রবিহিত হিংসা এবং অন্যাশ্রমী হইলে কায়মনোবাক্যে পরপীড়াবর্জ্জন এবং গুরুশুশ্রূষা—এই কয়েকটী মোক্ষের উপযুক্ত সাধন।"

উপনিষদ্ বলেন,—

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্ অন্তঃশরীরে পশ্যতি জ্যোতির্ম্ময়ো হি দেবঃ।"

"সত্য, তপস্যা, নিত্য ব্রহ্মচর্য্য ও সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে পাওয়া যায়। অন্তঃশরীরে অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়।"

এই সমুদয় গুণগুলির লক্ষণ ক্রমশঃ বলা যাইতেছে, যথা—

"যৎ দৃষ্টং শ্রুতং স্বেন পুনস্তস্যৈব ভাষণম্।
সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম সত্যমিত্যভিভাষণম্॥"

"স্বয়ং দৃষ্ট এবং শ্রুত বাক্যের যথার্থরূপে উক্তি এবং ব্রহ্ম সত্য, এইরূপ উক্তিকে সত্য বলা যায়।"

তপস্যা—

"তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তির্জ্ঞানস্যেতি।"

"প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োঽপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ॥" মনু, ৬।৭০

"অর্থাৎ প্রাণায়াম হইতে শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই। তাহা হইতে মনের বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়," "সপ্ত ব্যাহৃতি, দশপ্রণবযুক্ত প্রাণায়ামত্রয় বিধানানুসারে হইলে, উহা ব্রাহ্মণদিগের পরম তপস্যা জানিবে।"

জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণ, যথা মনু—

"শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ধ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥" ২।৯৮

"শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন এবং আঘ্রাণ করিয়াও যিনি হৃষ্ট বা দুঃখিত হন না, তিনিই জিতেন্দ্রিয়নামের যোগ্য।"

ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্টলক্ষণম্॥"
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
স্ত্রীসঙ্গতিপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে॥"

অর্থাৎ "স্ত্রীলোকের স্মরণ, গুণকীর্ত্তন, গোপনীয় স্থান হইতে হাব-ভাবাদির অবলোকন, গোপনে প্রেমালাপ, স্ত্রীলোকলাভে সঙ্কল্প ও চেষ্টা ও স্ত্রীর উপভোগ—এই আটটীকে মৈথুন বলা যায়। ইহার বিপরীত হইলেই ব্রহ্মচর্য্য হইল।

"কর্ম্ম, মনঃ বা বাক্যদ্বারা সমস্ত অবস্থাতে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য।" এই উভয় শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীর নিমিত্ত। গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য অন্যরূপ। তাহাও লিখিত হইতেছে, যথা—

"ঋতাবৃত্তৌ স্বদারেষু সঙ্গতির্যা বিধানতঃ।
তদেবোক্তং ব্রহ্মচর্য্যং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্॥"

"ঋতুকালে পুত্রকামী হইয়া অনুকূল তিথি-নক্ষত্রাদি দেখিয়া স্ত্রীসঙ্গ করার নাম গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য।" তাহাও পুত্রজননপর্য্যন্ত। যথা—

"তাবৎ ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে।"

"যতদিনপর্য্যন্ত পুত্র না হয়, ততদিনই ঋতুকালে স্ত্রীগামী হইবে।" এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত যিনি পালন করিতে পারেন, তিনি মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। পুরুষের বিষয় যেরূপ কথিত হইল, স্ত্রীলোকদিগেরও তদ্রূপ। তবে আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা নাই, হইবারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহারা পুরুষের অনুগামিনী হইতে বাধ্য। অতঃপর ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠেয় বলা যাইতেছে,—

"বর্জ্জয়েন্ মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥"

"ব্রহ্মচারী মধু, মাংস ও গুড় ভোজন করিবে না। কর্পূর, চন্দন, কস্তুরীপ্রভৃতি কোনরূপ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। স্ত্রীসংসর্গ করিবে না। স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কারণবশে অম্ল হইয়াছে, এমন দ্রব্য (শুক্ত) খাইবে না। কোন প্রকারে প্রাণীকে পীড়া দিবে না। সর্ব্বাঙ্গব্যাপী তৈলমর্দ্দন, নয়নে অঞ্জনদান, চর্ম্মপাদুকাও ছত্র ব্যবহার, নৃত্য, গীত ও বাদ্য—এই সমুদয় ব্রহ্মচারীর নিষেধ। ক্রোধ ও লোভ, অক্ষক্রীড়া, লোকের সহিত কলহ, পরের দোষোদ্ঘাটন, পরের অনিষ্টাচরণ, এসবও অকরণীয়।"

"একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥
স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্ম্মামিত্যচং জপেৎ॥"—মনু

"সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অধঃশয্যায় একাকী শয়ন করিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত করিলে ব্রত নষ্ট হয়। অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্বপ্নে রেতঃপাত হইলে স্নানকরত সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া ''পুনর্ম্মামেত্বিন্দ্রিয়ম্''—এই ঋক্ জপ করিবে।" এই নিয়মসমুদয় ব্রহ্মচর্য্য-পালনের নিমিত্ত অবশ্য করণীয়। যদি কেহ ইহার অনুষ্ঠান না করেন, তিনি যেন ব্রহ্মচারী হইবার আশা না করেন। কারণ, তাঁহার শুক্র স্থির থাকা অসম্ভব হইবে। রসধাতুর পুষ্টিই ব্রহ্মচর্য্যব্রতের একান্তবিরোধী।

গুরুশুশ্রূষা—

"শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্॥
হীনান্নবস্ত্রবেষঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ॥

প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ॥
নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥
গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥
যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥"

—মনুস্মৃতি, ২য় অধ্যায়।

"শরীর, বাক্য, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মনঃ সংযত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে এবং অনুমতি-ব্যতিরেকে উপবেশন করিবে না। গুরু যেরূপ অন্ন, বসনাদি ব্যবহার করেন, শিষ্য তদপেক্ষা হীন করিবে। গুরু রাত্রিশেষে উত্থান করিবার অগ্রে শিষ্য উত্থিত হইবেন এবং প্রথম রাত্রে গুরু শয়ন করিবার পরে শিষ্য শয়ন করিবে। শয়ন করিয়া কিংবা উপবেশন করিয়া বা ভোজন করিতে করিতে কিংবা দণ্ডায়মান হইয়া অথবা পরাঙ্মুখ হইয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ বা গুরুকে সম্ভাষণ করিবে না। গুরুর নিকট শিষ্য সর্ব্বদা শয্যাসনাদির নীচে অবস্থিত থাকিবে। আর দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকিলে যথেচ্ছ আসন প্রসারণাদি করিবে না। যেখানে গুরুর পরীবাদ অর্থাৎ বিদ্যমান দোষের কথন ও নিন্দা অর্থাৎ অবিদ্যমান দোষের কথন হয়, শিষ্য সেখানে থাকিলে, হস্তাদিদ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবে, অথবা অন্য স্থানে প্রস্থান করিবে। খনিত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে যেরূপ জল পাওয়া যায়, তদ্রূপ শুশ্রূষা দ্বারা গুরুগত বিদ্যা লাভ করা যায়।" তাই গুরুশুশ্রূষার ব্যবস্থা।

"উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাৎ গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনম্ ॥"—মনু।

"গুরুপুত্রের গাত্রবিলেপন, স্নাপন অথবা উচ্ছিষ্টভোজন বা পাদপ্রক্ষালন করিবে না।" সুতরাং গুরুশুশ্রূষা ঐরূপ করিতে হইবে, ইহা প্রমাণিত হইল।

যুক্তি ও অনুভব দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণ। যদি উপযুক্ত পুত্রের পিতা হইতে হয়, তাহা হইলেও আগে ধৃতবীর্য্য সংযমী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পিতামাতার সংযমের উপরেই তাহা নির্ভর করে। বালক-বালিকাই, যৌবনে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের স্থান প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সেই সময় হইতে ব্রহ্মচর্য্যের সুফল এবং সংযমহীনতার কুফল বুঝাইয়া দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য এবং যাহাতে তাহারা কোনরূপ কুসঙ্গ, কুদৃশ্য বা কুৎসিত আলোচনার অবসর না পায়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে করা উচিত, নতুবা ঈশ্বরলাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান দূরে থাক্‌, অতি অল্পকালেই তাহারা কতগুলি হতভাগা সন্তানের জনকজননী হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে রাজ্ঞী মদালসার আখ্যায়িকায় ইহা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বালক-অবস্থায় মাতার নিকট হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত সেই সংস্কারই প্রবলরূপে থাকে। যদিও কর্ম্মের ব্যতিক্রমে কখনও ইহার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে। রাজ্ঞী মদালসা তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণমাত্রই দোলায় স্থাপনকরত 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ' এইরূপ শিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে বালকের আত্মজ্ঞান জন্মে, তজ্জন্য তৎকালেই উপনিষদের কঠিন তত্ত্ব বর্ণন করিতেন। তাহার ফলে ক্রমশঃ তাঁহার পুত্র ছয়টী সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করে। অবশেষে স্বামীর বাক্যে, সপ্তম পুত্র অলর্ককে

রাজকার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত, জন্মের পর হইতেই রাজধর্ম্ম এবং গৃহস্থধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করেন। স্ত্রীর সহিত ব্যবহার হইতে গৃহস্থ-জনোচিত সমুদয় ক্রিয়া-কলাপ তাহাকে শৈশবকালেই শিক্ষা দেন এবং পরিশেষে যাহাতে আত্মজ্ঞ হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়ে সংসার আশ্রম ত্যাগ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষিত পিতামাতা বালকের চরিত্রগঠনের উপযোগী ঐ সব শিক্ষার কথা বলা অশ্লীলতা মনে করিয়া, পুত্রের নিকট উচ্চারণ করিতেও অসমর্থ হন। বাল্যকালেই তাঁহাদের মত, যাহাতে ঐ অশ্লীল ব্যাপারে ব্রতী হইতে পারে, তাহার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাই আজ আমরা এই দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছি। ধ্যান, ধারণা করিতে যতটা সংযমের প্রয়োজন, তাহা কাহারও নাই বা করিবার চেষ্টাও নাই। সুতরাং নানারূপ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা নিত্য নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে এবং অনেক অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া জীব উদ্ধারব্রতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঐ সকল অবতারনামধারিগণ নিজেরা উৎসন্ন গিয়াছেন। তাঁহারা কি তাঁহাদের প্রকাণ্ড জ্ঞানের ভাণ্ড না বিলাইয়া স্থির থাকিতে পারেন না? অথবা চুপ করিবেনই বা কিরূপে? তাহা হইলে যে মান, সম্মান, বা উদারান্নের সংস্থানের ব্যাঘাত ঘটিবে! আর তাহা হইলে তাঁহারা কলির রাজত্ব প্রচার করিবেনই বা কিরূপে? তোমরা যেরূপেই আত্মপ্রবঞ্চনা কর, আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি যে, তোমাদের ঐ স্তোভবাক্যে ভুলিয়া যাহারা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্ব্বিধ অন্নে দেহ পুষ্ট করত ও বারনারীর কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক হরিনামের প্রেমবন্যাধারায় আঁখিসেচনরূপ, কলিকালোচিত ভক্তের লক্ষণ সমাজে দেখাইবে, তাহারা নিশ্চয়ই নৃত্য করিতে করিতে কেহ বা নরকপথের পথিক। কেহ বা নিশ্চলাবস্থায় নীত হইবার নিমিত্ত প্রেতাবাসের যাত্রী

হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবদর্পণ, যোগ বা ব্রহ্মে যুক্ত হওয়া ভোগ কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত, সুতরাং তাহার আলোচনা বৃথা।

শরীর, মনের উন্নতিকারী দ্বিতীয় বস্তু সত্য কথা বলা, সত্য চিন্তা করা, সত্যকথা শ্রবণ করা, এবং নিজে সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া সত্যভাবের অপলাপ না করা। কারণ, তিনি সত্যস্বরূপ, তাঁহাতে মিথ্যার কোন সংস্রব নাই, সুতরাং মিথ্যার কোনরূপ সংশ্রবে না যাওয়াই তাঁহাকে লাভ করার একমাত্র উপায়। যাঁহার বাক্য, কর্ম্ম বা মনের সত্য-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তাঁহার ধর্ম্ম বা ভগবৎসম্বন্ধে আলোচনা করা নিরর্থক। কিন্তু গৃহস্থমাত্রেই বলেন—সত্য কথা বলিলে আমাদের চলে কিরূপে? বাস্তবিক রাজধর্ম্মে ও কালধর্ম্মে যেরূপ অবস্থায় আমরা নীত হইয়াছি, তাহাতে সত্য বলিয়া জগতে কিছুমাত্র আছে বা সত্যের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা আর কিছুদিন পরে মানুষ ধারণা করিতেও অসমর্থ হইবে। রাজকীয় কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য পর্ণকুটীরের অধিবাসিপর্য্যন্ত মিথ্যার জীবন্ত মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের মুখে ভগবানের নাম শুধু প্রতারণামাত্র। অনেক স্থলে মিথ্যাও সত্যের স্থলে গ্রহণ করা যায়, যাহা গৃহস্থের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্।"

"যাহাতে জীবের হিত হয়, যাহাতে অহিংসা নাই, তাঁহারই নাম সত্য,—শুধু যথার্থ বলাই সত্য নহে। গৃহস্থ কতকগুলি মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লন। সুতরাং তাঁহার ঐ মিথ্যা বস্তু রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কথা ব্যবহার করা প্রয়োজন, নতুবা তাঁহাদের ঐ মিথ্যা বস্তু রক্ষা সম্ভব নহে। রাজা কালের কারণ, সুতরাং রাজপ্রণোদিত আইনাদির দ্বারাও অনেকে মিথ্যা বলিতে বাধ্য হন। শাস্ত্র এবং যুক্তি-অনুযায়ী ঐ

মিথ্যাজনিত পাপের ভাগী রাজাই, যদি তাহার ভিতর নিজের কোন অসরলতা বা স্বার্থাভিসন্ধি বর্ত্তমান না থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কাহারও কথাবার্ত্তায় আকার-ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ পায়, যাহাতে কাহারও অযথা প্রাণহানি বা সম্পত্তিহানির সম্ভাবনা দেখা যায়, কিংবা কোন সতীর সতীত্বনাশের আশঙ্কা করা যায়, এরূপ স্থলে সত্য না বলিয়া মিথ্যা বলাই যুক্তিসঙ্গত। তাৎকালিক মিথ্যাজনিত যে সামান্য পাপ অর্জ্জিত হয়, তাহা প্রাণাদি রক্ষাজনিত মহাপুণ্য অপেক্ষা অনেকাংশে হীন, সুতরাং এই মিথ্যা নিন্দার যোগ্য নহে বরং আচরণীয়। ইহা সংসারী বা সংসারে অবস্থিত সকল প্রাণীরই অনুষ্ঠেয়, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী, তাঁহাদের নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় নহে। তাঁহারা এমন ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিবেন, যাহাতে বক্তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুই প্রকাশিত হয়, নতুবা সত্য কথাও মিথ্যায় পরিণত হইবে। এই সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে, ক্রিয়া না করিয়াও তাহার ফল পাওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠ কোন ব্যক্তি যদি কাহাকেও কোন কিছু বর বা অভিশাপ প্রদান করেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি কোনরূপে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, তথাপি বক্তার সত্যনিষ্ঠার ফল তাহাতে সংক্রান্ত হইয়া শ্রোতার কার্য্য সত্যে পরিণত করিবে। এরূপ দৃষ্টান্ত এখনও একান্ত অসদ্ভাব হয় নাই, যদিও ইহা অতি বিরল। বারদীর শ্রীমদ্ লোকনাথ ব্রহ্মচারী এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনীতে ইহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরাও যদি ঐরূপ সত্যনিষ্ঠ হই, অল্প সময়েই সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সাফল্যলাভ নিশ্চয়ই করিব। এইরূপ সত্যনিষ্ঠ হইতে থাকিলে কালে সত্যের মূর্ত্তি স্বয়ং প্রকাশিত হইবে, এরূপ আশা করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্য এবং সত্যের সহিত তপস্যা প্রয়োজনীয়, তদ্দ্বারা শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের অপকর্ষ

দূর হয় এবং আত্মার স্বরূপপ্রকাশের সহায়তা করে। তাহা ছাড়া দূর-দর্শন, দূরশ্রবণাদিও সিদ্ধ হয়। তপস্যা কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ। যথা, গীতা—

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭৷১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৭৷১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥" ১৭৷১৬

"দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই কয়টী শারীরিক তপস্যা নামে অভিহিত। উদ্বেগশূন্য অথচ প্রিয় ও হিতকর এমন সত্যকথন, যথাবিধি বেদাভ্যাস, এই কয়টী বাঙ্ময় তপস্যা নামে অভিহিত; চিত্তের স্বচ্ছতা, বিষয়চিন্তায় অব্যাকুলতা, মনন, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার, কামাদি মনের মলনাশ এই কয়েকটী মানসিক তপস্যা নামে অভিহিত। ইহা ছাড়া কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি-ব্রত, আহারসংযম এবং প্রাণায়ামরূপ সংযম ও তপস্যা নামে অভিহিত। সেই তপস্যা আবার সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ। যথা—

"শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭৷১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৭৷১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৭৷১৯

সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সম জ্ঞান করিয়া এবং হৃদয় হইতে ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন করত পরম শ্রদ্ধার সহিত সমাহিতচিত্তে যদি পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্থার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্থা বলে। সাধু বলিয়া লোকে সম্মান দিবে ও পূজা করিবে এইরূপ ভাবিয়া দম্ভের সহিত যে তপস্থা করা যায় ও যাহার ফল কেবল ইহকালে স্থায়ী, তাহার নাম রাজস তপস্থা। অবিবেকহেতু দুরাগ্রহবশতঃ দেহাদি পীড়ন করিয়া (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহের নিমিত্ত লিঙ্গাদির বন্ধন বা প্রহারকরণ) এবং অন্যের ধ্বংসসাধন যাহার উদ্দেশ্য, এরূপ তপস্থার নাম তামস"। সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্দর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়াসী, তাহাদিগকে রাজস এবং তামসভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিকভাবে পূর্ব্বোক্ত শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক তপস্থার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এক্ষণে দেব, দ্বিজ, গুরু এবং প্রাজ্ঞের পূজা বা তপস্থা শুনিলেই অনেকের চক্ষুঃ মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা হয়। কারণ, তাঁহারা দেবতাপ্রভৃতি তত্ত্বে বিশ্বাসী নহেন এবং অনেকেই মনে করেন উহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আতপ চাউল ও কাঁচকলা আদায়ের একটা বিশেষ উপায়মাত্র, বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ অনেক জিনিষ আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাই বলিয়া তাহা নাই এরূপ নহে। আটটী কারণে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না যথা—

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥"

সাংখ্যকারিকা।

"অতি দূরে থাকায় অকাশস্থিত শ্যেনাদি পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি নিকটে চক্ষুঃস্থ অঞ্জন প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয়াদির নাশে অনেক বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, মনঃসংযোগ না হইলে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ

হয় না, সূক্ষ্মত্বহেতু যন্ত্রসাহায্যব্যতিরেকে অনেক বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। দেওয়ালাদির ব্যবধানবশতঃ পার্শ্বস্থিত রাজপথ দেখা যায় না, দিবসে সূর্য্যপ্রভায় অভিভূত নক্ষত্রাদি দৃষ্ট হয় না। এবং আকাশের জল সমুদ্রে পড়িলে তাহা আর পৃথক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। লৌকিক বস্তুসমুদয় এতগুলি কারণে প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা নাই এরূপ বলিতে পারি না, সুতরাং আমি দেখিলাম না অতএব দেবতাদি নাই বা তাঁহার পূজা করা নিরর্থক, ইহা বিজ্ঞ লোক কখনও বলিতে পারেন না। জগতে যত প্রকার প্রাণী আছে তাহাদের যেরূপ দেহ আছে, তদ্রূপ অনেক জীব স্বীয় তপস্যার বলে কল্পকালের জন্য দেবদেহে আছেন এবং অনেকে তপস্যার বলে দেবদেহ লাভ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এবং তাঁহাদের সহায়তায় জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিলে শাস্ত্রবিধিঅনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। নতুবা বাক্যাড়ম্বরে কোনই লাভ নাই।

যাঁহাদের দ্বারা উপনয়নসংস্কার হইয়াছে, উপযুক্ত সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট সেই সমস্ত বিষয়ের যথাযথরূপে গ্রহণ করা তাঁহাদের পূজা করা ও গুরুকে কিরূপ সম্মান করিতে হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে পূর্ব্বেই সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রাজ্ঞ কাহাকে বলে, তাঁহাকে কিরূপে পূজা করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

"প্রজ্ঞা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ"

এই বুদ্ধি যাঁহার আছে, তিনিই প্রাজ্ঞ। তিনি বয়সে বালক হইলেও আসন, উত্থানাদির দ্বারা তাঁহার সম্মান করা, অবহিতভাবে তাঁহার বাক্য শ্রবণপ্রভৃতিকে প্রাজ্ঞপূজা নামে অভিহিত করা হয়।

শৌচঃ—আভ্যন্তর ও বাহ্য ভেদে শৌচ দুই প্রকার। অনেকে শৌচের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না। কেহ বা আভ্যন্তর শৌচ

স্বীকার করেন, কিন্তু বাহ্য শৌচ প্রয়োজনীয় নহে বলেন। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥"

কঠ, ৩য়।

"যে ব্যক্তি বিজ্ঞানশূন্য, অমনস্ক (চঞ্চলমনোযুক্ত) এবং সর্ব্বদা অশুচি, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয় না এবং পুনরায় সংসারকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে।"

শৌচের মুখ্য ফল শ্রুতি বলিতেছেন—

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥" (কঠ ৩য়)

"যিনি বিজ্ঞানবান্, স্থিরমনাঃ এবং সদা শুচি, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে তথা হইতে আর ফিরিতে হয় না।"

স্মৃতি বলেন ঃ—

শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ দক্ষ।

"সর্ব্বদা শৌচে যত্ন করা কর্ত্তব্য, কারণ দ্বিজগণের সর্ব্বকার্য্যের মূল শৌচ। যিনি আচার এবং শৌচবিহীন হইয়া কার্য্যাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সকলই বৃথা।"

আভ্যন্তর ও বাহ্য শৌচের মধ্যে আভ্যন্তর উত্তম। একটী হীন হইলে অন্যের দ্বারা বিশেষ কিছু লাভ হয় না, কারণ একটী অপরের আশ্রিত।

"উভাভ্যান্তু শুচির্যস্তু স শুচির্নেতরঃ শুচিঃ।" দক্ষ।

"যাঁহাতে উভয়বিধ শৌচ বর্ত্তমান আছে, তাঁহাকেই শুচি বলা যাঁহার আভ্যন্তর শৌচ নাই, তাঁহার বাহ্য শৌচ বৃথা। যথা—

"গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥" ব্যাঘ্রপাদ।

"সমুদয় গঙ্গাজল এবং পর্ব্বতপ্রমাণ মৃত্তিকা দ্বারা যদি শুদ্ধ করা যায় এবং মরণপর্য্যন্তও যদি গঙ্গাস্নান করে, তথাপি ভাবদুষ্ট ব্যক্তি কখনও শুদ্ধি লাভ করে না।"

ভাবশুদ্ধির অর্থ—"মায়ারাগাদিকলুষভাবঃ" গীতাভাষ্য। প্রতারণা, দম্ভ, কপটতা, আসক্তিপ্রভৃতি মনের মলিনতা দূর হইলেই ভাব শুদ্ধ হয়। ভাবশুদ্ধি করিতে হইলে বাহ্য শৌচের অপেক্ষা রহিয়াছে। যেরূপ শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক পীড়ার কারণ হয়, তদ্রূপ বাহ্য অশুচিভাব মনের মলিনতা আনিয়া দেয়। বর্ষাকালে সজল বায়ুর নিমিত্ত, প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় এবং গ্রীষ্মের আতিশয্যে শুকাইয়া যায়, ইহাতে বাহ্য বস্তু অভ্যন্তরে কতটা ক্রিয়া করে, তাহা অনুমিত হইতে পারে।

বাহ্য শৌচ আবার তিন ভাগে বিভক্ত। ধাতুশুদ্ধি, ধাতুবাহ্য শারীর-শুদ্ধি এবং উপকরণশুদ্ধি। তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকারকে শারীরশুদ্ধি বলা যায়। বর্ণ ও আশ্রমভেদে ইহার প্রকারভেদ আছে। তাহা অধিকারীঅনুযায়ী আকরগ্রন্থ হইতে গ্রহণীয়। বিবাহ, গর্ভাধানপ্রভৃতি দ্বারা পত্নী ও পুত্রের শুদ্ধি হয়। জাতকর্ম্মাদিসংস্কার দ্বারা বীজজনিত (শুক্র-শোণিতের) দোষ দূরীভূত হয়, এবং রক্তসম্বন্ধীয় ব্যক্তির জনন, মরণাদিতে অশৌচ সাময়িক ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়।

মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি (সাবান নহে) দ্বারা মলমূত্রাদি দুর্গন্ধ ও লেপ নাশ হয়। তদ্দ্বারা শরীরের বাহ্য ভাগ শুদ্ধ হয় এবং অন্য শুদ্ধি দ্বারা শরীরের আভ্যন্তর ভাগ শুদ্ধ হয়। পিতা মাতার উচ্চবংশ, সত্ত্বাদি গুণ, উৎকৃষ্ট এবং শুদ্ধ অন্নাদি গ্রহণের ফলে সদাচারী, বিশুদ্ধাত্মা মহৎ ব্যক্তির জন্ম হয়। শুদ্ধ অন্নাদি গ্রহণে বল, পুষ্টি, মেধাপ্রভৃতির বৃদ্ধি হয়।

অন্নের অশুদ্ধি নয় প্রকার। যথা—(১) জাতিদোষ. (২) সাধনদোষ (৩) পাচকদোষ, (৪) দাতৃদোষ, (৫) স্বামিদোষ, (৬) আশ্রয়দোষ, (৭) কাল-দোষ. (৮) স্পর্শদোষ, (৯) স্বরূপদোষ।

১। জাতিদোষ ঃ—গোমাংস, লশুনপ্রভৃতি।

২। সাধনদোষঃ—অন্যায় উপার্জ্জিত; যেমন—অপহৃত বা কুসীদ-প্রভৃতি দ্বারা সঞ্চিত।

৩। পাচকদোষ ঃ—ম্লেচ্ছপ্রভৃতি দ্বারা পক্ব, তদ্দত্ত অন্নাদি।

৪.। দাতৃদোষ ঃ—পাপী, নীচ ও চণ্ডালাদির অন্ন।

৫। স্বামিদোষ ঃ—ঐরূপ স্বামীর অন্ন।

৬। আশ্রয়দোষ ঃ—অমেধ্য বস্তুসংযুক্ত পাকপাত্রে পক্ব।

৭। কালদোষ ঃ—যে তিথি বা নক্ষত্রে যাহা নিষিদ্ধ, যেমন নবমীতে অলাবু।

৮। স্পর্শদোষ ঃ—নীচজাতীয় ব্যক্তির সংস্পর্শদুষ্ট।

৯। স্বরূপদোষ ঃ—সুরাদি।

পরিধেয় বস্ত্রাদি যথাসম্ভব শুদ্ধ হওয়া চাই অর্থাৎ চর্ব্বি, মল, মূত্র, বসা-প্রভৃতিযুক্ত অথবা অন্যের পরিহিত না হয়। ভোজনের নিমিত্ত লৌহাদি পাত্র তমোগুণবর্দ্ধক, সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য।

প্রত্যেকপ্রকার শৌচের শাস্ত্রবাক্য এবং যুক্তি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থকলেবর অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য লিখিত হইল না।

অহিংসা ঃ—

অহিংসা অধিকারভেদে দুই প্রকার ঃ—কায়মনোবাক্যে পরপীড়া-বর্জ্জন ও বৈধহিংসা। যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গপরায়ণ, মুমুক্ষু, তাঁহাদের জন্য প্রথমটী অবলম্বনীয়। যাহারা সংসারধর্ম্মপরায়ণ এবং কাম্য কর্ম্মে আসক্ত

তাহাদের জন্য দ্বিতীয় প্রকার। "মা হিংস্যাঃ সর্ব্বাভূতানি" এবং "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইহাই তাহার শ্রৌত প্রমাণ।

"হিংসা প্রাণবিয়োগফলকো ব্যাপারঃ।"

প্রাণহননের অনুকূল ব্যাপারের নাম হিংসা।

হিংসার ভেদ যথা :—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥" মনু।

হত্যা করিতে যে অনুমতি প্রদান করে, যে মাংস কর্ত্তন করে, যে বধ করে, যে ক্রয় বা বিক্রয় করেন, যে পাক করে, যে পরিবেশন করে ও যে ভোজন করে, ইহারা সকলেই পাপভাগী হয়।

তজ্জন্য মনু বলিয়াছেন—

"নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপাদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

"প্রাণহিংসাব্যতিরেকে মাংস উৎপন্ন হয় না সুতরাং মাংসভোজন ত্যাগ করিবে।"

"বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥" মনু।

"শতবৎসর কাল ক্রমাগত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে পুণ্যফল লাভ হয়, মাংসত্যাগীর সেই পুণ্যফল লাভ হয়।"

"যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইতে চান, তাঁহাদের জন্য ইহা অবশ্য পালনীয়। আজকাল সাংসারিক সমুদয় সুখের দাস হইয়া যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র নহে।

যাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্যাদির আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত, তাঁহাদের নিমিত্ত

বৈধ পৈত্র্যাদি কর্ম্মে বৈধ হিংসা বিধেয়। শুধু শরীরপোষণের নিমিত্ত হিংসা অবৈধ।

যতক্ষণপর্য্যন্ত মানব সর্ব্বপ্রকারে পরপীড়া বর্জ্জন না করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার অহিংসা প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বলিতে হইবে।

সত্য :— "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ।"

(ঋগ্বেদ ৮ অষ্টক ৩ অঃ ২০ বর্গঃ)

"সত্যের দ্বারাই পৃথিবী উন্নত হইয়াছে।" মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে যথা—

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং মহৎ।

স্থিতির্হি সত্যং ধর্ম্মস্য তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ॥" ১৬২ অধ্যায়।

"সত্য অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম এবং মিথ্যা অপেক্ষা মহৎ পাতক আর নাই। সত্যের দ্বারা ধর্ম্মের স্থিতি হয়, সুতরাং সত্য কখনও লোপ করিবে না।" যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তদ্রূপে তাহাকে প্রকাশ করার নাম সত্য। ভাব-ভঙ্গীতে বা যে কোন রূপে ইহার বিপরীত হইলেই তাহাকে মিথ্যা বলা যায়।

মনু বলেন :—"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" ৪র্থ অঃ।

"প্রিয় সত্য কথা বলিবে, অপ্রিয় সত্য কথা বা প্রিয় মিথ্যা কথা বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।"

প্রিয় অর্থাৎ যাহাতে পরের পীড়াকর না হয়। পরপীড়াকর সত্য কথা বলিলে তাহাতে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারতের তপস্বী কৌশিকের কথা বলা যাইতে পারে।

কৌশিকনামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ বনমধ্যে তপস্যা করিতেন। তিনি মিথ্যা বলিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। একদিন কতিপয় ব্যক্তি দস্যুভয়ে ভীত হইয়া সেই বনে আসিয়া আশ্রয় লয়। অনুসরণ

করিতে করিতে দস্যুগণও উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাহাদের আশ্রয়স্থান বলিয়া দিলেন। দস্যুরা তাহাদের প্রাণনাশ করিয়া প্রস্থান করিল। এই সত্যের ফলে কৌশিকের নরকবাস হইয়াছিল।

মিথ্যা বলা যদিও পাপ, কিন্তু এরূপ স্থলে সেই মিথ্যার অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। যে স্থলে সত্য বলিলে পরের অনিষ্টসম্ভাবনা, অথচ কিছু না বলিলে আত্মপীড়ন অবশ্যম্ভাবী, সেখানে পীড়ন সহ্য করিয়া কিছু না বলাই ভাল। অসমর্থ হইলে মিথ্যা বলিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

স্বাধ্যায় ঃ—

বেদাদি-শাস্ত্রপাঠ এবং ইষ্টমন্ত্রাদি নিয়মিতভাবে জপের নাম স্বাধ্যায়। এইগুলি বাঙ্‌ময় তপস্যা নামে অভিহিত।

মনের প্রসন্নতা অর্থাৎ বিষয়চিন্তায় ব্যাকুলতারাহিত্য। সর্ব্বলোক-হিতৈষিতা ও প্রতিকূলভাবপরিত্যাগ, একাগ্রতাসহকারে মনন, ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, কাম ক্রোধাদি মলের নিবৃত্তি, কপট ব্যবহার না করা, এইগুলি মানস তপস্যা নামে অভিহিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধারণভাবে জীব ও জগৎ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অদ্বৈততত্ত্বের দৃঢ়ীকরণনিমিত্ত বিশেষভাবে সমুদয় আলোচিত হইবে। ধীমান্ পাঠকগণ একাগ্রতাসহকারে ইহা অনুশীলন করিবেন, নতুবা ইহার বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবে না। আচার্য্য শঙ্কর 'সর্ব্ব-বেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ'নামক গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। কারণ, বেদান্তের অত সরল সিদ্ধান্ত অন্য কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। উহার সম্যক্ অনুশীলন করিলে মানব নিশ্চয়ই বৈরাগ্যশীল হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন।

অদ্বৈতবাদ উপলব্ধি করিতে হইলে এক অদ্বিতীয় সত্তারূপ অধিষ্ঠানেই দৃশ্যমান বহুরূপধারী জগৎপ্রপঞ্চ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইতে হইবে। সাধনচতুষ্টয় কি, ক্রমশঃ তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। যথা—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থ-ফলভোগবিরাগ, শমদমাদিসাধনসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব।

১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক যথা ঃ—

"ব্রহ্মৈব নিত্যমন্যত্তু হ্যনিত্যমিতি বেদনম্।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইতি কথ্যতে ॥"

অর্থাৎ "পরমাত্মা একমাত্র নিত্য বস্তু, ইহা ভিন্ন দৃশ্যমান সমুদায় পদার্থই বিনাশশীল, এই প্রকার জ্ঞান শাস্ত্রে "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক" কথিত হইয়া থাকে।"

মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং ঘটাদি হইতে মৃত্তিকা নিত্য অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি,

সুতরাং দৃশ্যমান জগৎ অপেক্ষা ব্রহ্ম নিত্য। ব্রহ্মের কখনও উৎপত্তি নাই এবং তিনি নিরবয়ব; সুতরাং মৃত্তিকার ন্যায় তাঁহার নাশের কোনও সম্ভাবনা নাই। তিনি সর্ব্ব কার্য্যের কারণ হইয়া চিরকালই আছেন। এই জন্যই তাঁহাকে নিত্য বস্তু বলা হয়। বৈকুণ্ঠ, গোলোকাদি লোকসমুদায়ের অবয়ব আছে, সুতরাং তাহাদের উৎপত্তি আছে বলিতে হইবে। উৎপত্তি থাকিলেই তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী; তজ্জন্য বৈকুণ্ঠ, গোলোকাদির সুখকে অল্পবুদ্ধি জনগণ মুক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ বলিয়া বর্ণনা করিলেও বিচারশীল জ্ঞানিগণ তাহা স্বীকার করেন না। বেদানুকূল বিচার দ্বারা এইরূপ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বরূপনির্দ্ধারণের নাম—"নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক"নামক প্রথম সাধন।

২। বিরক্তি যথা :—

"ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ তদ্ বৈরাগ্যমিতীর্য্যতে।"

"ঐহিক এবং পারলৌকিক দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য (শাস্ত্রদৃষ্ট) সমস্ত বস্তুর অনিত্যত্ব উপলব্ধি করত তৎসমুদায়লাভের বা ভোগের নিমিত্ত বাসনাত্যাগ করার নাম বৈরাগ্য।" এই লৌকিক ভোগ যথা—সুগন্ধ দ্রব্য, ঐশ্বর্য্য, মান, সুন্দরী স্ত্রী, গৃহ ও অণিমাদিসিদ্ধি। পারলৌকিক ভোগ যথা—স্বর্গ, ইন্দ্রত্ব, বৈকুণ্ঠাদি-লোকপ্রাপ্তি, দেবদেহলাভ ইত্যাদি। এই উভয় প্রকার বস্তুর স্থায়িত্ব এবং পরিণাম চিন্তা করত, যদি কাহারও সেই ভোগসমুদায় কাকের বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণিত বলিয়া মনে হয় এবং তজ্জন্য তিনি সেই সমুদয়ে নিস্পৃহ হন, তবে তাঁহাকে বৈরাগ্যবান্ বলা যায়। বস্তুতঃ আমরা সংসার এবং সাংসারিক কাম, কাঞ্চনের আশায় এবং দেব-মানব-তির্য্যগাদি দেহলাভমোহে কতটা ব্যাকুল, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। যে দেহপুষ্টির নিমিত্ত নানাপ্রকার অকার্য্য এবং কুকার্য্য সর্ব্বদাই

আমরা অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা নিশ্চিতই বিস্ময়াবহ। দেহের উৎপত্তি হইতে নাশপর্য্যন্ত অবস্থাগুলি পর পর আলোচনা করিলে কতকটা ইহার স্বরূপ অনুভূত হয়। মূত্রদ্বার পথে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া দশমাসকাল বিষ্ঠা, মূত্রের মধ্যে অবস্থান এবং শত শত কৃমিকীটের দংশনযাতনা অনুভব, মায়ের কটুতিক্ত আহার্য্য দ্বারা পুষ্ট মাংসপিণ্ডে, কত প্রকার নিত্য নূতন যাতনা প্রতি জীবই অনুভব করিয়া থাকে, তাহা যদি কাহারও স্মৃতিপথে উদিত হইত, তাহা হইলে নিতান্ত মূঢ় ভিন্ন কে এতাদৃশ যাতনা অনুভবের নিমিত্ত পুনরায় মাতৃগর্ভবাসরূপ মরণ পথের যাত্রী হইত ?

গর্ভবাসরূপ নরক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অসহায় অবস্থায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দুঃখ, রোগাদি সর্ব্বাবস্থায় রোদনমাত্র সম্বলপরায়ণ হইয়া যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা জীবমাত্রই ভোগ করিয়া থাকে, তাহা যদি কাহারও স্মৃতিপথে উদিত হয়, অথবা চিন্তা দ্বারা কেহ বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে কেহই আর ঐ যাতনাভোগের নিমিত্ত নানাপ্রকার সদসৎ কর্ম্মে লিপ্ত হইত না। কৌমারাবস্থায় চাঞ্চল্য, নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রভৃতি কারণহেতু সর্ব্বদাই আত্মীয়, অনাত্মীয়প্রভৃতি দ্বারা তাড়িত হইয়া মানবমাত্রেই যে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা যৌবনাগমে তিরোহিত হইয়া যায়, জগৎ যেন কি এক নূতন সুখের সংবাদ বলিয়া দেয়। কামাতুরত্বপ্রযুক্ত ঔদ্ধত্য, মর্য্যাদালঙ্ঘন, যুবতী-সমাগমপ্রভৃতি নূতন আশায় উৎফুল্ল হইয়া পতঙ্গের ন্যায় দেহ, মনঃ, ধন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও চিন্তা আসে না। আবার বৃদ্ধকালে সেই ব্যক্তিই চিন্তার অনলে, অবজ্ঞার কশাঘাতে, দীনতার আবরণে, রোগশোকের ভীষণ প্রকোপে যে দুরবস্থায় উপনীত হয়, তাহা যদি কাহারও মানসনয়নে জাগরূক হইত, তবে কি কেহ এতাদৃশ যাতনা ভোগ করিতে করিতে ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া যাইত ? মৃত্যুকাল উপস্থিত, শিয়রে যমদূত দণ্ডায়মান, উর্দ্ধশ্বাসের দুঃসহ যাতনা, মর্ম্মসমুদয়ের ভয়ানক পীড়া এবং অতীতকালে কৃত কর্ম্মের

অনুতাপে দহ্যমান ব্যক্তির তীব্র যন্ত্রণার বিষয় একবার চিন্তা করিলে সংসার আর সুখের বোধ হইবে না। অনন্তর মৃত্যুর পর কি হইবে স্বর্গাদি সুখ অথবা নরকাদি দুঃখ কিংবা পুনরায় সংসারে আগমন, কোনটী আমার লভ্য যদি এই সমুদয় কখনও চিন্তা করা যায়, তবে এই অল্প কালের জন্য সুখাশার উন্মাদনা একে বারে নিভিয়া যায়। বৈরাগ্যের তীব্র কশাঘাতে অস্থির হইয়া কোথায় যাই? কি করিব, কিসে শান্তি পাইব, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাই, জগৎ কি, জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি কঠিন সমস্যাসমূহ যুগপৎ হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধনপ্রভৃতি কাম্য বস্তুসমূহ যে সুখের বলিয়া বোধ হয়, তাহা বিচারহীন ব্যক্তিরই সম্ভব। জল চলিয়া যাইলেও কাঁকড়া যেমন নিজের গর্ত্ত ছাড়িয়া যাইতে পারে না, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ মানবগণও গৃহপ্রভৃতির সুখে আসক্ত হইয়া কখনও ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে কারাগৃহের সহিত এই গৃহের পার্থক্য নাই, সুখভোগ আশারূপ শৃঙ্খল গৃহীর চরণের গতিকে বদ্ধ করিয়াছে। পত্নী, পুত্রের আশা তাহার কণ্ঠদেশ আরদ্ধ করিয়াছে এবং অতিশয় ধনার্জ্জন দ্বারা সুখী হইবে এই আশা তাহার জীবননাশের কারণ হইয়া রহিয়াছে। এই যে পুত্রের নিমিত্ত আশা, বিত্তের নিমিত্ত আশা এবং ইহলোক, পরলোকে সুখলাভের আশা, তাহাকে চিরকাল অধীন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ চারি পাশে ঘেরিয়া দণ্ডায়মান, সাধ্য কি ইহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিবে। যে স্ত্রীলোকের আশায় জীব-জগৎ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় কামাগ্নির আহুতিস্বরূপ হইতেছে, তাহার স্বরূপ কি? মুখ শ্লেষ্মা উদ্গীরণ করে, নাসিকা মলে পূর্ণ, নয়ন অশ্রুসিক্ত, শরীরের সর্ব্বাংশ হইতে স্বেদরূপ মল নিসৃত হইতেছে, ইহাইত দেহের

স্বরূপ। ইহাতে যাহার চিত্ত আসক্ত, সে বিবেকী বুদ্ধিমান্ এবং সাধক ইত্যাদি। ধন্য মায়া এবং তাহার লীলাবিলাস। প্রকৃত সাধক বলেন—

"কাম এব যমঃ সাক্ষাৎ কান্তা বৈতরণী নদী।
বিবেকিনাং মুমুক্ষূণাং নিলয়স্তু যমালয়ঃ॥"

অর্থাৎ বিবেকী মুমুক্ষুর নিমিত্ত কামই যম, স্ত্রীই বৈতরণী নদী এবং নিজ গৃহই সাক্ষাৎ যমের গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক যম এবং কামের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিলে যমই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, কারণ, যম অসাধুগণের দণ্ড বিধান করেন এবং সাধুগণের অনুকূল হইয়া থাকেন। কিন্তু কাম সাধুগণেরও সর্ব্বনাশের কারণ হয়। অসাধুগণের কথা আর কি বলা যাইবে? ধন্য কাম, যাহার ফলে সমুদয় সাধনাই নিশ্চল হয়, কিন্তু উহাই আবার জীবজগতের উৎপত্তির কারণ। কাম কি মোহময়, তাই পরমজ্ঞানী আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—

"কামো নাম মহান্ জগদ্‌ভ্রময়িতা স্থিত্বাহন্তরঙ্গে স্বয়ং
স্ত্রীপুংসাবিতরেতরাঙ্গকগুণৈর্হাসৈশ্চ ভাবৈঃ স্ফুটম্।
অন্যোন্যং পরিমোহ্য নৈজতমসা প্রেমানুবন্ধেন তৌ
বদ্ধ্বা ভ্রাময়তি প্রপঞ্চরচনাং সংবর্দ্ধয়ন্ ব্রহ্মহা॥"

"কামই মহান্, এই কামই জগতের ভ্রান্তিহেতু, এই কাম হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষকে পরস্পর আসক্ত করে, কামজনিত মোহই সেই আসক্তির রজ্জুস্বরূপ। যাহার প্রভাবে পরস্পরের অঙ্গসৌন্দর্য্যপ্রভৃতি গুণ দেখিতে পায়, ইহার প্রভাবে হাস্যাদি পরস্পরের মোহের কারণ হয় এবং এই কামই প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া জগজ্জাল সৃষ্টির কারণ হয়। কিন্তু তজ্জন্য ইহাকে ব্রহ্মহা বলা যায়, কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিতে ইহার মত আর দ্বিতীয় কিছুই নাই।"

যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি কামের এই দোষগুলি দর্শন করিয়া তাহা হইতে

বিরত হইবেন। কাম অপেক্ষা ধনের দোষ অনেক অধিক, কারণ বাল্য এবং যৌবন অতিবাহিত হইলে কাম নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ধনাশা কখনও বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু ধনের দ্বারা কি হয়? ধন ভয়ের হেতু, তজ্জন্য সতত দুঃখের কারণ। ইহা বন্ধুবিচ্ছেদের কারণ, ধন উৎকৃষ্ট গুণগুলি নষ্ট করে, সুতরাং ধনের দ্বারা কোন কালেই মুক্তির আশা নাই। ধন থাকিলেই রাজা, চোর বা জ্ঞাতিকুল অপহরণ করিবে বলিয়া সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হইতে হয়, সুতরাং সুখে নিদ্রা যাইবার উপায় থাকে না। ধন অর্জ্জন করিতে কষ্ট, রক্ষা করিতে কষ্ট, ব্যয় করিতে বা দান করিতে ততোধিক কষ্ট। ধনলাভ হইলে সাধুগণেরও বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। ধন না থাকিলে হৃদয় সর্ব্বদা তাপিত থাকে—ভোগ করিলে মত্ততা আসে, দান করিলে পুনরায় তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং ইহাতে সুখ কোথায়? সম্পত্তিশালী মনুষ্য চক্ষুঃ থাকিতেও কর্ণ দ্বারা দর্শন করে, মূর্খগুলি তাহার অনুচর হয়। সুতরাং সাধুজনবিগর্হিত পথে সত্বরই ধাবিত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় এবং অনন্ত নরকের যাত্রী হয়। বাস্তবিক ধনী লোকের পুত্র, মিত্র, কলত্র কেহই আপন নহে, তাহার নির্জ্জনে, জনপদে, নগরে, গ্রামে, কোথাও সুখ নাই; সর্ব্বদা ভীত হইয়া বাস করিতে হয়। এই সমস্ত চিন্তা করিলে ধনের এবং ধনীর পরিণাম উপলব্ধ হয়। ফলতঃ কাম এবং কাঞ্চন এই উভয়ই সর্ব্বনাশের কারণ, এতাদৃশ বিচার যাহার চিত্তে উদিত না হয়, তাহার বিবেক ও বৈরাগ্যের আশা নিতান্তই নিষ্ফল। যথা:—

"সুখমিতি মলরাশৌ যে রমন্তেঽত্র গেহে
ক্রিময় ইব কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুষক্ত্যা।
সুরপদ ইব তেষাং নৈব মোক্ষপ্রসঙ্গ-
স্ত্বপি তু নিরয়-গর্ভাবাস-দুঃখপ্রবাহঃ॥"

"যে ব্যক্তি মলরাশিপূর্ণ গৃহকেই স্বর্গসুখ বলিয়া অনুভব করে; কলত্র, পুত্র, ক্ষেত্রাদিতে বিষ্ঠার ক্রিমির ন্যায় আসক্ত হয়, তাহাদের কোন কালেও মোক্ষের আশা নাই। পরন্তু এই দুঃখসঙ্কুল সংসারে তাহাদিগকে বারংবার জন্ম-মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যাতনাক্লিষ্ট হইতে হয়।" ফলতঃ মরণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে কান্তা, জিহ্বা এবং ধন এই তিনটী মৃত্যুর সহচরকে ত্যাগ করিতে হইবে। যথা—

"মুক্তিশ্রীনগরস্য দুর্জ্জয়তরং দ্বারং যদস্ত্যাদিমং
তস্য দ্বে অররে ধনং চ যুবতী তাভ্যাং পিনদ্ধং দৃঢ়ম্।
কামাখ্যার্গলদারুণা বলবতা দ্বারং তদেতৎ ত্রয়ং
ধীরো যস্তু ভিনত্তি সোঽর্হতি সুখং ভোক্তুং বিমুক্তিপ্রিয়ম্॥"

মোক্ষলক্ষ্মী যে নগরীতে বাস করেন, তাহার দ্বার অতিশয় দুর্জ্জয়; কারণ ধন এবং পত্নীরূপ কপাটদ্বয়ে তাহা বদ্ধ, তাহাতে কামরূপী কাষ্ঠময় অর্গল (খিল) দ্বারা আবদ্ধ আছে। যিনি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে এই তিনটী বস্তুকে ভেদ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষলক্ষ্মীভোগে সমর্থ, ইহাই সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় বস্তু বিরক্তি। এই বিরক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে তাঁহার মোক্ষলাভের উপযোগিতা আসে। যাহার বৈরাগ্য নাই তাহার চিত্ত কি প্রকারে স্থির হইবে, যাহার চিত্তের স্থিরতা নাই সে আবার সমাহিত হইবে কি প্রকারে? এবং সমাধি ভিন্ন মুক্তি কোথায়?

(৩য়) শমাদিষট্‌সম্পত্তি যথা—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান।

(ক) শম—"একবৃত্ত্যৈব মনসঃ স্বলক্ষ্যে নিয়তস্থিতিঃ।
শম ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শমলক্ষণবেদিভিঃ॥"

আত্মাতে নিয়ত স্থিতিরূপ যে মনের একাকার বৃত্তি, ইহাকে

সাধুগণ শম বলিয়া থাকেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ইহা ত্রিবিধ।

যথা—সবিকারং পরিত্যজ্য বস্তুমাত্রতয়া স্থিতিঃ।
মনসঃ সোত্তমা শান্তি র্ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা॥"

সমুদায় বিকার পরিত্যাগ করিয়া মনঃ যখন পরমার্থ বস্তুতে স্থিতি লাভ করে, তখন তাহারই নাম উত্তম শম, তাহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণস্বরূপ।

"প্রত্যক্‌প্রত্যয়সন্তানপ্রবাহকরণং ধিয়ঃ।
যদেষা মধ্যমা শান্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥"

"বাহ্যবস্তুসংসর্গ ত্যাগ করত আভ্যন্তর বস্তুতে মনঃ যদি একভাবে প্রবাহিত হয়, তাহার নাম মধ্যম শম, উহা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ।

"বিষয়ব্যাপৃতিং ত্যক্ত্বা শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ।
মনসঃ নেতরা শান্তিঃ মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥"

"বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিয়া গুরুমুখে বেদান্তবিচার শ্রবণ করত তাহাতে স্থিতি হইলে, তাহাকে "অধম শম" বলা যায়, ইহাই মিশ্র-সত্ত্বস্বরূপ।

"যেন নারাধিতো দেবো যস্য ন গুর্ব্বনুগ্রহঃ।
ন বশ্যং হৃদয়ং যস্য তস্য শান্তির্ন সিধ্যতি ॥"

যে দেবতা আরাধনা করে নাই, যাহার প্রতি গুরুর অনুগ্রহ হয় নাই এবং যাহার চিত্ত বশীভূত নহে, তাহার এতাদৃশী শান্তিলাভের আশা কোন দিনই নাই।"

(খ) দমঃ—ব্রহ্মচর্য্যাদিভি র্ধর্ম্মৈ বুদ্ধে র্দোষনিবৃত্তয়ে।
দণ্ডনং দম ইত্যাহু র্মনসঃ শান্তিসাধনম্।"

"কামক্রোধাদি দোষনিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্যপ্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা মনকে নিয়ত শান্ত করার নাম দম।"

ইন্দ্রিয়গুলি শব্দস্পর্শাদি ভোগ্য বিষয়ে সর্ব্বদা ধাবিত হয়। বায়ু যেমন অগ্নির অনুসরণ করে, অন্তঃকরণও স্বভাবের বশে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করে। ঐ ইন্দ্রিয়গুলি নিরুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ নিজের বেগ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করে, উহাই মুক্তির কারণ। প্রাণায়ামাদি দ্বারা সাময়িক চিত্তের ঐ প্রকার অবস্থা হইলেও তাহাকে দম বলা যায় না। যখন সর্ব্বেন্দ্রিয় নিগৃহীত হইয়া স্থিরতার দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকেই দম বলা হয়। তজ্জন্য অভিমান বিসর্জ্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, জাতি, বর্ণ এবং আশ্রমে আমি শ্রেষ্ঠ—এইরূপ বোধের নাম অভিমান। এই অভিমান দমসাধনের অতি প্রতিকূল।

(গ) তিতিক্ষা—

"আধ্যাত্মিকাদি যদ্ দুঃখং প্রাপ্তং প্রারব্ধবেগতঃ।
অচিন্তয়া তৎসহনং তিতিক্ষেতি প্রচক্ষতে॥"

"প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগবশতঃ আধ্যাত্মিকপ্রভৃতি যে কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে চিন্তাশূন্য হইয়া তাহা" সহ্য করার নাম তিতিক্ষা। এই তিতিক্ষা মোক্ষার্থীর পরম ধন, নতুবা কোনরূপ দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় সমুদয় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সাধু-সেবা, পরের তিরস্কারসহন ইত্যাদি ক্ষমতা তিতিক্ষা দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত বিঘ্ন যিনি তিতিক্ষাবলে সহ্য করিতে পারেন, তিনিই অণিমাদি সিদ্ধিসকল লাভ করিতে পারেন। তিতিক্ষা ভিন্ন কোন প্রকার সিদ্ধিরই সম্ভাবনা নাই। সাধক যদি কিসে রোগশান্তি হইবে, কিসে দুঃখ দূর হইবে, এই চিন্তায় মুগ্ধ হইয়া সাধনাদি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি লাভ হইতে পারে; এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ

মৃত্যু হইলে তাঁহার কি গতি হইবে? সুতরাং এতাদৃশ চিন্তা ত্যাগ করত তিতিক্ষার আশ্রয় একমাত্র উপায়।

(ঘ) উপরতি—

"সাধনত্বেন দৃষ্টানাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাম্।
বিধিনা যঃ পরিত্যাগঃ স সন্ন্যাসঃ সতাং মতিঃ ॥"

"স্বর্গাদি সাধনের নিমিত্ত বেদশাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্ম বিহিত আছে, সেই সমুদায় নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক ত্যাগের নাম সন্ন্যাস বা উপরতি!" বেদে কর্ম্ম দ্বারা সাবিত ফল অল্প এবং তাহা মোক্ষজনক নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং সেই কর্ম্ম মোক্ষার্থীর সেব্য নহে। কর্ম্মের ফল চারি প্রকার যথা—উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য এবং বিকার্য্য। উপাদান কারণ বিকৃত হয় না অথচ ক্রিয়াদ্বারা সেই উপাদান হইতে একটী নূতন বস্তু যদি উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদ্য কর্ম্ম বলা যায়; যেমন পট করিতেছে। এস্থলে সূত্র দ্বারা পট নির্ম্মিত হইতেছে অথচ সূত্রের বিনাশ বা বিকার কিছুই হয় নাই। দ্বিতীয় আপ্য কর্ম্ম, ক্রিয়াদ্বারা কোন বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয় না, অথচ যাহা ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া ব্যবহৃত, সেই জাতীয় কর্ম্মের নাম আপ্য কর্ম্ম। যথা—রাম ঘটকে জানিতেছে, এখানে ঘটকে জানা ক্রিয়ার কর্ম্ম বলা হয়। তৃতীয় সংস্কার্য্য কর্ম্ম, ক্রিয়া দ্বারা যদি কোন প্রকার গুণাধান অথবা দোষের অপনয়ন করা হয়, তাহার নাম সংস্কার্য্য কর্ম্ম। যথা ধান্যকে প্রোক্ষণ করিবে, উক্ত স্থলে ধান্যে জল ছিটান হয়, যদিও তৎকালে তাহার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না, তথাপি ঐ ধান্য হইতে চাউল বাহির করিয়া পিষ্টকাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং তাহাতে কোন অদৃষ্ট ফল আসিয়াছে বলিতে হইবে। কারণ তদ্ভিন্ন অন্য ধান্য দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন হয় না। ইহারই নাম সংস্কার্য্য কর্ম্ম।

চতুর্থ বিকার্য্য কর্ম্ম। যথা—দুগ্ধকে দধি করিতেছে, এ ক্ষেত্রে দুগ্ধকে বিকৃত করিলে দধি উৎপন্ন হইতেছে, ইহাই বিকার্য্য কর্ম্ম। ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ, সর্ব্বদা প্রাপ্ত, বিশুদ্ধ এবং নিষ্ক্রিয়, সুতরাং এই চারি প্রকার কোন কর্ম্মের ফলদায়ী হয় না। ইহার কোন উৎপাদয়িতা নাই, "ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কোন কারণ নাই, সুতরাং তিনি কোন ক্রিয়ার উৎপাদ্য কর্ম্ম হইতে পারেন না। ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তুর পক্ষে প্রাপ্তি-স্বরূপ, সুতরাং তিনি প্রাপ্তি-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারেন না। মলিন হইলেই তাহার সংস্কার প্রয়োজন, যেমন দর্পণ। ব্রহ্ম চিরকাল আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ, সুতরাং তাঁহার কোনরূপ সংস্কার করিবার প্রয়োজন নাই। অবয়ববিশিষ্ট দুগ্ধ ও কাষ্ঠাদির বিকার সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্ম নিরবয়ব, সুতরাং তাঁহার বিকারও সম্ভব নহে। অতএব কোন প্রকার কর্ম্ম দ্বারা তিনি লভ্য নহেন। যাহা কর্ম্ম-লভ্য তাহাই বিনাশী। ব্রহ্ম নিত্য এবং সনাতন, কর্ম্ম দ্বারা লভ্য ভোগ-সকল যেরূপ কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুণ্য দ্বারা অর্জ্জিত লোকসমুদয়ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিদ্বান্ তাদৃশ লোকসমুদয়ে মুগ্ধ হন না। "ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া, ন ধনেন ন চেজ্যয়া" এই শ্রুতি অনুযারী কর্ম্ম, পুত্র, ধন বা যজ্ঞ দ্বারা তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব। "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" এই শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লভ্য, সুতরাং স্বর্গাদি অনিত্য ফলের সাধক যে সমস্ত কর্ম্ম করেন, তাহা ত্যাগ করিয়া সাধককে সন্ন্যাসরূপ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ বলেন যে বিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং বেদান্তবাক্যের শ্রবণ উভয়ই একসঙ্গে মোক্ষলাভের সাধন, সুতরাং সন্ন্যাসগ্রহণব্যতিরেকেও গৃহস্থ অবস্থায় তাহা সিদ্ধি হইতে পারে। বর্ত্তিকে (বাতিকে) সরল করিয়া দিলে যেমন দীপশিখা অমনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহা অযৌক্তিক। কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় মার্গে অধিকারী দুই প্রকার ও তাহার

সাধন সামগ্রীও দ্বিবিধ। ধন-ধান্য-নিমিত্ত-যাগ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ও কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোক অনিত্য, সুতরাং পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন —"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" এইরূপ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু বেদান্তবাক্যশ্রবণ দ্বারা ক্রমশঃ অভিমানশূন্য হয় এবং কর্ম্মদ্বারা ক্রমশঃ বাড়ে ও সুতরাং আলো ও আঁধারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের সমাবেশ কি প্রকারে হইতে পারে? যেমন অগ্নি ও তৃণ পরস্পর মিলিত হইয়া কোন প্রকার কার্য্য করা সম্ভবপর নহে, তেমনই কর্ম্ম এবং জ্ঞানমার্গ পরস্পর মিলিত হইতে পারে না। যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ কাষ্ঠসমূহ সূর্য্যের কিছু উপকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কোটি কর্ম্মের দ্বারাও সাক্ষাৎভাবে মুক্তির কিছুই উপকার সাধিত হয় না। জ্ঞান উদিত হইলে কর্ম্ম বিলীন হইয়া যায়। কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম করিতে বা নাও করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুর জ্ঞান কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন নহে। উহা প্রমাণ ও যথাভূত বস্তুর অধীন, জ্ঞান কোন প্রকার কর্ম্ম বা যুক্তির আশ্রয় লয় না। প্রমাণের অনুৎকটত্বনিবন্ধন সংশয়াদি যে যে দোষ জন্মে, সে সকল বস্তুর পরতন্ত্র নহে। চক্ষুঃ যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে যেরূপ বস্তুর প্রকৃত বোধ জন্মে, তদ্রূপ বেদানুযায়ী যে জ্ঞান তাহাও বাস্তব। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিরক্তি হইলেই সংসার ত্যাগ করিবে। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম বিরক্তের জন্যই বিহিত হইয়াছে। দৃশ্য বস্তুর সহিত অন্তঃকরণবৃত্তির সর্ব্ববিধ সম্বন্ধত্যাগই সন্ন্যাসশব্দের প্রকৃত অর্থ এবং বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ তাহার অঙ্গ বলিয়া উহা গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ বিধান। যে ব্যক্তির গন্ধ, মাল্য, স্ত্রীআদিতে আসক্তি দূর হয় নাই, তাহার যাগ, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠেয় ও যিনি সে সমুদয় ভোগ্য বস্তুর স্বরূপ বিচার করিয়া ত্যাগ করিতে সমর্থ, তাঁহারই নিমিত্ত ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং গৃহস্থ অবস্থায় থাকিয়া

ভোগে রত হইয়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কারণ একটী প্রবৃত্তিমার্গ, অন্যটী নিবৃত্তিমার্গ।

শ্রদ্ধা—"গুরুবেদান্তবাক্যেষু বুদ্ধির্যা নিশ্চয়াত্মিকা।
সত্যমিত্যেব সা শ্রদ্ধানিদানং মুক্তিসিদ্ধয়ে।।"

"গুরু এবং বেদান্তবাক্যকে সত্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শ্রদ্ধা।" এই শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। বেদ বলেন:—"শ্রদ্ধস্ব সৌম্য" "হে সৌম্য! তুমি শ্রদ্ধাবান্ হও।" শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হয় না, সিদ্ধি ত দূরের কথা। শাস্ত্র বলেন—

"দেবে চ বেদে চ গুরৌ চ মন্ত্রে
তীর্থে মহাত্মন্যপি ভেষজে চ।
শ্রদ্ধা ভবত্যস্য যথা যথাহন্ত—
স্তথা তথা সিদ্ধিরুদেতি পুংসাম্"।।

"ইষ্টদেবতা, বেদ, গুরু, মন্ত্র, তীর্থ, মহাত্মা ও ঔষধ এই সকলের উপর যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহার তাদৃশ ফল হইয়া থাকে"। যথার্থ-বাদিতাই শ্রদ্ধা উৎপত্তির কারণ। সুতরাং যথার্থ বস্তু বেদের উপর যাহার শ্রদ্ধা না হইবে, সে যথার্থবাদী কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। কঠোপনিষদে শ্রদ্ধাসম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। এক সময় নচিকেতার পিতা যজ্ঞক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইয়া বৃদ্ধ (সুতরাং অপত্যসম্ভাবনা-হীন) কতকগুলি গরু দান করিতেছিলেন। পিতার এইরূপ শ্রদ্ধাহীনতা অবলোকন করত নচিকেতা বলিলেন, পিতঃ! আমাকে কাহাকে দান করিবেন? দুই তিন বার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতা কুপিত হইলেন এবং বলিলেন যে, তোমাকে যমকে দান করিলাম। পিতার এইরূপ অপ্রিয় বচন শ্রবণ করিয়া নচিকেতা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি

পিতার পুত্র ও শিষ্যের মধ্যে হীন কখনও নহি। কোন বিষয়ে উত্তম, কোন বিষয়ে মধ্যম। সুতরাং এতাদৃশ উক্তির কারণ কি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পিতার যজ্ঞক্রিয়া সমাপ্ত হইল। নচিকেতা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন পিতঃ! আপনাকে জিজ্ঞাসা করায় আপনি আমাকে যমকে দিলেন, এইরূপ বলিয়াছিলেন, সুতরাং আপনার উচ্চারিত বাক্য সত্য হওয়া প্রয়োজন, কারণ আপনি কখনও মিথ্যা বলেন না, বিশেষ আপনি যজ্ঞ-কার্য্যে ব্রতী। সুতরাং আমাকে যমালয়ে যাইতে অনুমতি দিন। পিতা নিজ বুদ্ধিদোষে দুঃখিত হইলেও নচিকেতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তাহার ফলে নচিকেতা যমের নিকট যে আত্মতত্ত্ব ও যোগবিদ্যা অভ্যাস করেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। তাঁহার শ্রদ্ধার ফলে তিনি যে অমূল্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, আজও তাহা মরণধর্ম্মশীল মানবকে অমরত্বের পথ দেখাইতেছে। নচিকেতার শ্রদ্ধার ফলে মৃত্যুর অধীশ্বর যমের নিকট আত্মজ্ঞান লাভ হইল এবং সেই শ্রদ্ধাই তাঁহাকে আত্মজ্ঞ গুরুর চরণ দর্শন করাইল; তাই শ্রদ্ধাকে এত উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

(৩) চিত্তসমাধান—

"শ্রুত্যুক্তার্থাবগাহায় বিদুষাং শ্রেয়োবস্তুনি।
চিত্তস্য সম্যগাধানং সমাধানমিতীর্য্যতে ॥"

"শ্রুতিতে যে আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্যক্ বোধের নিমিত্ত সেই শ্রেয়ঃ বস্তুতে চিত্তের যে একাগ্রতা, তাহাকে পণ্ডিতগণ সমাধান বলেন। অর্থাৎ শ্রুতিকথিত অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয় উপদেশসমূহ গুরুমুখে শ্রবণ করত তাহাতে চিত্ত স্থির করিলে যখন তাহা একাগ্রভূমিতে উপস্থিত হইবে, তখনই চিত্ত সমাহিত হইয়াছে বলা যাইবে। চিত্তের একাগ্রতাভিন্ন মোক্ষলাভ একান্ত অসম্ভব। ব্যাধ যেমন বধ্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করত লক্ষ্যবেধে কৃতকার্য্য হয়, তদ্রূপ আত্মাতেও চিত্ত সম্যক্ স্থির করিতে

পারিলেই আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব; তজ্জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তির চিত্ত স্থির করিতে সর্ব্বদা যত্ন করা আবশ্যক। ভোগ্যবস্তুসমূহে তীব্র বিরক্তি এবং মোক্ষলাভে একান্ত আগ্রহ দ্বারাই একাগ্রতা সিদ্ধি হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যপ্রভৃতি মোক্ষের বহিরঙ্গ সাধন এবং শমাদি ছয়টী সাধনই অন্তরঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। এই অন্তরঙ্গ সাধনগুলি অন্তরে স্থাপন করিতে না পারিলে কোটি প্রযত্নেও জ্ঞানলাভের কোন সম্ভাবনা নহে। কেবল শ্রবণ দ্বারা পাণ্ডিত্য ভিন্ন আর কিছুই হইবে না।

(৪) মুমুক্ষুত্ব—

"ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদ্ যদ্ বিদ্বান্ মোক্তুমিচ্ছতি।
সংসারপাশবন্ধং তন্মুমুক্ষুত্বং নিগদ্যতে॥"

"জীব ও ব্রহ্ম একই—এতাদৃশ জ্ঞান অবলম্বন করত পণ্ডিত ব্যক্তি যে সংসারপাশ হইতে মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাহারই নাম মুমুক্ষা"। তীব্র, মধ্যম, মন্দ ও অতিমন্দভেদে এই মুমুক্ষা চারি প্রকার। যথা—

(ক) তীব্রমুমুক্ষা—

"তাপৈস্ত্রিভির্নিত্যমনেকরূপৈঃ
সন্তোগ্যমানঃ ক্ষুভিতান্তরাত্মা।
পরিগ্রহং সর্ব্বমনর্থবুদ্ধ্যা
জহাতি সা তীব্রতরা মুমুক্ষা॥"

"আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিকভেদে তাপ ত্রিবিধ। প্রকারভেদে তাহা অনেক প্রকার দুঃখের কারণ হয় এবং সেই ত্রিবিধ তাপে অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া কিসে পরিত্রাণ পাইবে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সমুদয় অনর্থকর নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার সঙ্গত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, এতাদৃশ ইচ্ছার নাম তীব্রতর মুমুক্ষা।"

(খ) মধ্যমমুমুক্ষা—

"তাপত্রয়ং তীব্রমবেক্ষ্য বস্তু
দৃষ্ট্বা কলত্রান্ তনয়ান্ বিহাতুম্ ।
মধ্যে দ্বয়ো র্লোড়নমাত্মনো যৎ
সৈষা মতা মাধ্যমিকী মুমুক্ষা ॥"

"ত্রিবিধ তাপজনিত কষ্ট অনুভব করিয়া এবং বেদান্তাদিসাহায্যে পরম বস্তু জানিয়া যদি কেহ সংসার ও বৈরাগ্য এই উভয়ের মধ্যে কোনটি অবলম্বন করিব,—এইরূপ সংশয়-দোলায় আলোড়িত হইতে থাকেন, তবে তাঁহার মুমুক্ষা মাধ্যমিকী।"

(গ) মন্দমুমুক্ষা যথা—

"মোক্ষস্য কালোঽস্তি কিমদ্য মে ত্বরা
ভুক্ত্বৈব ভোগান্ কৃতসর্ব্বকার্য্যঃ ।
মুক্ত্যৈ যতিষ্যেঽহমেতি বুদ্ধিঃ
এষৈব মন্দা কথিতা মুমুক্ষা ॥"

"মোক্ষলাভের এখনও অনেক সময় আছে, সুতরাং তাহার জন্য ত্বরান্বিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমার যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, তাহা সম্পাদন করিয়া লই। যত প্রকার ভোগ আছে, তাহা ভোগ করিয়া তাহার পর মুক্তির চেষ্টা করিব, এই প্রকার যে বুদ্ধি তাহার নাম মন্দমুমুক্ষা"।

(ঘ) অতিমন্দমুমুক্ষা—

"মার্গে প্রয়াতুর্ম্মণিলাভবন্মে
লভ্যেত মোক্ষো যদি নাম ধন্যঃ ।
ইত্যাশয়া মূঢ়ধিয়াং মতির্যা
সৈষাঽতিমন্দাভিমতা মুমুক্ষা ॥

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ যদি মণিলাভ হয়, তদ্রূপ সংসারিক সমুদয় কাজ করিতে করিতে ভাগ্যবশতঃ যদি মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে মণি-

লাভকারীর ন্যায় ধন্য হইতে পারিব ইত্যাকার যে বুদ্ধি, ইহা মূঢ়মতিগণের হইয়া থাকে। তাহারই নাম অতি মন্দমুমুক্ষা।

বহুজন্মার্জ্জিত তপস্যার ফলে যাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, ঈশ্বর আরাধনা করিতে করিতে তদীয় কৃপায় যাঁহার চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যিনি শাস্ত্র-দৃষ্টি দ্বারা নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই তীব্রতর মুমুক্ষার অধিকারী। কাহারও হস্তে উত্তপ্ত পাত্র প্রদান করিলে সে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে, তদ্রূপ তীব্রতাপ যাঁহার লাগিয়াছে, তিনিই মোক্ষেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হন এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় জীবদ্দশাতেই মুক্তিলাভ করেন।

মধ্যমাধিকারী সাধক জন্মান্তরে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, মন্দাধিকারী যুগান্তরে এবং অতিমন্দাধিকারী কোটিকল্পেও মুক্ত হইবে কিনা সন্দেহ।

শূকর-কুকুরগণের ন্যায় যাহারা আত্মোদর ভরণেই তুষ্ট, তাহাদের নরজন্মে ধিক্! বহু তপস্যার ফলে সুদুর্লভ নরজন্ম হয়, তন্মধ্যে পুরুষদেহ আরও দুর্লভ, তদপেক্ষা বিবেকজ্ঞান আরও দুর্লভ, সুতরাং এই সমুদয় লাভ করিলে মোক্ষলাভের যত্নই অবশিষ্ট থাকে। তাহা যাহার না হয় তাহার জন্মে ধিক্ এবং তাহার মতিকেও শতধিক্। যতক্ষণ না জরা দেহ আক্রমণ করে, যতক্ষণ বুদ্ধি বিভ্রান্ত না হয় এবং যতক্ষণ মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত না হয়, ততক্ষণই মুক্তির জন্য চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। মুখে মুমুক্ষুত্ব দেখান সকলেরই সম্ভব; কিন্তু যিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর। এই সমুদয় লক্ষণগুলি অর্জ্জন করিয়া গুরুর নিকট যাইতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

"উক্তসাধনসম্পন্নো জিজ্ঞাসুর্যতিরাত্মনঃ।
জিজ্ঞাসায়ৈ গুরুং গচ্ছেৎ সমিৎপাণির্বিনয়োজ্জ্বলঃ ॥
শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ প্রশান্তঃ সমদর্শনঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্ব নিষ্পরিগ্রহঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষঃ করুণামৃতসাগরঃ
এবংলক্ষণসম্পন্নঃ স গুরু র্ব্রহ্মবিত্তমঃ।
উপাস্যঃ প্রযত্নেন জিজ্ঞাসোঃ সাধ্যসিদ্ধয়ে।"

"সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন যতি আত্মতত্ত্বজ্ঞানার্থী হইয়া উপহারার্থ অন্ততঃ কিছু 'সমিধ্' গ্রহণ করত, গুরুর নিকট গমন করিবে। যিনি সাঙ্খ্য, বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, প্রশান্তচিত্ত, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, মমতাহীন, অভিমানশূন্য, শীতাতপদ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সংসারে অনাসক্ত, নিরপেক্ষ, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্ন, উপদেশদান-কুশল, যিনি সাতিশয় দয়ালু এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, তিনিই গুরুপদবাচ্য। এতাদৃশজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিতে পারেন এবং পূর্ব্বোক্ত সাধনাদিসম্পন্ন শিষ্যই তাহা গ্রহণের উপযুক্ত, সেই উপদেশের নাম আত্মানাত্মবিবেক।

আত্মানাত্মবিবেক—

আত্মা—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, পঞ্চকোষ হইতে বিলক্ষণ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি আত্মা।

অনাত্মা—

আর অনিত্য, জড়, দুঃখাত্মক, সমষ্টি এবং ব্যষ্টি শরীরত্রয়কে অনাত্মা

বলে। অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে মনুষ্যজ্ঞান করিয়া, দেহের জন্ম ও মৃত্যুকে আত্মার জন্ম মৃত্যু জ্ঞান হইয়া থাকে এবং দেহত্রয়ের সুখ, দুঃখে আত্মাকে সুখী বা দুঃখী মনে করা হয়। এই অজ্ঞান হইতে অবিবেক, অবিবেক হইতে অভিমান, অভিমান হইতে রাগাদি, রাগাদি হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে দেহপরিগ্রহ এবং দেহগ্রহণনিমিত্তই দুঃখ হইয়া থাকে। যখন সর্ব্বাত্মভাবে দেহগ্রহণ নিবৃত্ত হইবে, তখনই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। প্রকৃত বস্তু আত্মাতে মিথ্যাভূত বস্তুর আরোপ করা হয়, তাই আত্মাতে শরীরত্রয় আরোপিত হইয়া থাকে। যাহা সমস্ত বস্তুর মূল কারণ, নিখিল জগৎ যাহার কার্য্য, যাহা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন এবং যাহা ত্রিকালস্থায়ী নহে, এবংবিধ অজ্ঞানের নাম অবস্তু। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অজ্ঞানের স্বরূপ। বস্তুস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে এই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং এই অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। কিন্তু ব্রহ্মকে দূষিত করিবার সামর্থ্য নাই। যেমন সর্পবিষ সর্পের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্রহ্মে আশ্রিত হইয়াও তাহার কোন বিকার ঘটাইতে পারে না। এই অজ্ঞানকে পণ্ডিতেরা প্রকৃতি, শক্তি ও অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। প্রদীপের প্রভা যেমন প্রদীপ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন কিছুই বলা যায় না, অঙ্কুর যেমন বীজের অংশ বা অনংশ কিছুই বলিতে পারা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন কিছুই বলা যায় না। তজ্জন্য ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলা যায়। সেই অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। যেমন বৃক্ষ অনেক প্রকার হইলে বনরূপে তাহার একত্বপ্রতীতি হয়, সেইরূপ অজ্ঞান প্রতিজীবে ভিন্ন ভিন্ন মনে হইলেও, অভেদবশতঃ তাহার একত্ব সিদ্ধ হয়। এই অজ্ঞান সত্ত্বগুণবহুল হইলে তাহাকে মায়া বলা যায়। যিনি এই মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব-ইত্যাদি ধর্ম্মবান্ হন, যাঁহাতে সর্ব্বশক্তি

বর্ত্তমান আছে, যিনি সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ, তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। এই সমষ্টি অজ্ঞান, তাঁহার কারণশরীর নামে অভিহিত। ইহাই তাঁহার আনন্দময় কোষ।

ভিন্ন ভিন্নরূপে অজ্ঞান অনেক এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বিলক্ষণস্বভাব অজ্ঞানের বৃত্তিও অনেক হইয়া থাকে। বন এক হইলেও অনেক বৃক্ষ থাকায় যেমন বহুরূপে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান এক হইলেও ব্যষ্টিরূপে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই ব্যষ্টি অজ্ঞান দ্বারা যে চৈতন্যকে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়, তাহার নাম জীব। এই অজ্ঞানকে জীবের কারণশরীর বলা হয় এবং জীব স্বল্প অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া তাহাকে প্রাজ্ঞ বলা হয়। অজ্ঞানরূপী কারণশরীর তাঁহার আনন্দময় কোষ। বন ও বৃক্ষসমুদয় যেরূপ অভিন্ন, তদ্রূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান অভিন্ন, সুতরাং তৎসাক্ষী চৈতন্য জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন। তরঙ্গ ও সমুদ্র যেরূপ অভিন্ন, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন।

সৃষ্টি—অনন্তশক্তিশালী ঈশ্বর মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি নিজেই ইহার নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। উর্ণনাভ যেমন চৈতন্যাংশের প্রাধান্যহেতু স্বকৃত তন্তুর নিমিত্ত-কারণ ও শরীরাংশপ্রাধান্যহেতু উপাদানকারণ, সেইরূপ ঈশ্বরও জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়া থাকেন। তমোগুণপ্রধান মায়া হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইকে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহার নাম সূক্ষ্মভূত বা অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত। ইহা হইতে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয় এবং আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পরস্পর মিলনে স্থূলভূতসমূহ উৎপন্ন হয়।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা এবং নাসিকা পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। যাহা কর্ণ নহে, অথচ কর্ণরন্ধ্র আশ্রয় করিয়া শব্দ গ্রহণ করে, তাহার নাম কর্ণেন্দ্রিয়।

যাহা ত্বক্ নহে, অথচ ত্বক্ আশ্রয় করিয়া শীতোষ্ণাদি অনুভব করে, তাহার নাম ত্বগিন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় চক্ষুর্গোলক নহে অথচ চক্ষুর গোলক আশ্রয় করত কৃষ্ণবর্ণ তারার অগ্রবর্ত্তী রূপগ্রহণশক্তিমান্, তাহার নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়। যাহা রসনা নহে, অথচ রসনার অগ্রভাগ আশ্রয় করত রস গ্রহণ করে, তাহা রসনেন্দ্রিয়। যাহা নাসিকা নহে, অথচ নাসিকা আশ্রয় করত নাসিকার অগ্রবর্ত্তী গন্ধ গ্রহণ করে, তাহা নাসিকেন্দ্রিয়।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই পঞ্চ স্থান আশ্রয় করিয়া যে শক্তি কার্য্য করে, তাহাকেই সেই সেই ইন্দ্রিয় বলা যায়, ইন্দ্রিয় দ্বারগুলি ইন্দ্রিয় নহে।

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি, মনঃ এই সপ্তদশ অবয়বকে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম দেহ বলে। এই শরীর স্বকারণে লয় পায়, তজ্জন্য ইহাকে লিঙ্গ বলা হয় এবং শীর্ণ হয় বলিয়া ইহার শরীর আখ্যা দেওয়া হয়। মনঃ এবং বুদ্ধিই আবার চিত্ত ও অহঙ্কারভেদে অন্তঃকরণচতুষ্টয় বলিয়া কথিত। সঙ্কল্পপ্রভৃতির ন্যায় চিন্তাও মনের ধর্ম্ম, অতএব চিত্তকে মনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। আমি সুখী বা দুঃখী ইত্যাদিরূপ অনুভব বুদ্ধিগত, এই অহংভাব-হেতু অহঙ্কারকে বুদ্ধির অনুগত বুঝিতে হইবে। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব এবং কারণত্বরূপ মোহবশতঃই আত্মা সংসারী বলিয়া ধারণা হয়।

বিজ্ঞানময়কোষ—

শ্রোত্রপ্রভৃতি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে। বিজ্ঞানের বাহুল্যবশতঃ ইহারা আত্মাকে আবরণ করে, তজ্জন্য তাহাকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে। আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি অহম্ অভিমান দেহে প্রযুক্ত হয় এবং আমার গৃহ, আমার ধন ইত্যাদি অভিমান বাহ্য বস্তুতে প্রযুক্ত হয়, তাহাতেই আমি জীবিত এইরূপ অভিমানবশতঃ পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার যোনিতে পরিভ্রমণ করে।

মনোময়কোষ—

শ্রোত্রপ্রভৃতি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ মনকে, মনোময়কোষ বলে। মনই সর্ব্বদা বাহ্য বস্তু বা বিষয়ে সঙ্কল্প করে, তজ্জন্যই মনই সকলের কারণ। বস্তু বর্ত্তমান থাকিলেও মনঃসংযোগব্যতিরেকে তাহার উপলব্ধি হয় না, সুতরাং মনঃ সকল কার্য্য সম্পন্ন করে এইরূপ বলা যায়। অতএব মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ। অজ্ঞানসম্ভূত মনঃ যখন তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন জড়তা, মোহ ইত্যাদিতে, তাহার যথার্থ বস্তু উপলব্ধির শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং যখন রজঃশক্তি দ্বারা অভিভূত হয়, তখন কাম, ক্রোধাদি দ্বারা চঞ্চল হইয়া পড়ে, সুতরাং এই উভয় অবস্থায় তাহার প্রকৃত বস্তু উপলব্ধির শক্তি থাকে না, তদবস্থায় উহা জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ হয়, কিন্তু সত্ত্বগুণের বহুলতাপ্রযুক্ত ইহাতে যখন বিচারশক্তি উদয় হয়, তখন সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া এই মনই জীবের মোক্ষলাভের কারণ হয়। ফলতঃ এই মনের প্রসন্নতাই মুক্তির কারণ। যম, নিয়মাদি সেবনরত পুরুষের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া তদবস্থার উপযোগী হয়। তজ্জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে দৈবী-সম্পৎসম্পন্ন হইতে বলিয়াছিলেন। যিনি পরনিন্দা, পরদ্রোহ ও পরস্ত্রীতে রত না হন, তাঁহারই মনের প্রসন্নতা লাভ হয়। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি বিদাহী, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত ইত্যাদি দ্রব্যের ত্যাগ, সত্ত্বগুণপ্রধানপুরাণাদির শ্রবণ, সাধুগণের অনুবৃত্তি, ঈশ্বরারাধনা, তীর্থভ্রমণাদি, আশ্রমধর্ম্মপালনপ্রভৃতি দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে মানব জ্ঞান লাভ করে, জ্ঞানলাভেই মুক্তি।

আনন্দময়কোষ—উপরিলিখিত বিজ্ঞান এবং মনোময়কোষ হইতে বিলক্ষণ আনন্দময় কোষ আছে। চিদানন্দপ্রতিবিম্ববশতঃ এবং ভোগ-সমাপ্তিতে প্রকৃতিতে লীন, আন্তরিক বুদ্ধিকেই আনন্দময়কোষ বলে।

ক্ষণবিধ্বংসিতাহেতু তাহাকেও আত্মা বলা যায় না, কারণ বিশ্বভূত, নিত্যসিদ্ধ, সংস্বরূপ, আত্মা উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সর্ব্বসাক্ষী।

প্রাণময় কোষ—

বাক্‌প্রকৃতি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি পাঁচটী বায়ুকে প্রাণময় কোষ বলা যায়। যেরূপ বায়ুচালিত বৃক্ষ নানারূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ পঞ্চপ্রাণ এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করে, সুতরাং তাহারা স্থির হইলেই সমুদয় ক্রিয়া শান্ত হয়।

অন্নময়কোষ—

পিতামাতার ভুক্ত অন্ন শুক্র-শোণিতাকারে পরিণত হয় এবং উহাদের মিলনবশতঃ এই দেহাকার ধারণ করে, ইহা অন্নেরই বিকার সুতরাং ইহার নাম অন্নময়কোষ।

স্থূল প্রপঞ্চের উৎপত্তি—

আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত মিলিত হইয়া স্থূল পঞ্চভূত হয়। উহার প্রকার—

আকাশ	বায়ু	তেজঃ	অপ্	ক্ষিতি	
॥০	৵০	৵০	৵০	৵০	= ১আকাশ
৵০	॥০	৵০	৵	৵	= ১বায়ু
৵	৵	॥০	৵	৵	= ১ তেজঃ
৵০	৵	৵	॥০	৵০	= ১ অপ্
৵	৵	৵	৵	॥০	= ১ ক্ষিতি

ছান্দোগ্য বলেন "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি "তাসাং ত্রিবৃতাম্ একৈকাং করবাণি" সেই ঈশ্বর আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি তেজঃ, অন্ন ও অপ্ এই তিন দেবতার মধ্যে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ

করিব। সেই তিনটীর মধ্যে এক একটীকে ত্রিবৃৎ অর্থাৎ তেজঃ, অপ্ এবং অন্নরূপ করিব। শ্রুত্যন্তরে ঐ ত্রিবৃৎ পাঁচটী ভূতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভূতগুলির ক্রিয়া পরস্পর অনুভূত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা অবাস্তব নহে! যথা—আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং রস; পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

অপঞ্চীকৃত ভূতগুলি হইতেই কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। স্থূল পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রীহিপ্রভৃতি সমস্ত ওষধি, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণীর আহার্য্যরূপে কল্পিত হইয়াছে। নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে এই চারি প্রকার যোনিতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা—জরায়ু হইতে উৎপন্ন প্রাণীর নাম জরায়ুজ, যথা—মনুষ্যাদি। যাহারা অণ্ড হইতে জন্মে, তাহাদিগকে অণ্ডজ প্রাণী বলে, যেমন—উৎকুণাদি। যাহারা ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে, যেমন আম্রাদি। এই চারি প্রকার যোনিতে সমষ্টিরূপে যে চৈতন্য বর্ত্তমান আছে তাহার নাম বৈশ্বানর বা বিরাট্। এবং যিনি ব্যষ্টি স্থূলশরীরাভিমানী তাঁহাকে বিশ্ব বলে। আত্মা এই স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়া মহারাজের ন্যায় বাস করেন। অর্থাৎ মহারাজ যেমন বহুদ্বারবিশিষ্ট প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করত বিবিধ বিষয় উপভোগ করেন, তদ্রূপ আত্মা একাদশদ্বার (অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত, দেহে বাস করত বিবিধ বিষয়ের উপভোগ করেন। ইহার মধ্যে অজ্ঞান হইতে স্থূলদেহপর্য্যন্ত সমুদয় অনাত্মা এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুই আত্মা বলিয়া কথিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

আত্মনিরূপণ ও সমাধি।

আত্মনিরূপণ—"অন্তঃকরণ-তদ্বৃত্তিদ্রষ্টৃ নিত্যমবিক্রিয়ম্।
চৈতন্যং যত্তদাত্মেতি বুদ্ধ্যা বুধ্যস্ব সূক্ষ্ময়া॥"

"অন্তঃকরণবৃত্তির দ্রষ্টা (সাক্ষী) নিত্য, বিকারশূন্য চৈতন্যই আত্মা, তাঁহাকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।" এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, অংশরহিত, অসঙ্গ, শুদ্ধ, সর্ব্বদা একরূপ, অখণ্ড, আনন্দরূপ, সাক্ষী, চৈতন্যরূপ, কেবল ও নির্গুণ। শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ইহার নাশ নাই। জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয় ও নাশ এই ছয়টী পরিণাম শরীরেই হইয়া থাকে, ইহা আত্মার হয় না। আত্মার জন্মাদি নাই বলিয়া তাঁহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। যিনি দেহাদির পরিণাম দর্শন করেন, তাঁহাকেই আত্মা বলা যায়। সমুদয় জীব মোহবশতঃ, এই আত্মাকে দেহ মনে করিয়া তাহাতে জাতি ইত্যাদির আরোপ করত জন্মমরণপ্রবাহে নিপতিত হয়। আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি অজ্ঞ, আমি বিজ্ঞ বা আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি সমস্তই আত্মাতে ভ্রান্তিবশতঃ কল্পিত হয়। ভ্রমবশতঃই আত্মাতে জন্ম, মরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, সুখ ইত্যাদির আরোপ হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, তদ্রূপ অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হয়। কামলা (ন্যাবা) রোগী যেমন সমস্তই পীতবর্ণ দর্শন করে, অথচ পীতবর্ণ বস্তু তথায় নাই, তদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃই অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া মনে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে— অবিষয় ও ব্যাপক আত্মাতে দেহ, ইন্দ্রিয়প্রভৃতি অনাত্মার কিরূপে আরোপ হয়? যাহা সম্মুখে উপস্থিত থাকে (যেমন শুক্তি), সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে অন্য বস্তুর ভ্রম হইতে পারে (যেমন রজতের), কিন্তু আত্মা কেহ কখনও

অনুভব করে নাই তাহাতে অনাত্মার ভ্রম কিরূপে সম্ভব? উহা কিরূপে আসিল? যদি আসিয়াই থাকে তাহা নিবৃত্তির উপায় কি? উপাধিবশতঃই যদি জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন হন, তবে জীব কর্ম্মফল ভোগ করে এবং বদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর মুক্ত এবং কর্ম্মফল ভোগ করেন না, ইহা কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তর এই যে—আমি নাই এরূপ জ্ঞান কাহারও নাই, সুতরাং আত্মা একান্ত অবিষয় নহে। নিজের অস্তিত্বে অন্য প্রমাণ আবশ্যক করে না। প্রমাণ দ্বারা বস্তুর যথার্থতা উপলব্ধি হয়। মেঘ দ্বারা সূর্য্য যদ্রূপ লোক-লোচনের বহির্ভূত হয়, তদ্রূপ মায়ার প্রাবল্যে অহঙ্কারাদির দ্বারা আত্মা আবৃত হন, এই পর্য্যন্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিরা আকাশকে নীল, পীত ইত্যাদি বলিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আকাশে নীল, পীতাদি নাই। অনাত্মায় আত্মভ্রান্তিতে কোন প্রকার সাদৃশ্য অপেক্ষা করে না। কারণ শঙ্খে পীতত্ব নাই, অথচ চক্ষুর দোষে শঙ্খ পীত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। সেইরূপ বুদ্ধি সত্ত্বগুণস্বভাব; আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ সেই বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া মনে হয়। যদ্রূপ বুদ্ধি আত্মার ন্যায় মনে হয়, তদ্রূপ মনঃ বুদ্ধির ন্যায়; ইন্দ্রিয় মনের ন্যায় এবং দেহ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রকাশ পায়। দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বালকদিগের যেমন বিম্ব বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানীদিগের অনাত্মা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি দৃষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমি স্থূল, আমি কৃশ, এইরূপ মনে হয়। আত্মার উপাধি অবিদ্যা। তাহার আবরণ ও বিক্ষেপনামক দুইটী মহতী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা জীব সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে। অবিদ্যা সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটী গুণস্বরূপ। তন্মধ্যে তমোগুণের শক্তি আবরণ, রজোগুণের বিক্ষেপ এবং সত্ত্বগুণের শক্তি প্রকাশ। তমোগুণাত্মিকা আবরণশক্তি দ্বারা দৃষ্টিশক্তি আবৃত থাকায় কাহারও এই আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান বিকশিত হয় না। রজোগুণাত্মিকা বিক্ষেপশক্তিদ্বারা সর্ব্ববিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ হইয়া দেহাদি

স্থূল হইতে বুদ্ধিপর্য্যন্ত সমস্ত মিথ্যা বস্তু অধ্যারোপিত করে। এই অধ্যাসই সংসারের কারণ এবং অধ্যাস নষ্ট হইলেই সংসারের নাশ বা মুক্তি হইয়া থাকে। অধ্যাসের কারণ মিথ্যাজ্ঞান, যেমন রজ্জুতে সর্প প্রতিভাসমান হয়, উহা মিথ্যা হইলেও ভয়, কম্পাদি আনয়ন করে, তদ্রূপ অধ্যাস মিথ্যা হইলেও সংসার সম্পাদন করে।

জীব মলিনসত্ত্বগুণবিশিষ্ট অবিদ্যারূপ উপাধিগ্রস্ত এবং ঈশ্বর শুদ্ধসত্ত্বগুণ-প্রধান মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট। জীবে আবরণ, বিক্ষেপাদি ধর্ম্ম বিদ্যমান, ঈশ্বরের আবরণ বা বিক্ষেপ না থাকায় তাঁহাতে পরিচ্ছিন্নভাব বিদ্যমান নাই এবং সত্ত্বগুণাধিক্যবশতঃ প্রকাশশীলতা অধিকতরভাবে বিদ্যমান থাকায় তাঁহার বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবে রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য থাকায় আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির প্রাবল্য আছে। সেই হেতু মোহ জন্মে এবং ক্রিয়াশীলতার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যুরূপ প্রবাহে পতিত হয়। জীব নানা যোনিতে নানা প্রকার সুখদুঃখাদি অনুভব করে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এই আবরণ বা বিক্ষেপরূপ অবিদ্যার নাশ কিরূপে সম্ভবে? উপরি উক্ত প্রকরণে দেখান হইয়াছে যে, কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অজ্ঞানও নাশ প্রাপ্ত হইবে না, এক্ষণে তাহাই বিস্তৃত রূপে বলা যাইতেছে। যথা—অজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের কোন বিরোধ নাই এবং অজ্ঞানহেতু কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ আত্মায়, ব্রাহ্মণাদি জাতি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম আরোপিত করিয়া পুরুষ তত্তৎ জাতি, আশ্রমাদির কর্ত্তব্যপালনে রত হয়। সুতরাং অজ্ঞানই কর্ম্মের কারণ এবং অজ্ঞান হইতেই কর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সংসারে দেখা যায় যে, যাহা হইতে যাহার জন্ম হয়, সে তাহার নাশক হয় না। আলোক এবং অন্ধকার একত্র বাস করে না, তাই আলোক অন্ধকারের বিনাশক, কিন্তু কর্ম্ম ও অজ্ঞান একত্র বাস করে বলিয়া উহাদের নাশ্যনাশকভাব হইতে

পারে না। সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধিমান্ লোক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত আত্মা ও অনাত্মার ভেদ নির্ণয় করত আত্মাতে মনোনিবেশ করিবেন। তজ্জন্যই আত্মা কাহাকে বলে, তাহা বিস্তৃতরূপে বলা যাইতেছে। বাদিগণ কয়েকটী বস্তুকে আত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—পুত্র, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, অজ্ঞান, জ্ঞানাজ্ঞান ও শূন্য। ইহাদের মতগুলির উল্লেখ করিয়া তাহা কিরূপে অযৌক্তিক, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পুত্রাত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন—

কোন কোন ব্যক্তি পুত্রকেই 'আত্মা' বলে। তাহারা বলে—পুত্র পুষ্ট হইলে আমি পুষ্ট হই এবং পুত্র নষ্ট হইলে আমিও নষ্ট হই। শ্রুতি বলেন "আত্মা বৈ পুত্রনামাসীৎ"। সুতরাং যেরূপ এক দীপ হইতে অন্য দীপের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং পিতার গুণ পুত্রে দেখা যায়, সুতরাং পুত্রই আত্মা। কিন্তু অপর পক্ষ বলে—তাহা অসম্ভব, কারণ পুত্রকে ভালবাসা যায় বলিয়াই তাহাকে আত্মা বলা যায় না, কারণ পুত্র ব্যতিরিক্ত স্ত্রী, ধন এবং দ্রব্যাদিতেও ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে অগ্নি প্রদান করিলে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ দেহ রক্ষা করে, দেহ রক্ষার নিমিত্ত পুত্রকে বিক্রয় করে, প্রতিকূল হইলে তাহাকে ত্যাগ করে এবং দীপের মত পুত্রের সর্ব্ব স্থানে পিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য হয় না। গুণবান্ পিতা হইতেও মূর্খ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং পুত্র আত্মা হইতে পারে না। শ্রুতি যে পুত্রকে আত্মা বলিয়াছেন উহা গৌণ বাক্যমাত্র, সুতরাং দেহই "আত্মা" ইহা চার্ব্বাকদিগের উক্তি।

দেহাত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন—

তাঁহারা বলেন, দেহই 'আত্মা', কারণ শ্রুতি বলেন—'পুরুষোঽন্নময়ঃ" অর্থাৎ অন্নরসে উৎপন্ন দেহই আত্মা। অপরে বলে—দেহ জড় ইন্দ্রিয়া-

দির দ্বারা চালিত, সুতরাং উহা কিরূপে আত্মা হইতে পারে। গৃহ যেমন গৃহস্থগণের আশ্রয়, তদ্রূপ দেহ ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়। এই শরীর বাল্য-যৌবনাদি বিবিধ অবস্থাযুক্ত, সুতরাং উহা আত্মা হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-গণ দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণই আত্মা।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন—

শ্রুতিতে উক্ত আছে—ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির নিকটে গিয়া বাক্য বলিয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য আছে। ইন্দ্রিয়গুলি দেহের চালক, সুতরাং উহারাই আত্মা। অপরে প্রতিবাদ করিয়া বলে—ইন্দ্রিয়-গণ জড়, সুতরাং কিরূপে আত্মা হইতে পারে? জড় কুঠারাদির সহায়তায় নানা প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হয়, প্রদীপও জড় হইয়া অন্য বস্তুর প্রকাশ করে, তদ্রূপ জড় চক্ষুঃপ্রভৃতি বিষয়গুলি দর্শন করিতে পারে, কিন্তু সেই জন্য তাহাদিগকে আত্মা বলা যায় না। বরং প্রাণাদি পঞ্চবায়ু দ্বারাই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং তাহারাই আত্মা।

প্রাণাত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন—

বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধকে এই প্রাণ একই ভাবে থাকে এবং সমুদয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। শ্রুতিতে 'আত্মা প্রাণময়ঃ' ইত্যাদি বলা হইয়াছে, সুতরাং অন্নময় কোষ হইতে অতিরিক্ত প্রাণই আত্মা। অপরে বলে—প্রাণ আত্মা হইতে পারে না, কারণ উহা বায়ুমাত্র। প্রাণ অচেতন, চঞ্চল এবং সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। কামারের যাঁতার ন্যায় উহা ভিতরে যায় এবং বাহিরে আসে, উহাতে জ্ঞানশক্তি নাই। নিদ্রা—সময়ে বন্ধুসমাগমে প্রাণের জ্ঞান পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু মনঃ সকলই জানিতে পারে, সুতরাং মনই আত্মা।

মন আত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন—

শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে 'আত্মা মনোময়' অর্থাই মনই আত্মা।

কারণ উহা সমুদয় সঙ্কল্প, বিকল্প করিয়া থাকে। অপরে বলেন—মনঃও চক্ষুঃপ্রভৃতির ন্যায় একটী ইন্দ্রিয়, সুতরাং সে কর্ত্তা নহে, করণ; কর্ত্তা ভিন্ন করণ দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হয় না, কর্ত্তাই করণকে পরিচালিত করে। মনকে বুদ্ধি পরিচালিত করে; সুতরাং বুদ্ধিই আত্মা।

বুদ্ধি আত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন—

শ্রুতিই বলেন "অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" অর্থাৎ মনঃ হইতে অন্য বুদ্ধিই আত্মা। ইহাই বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু অপরে বলে—বুদ্ধি আত্মা হইতে পারে না, কারণ বুদ্ধিপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুর অজ্ঞানে লয় হইয়া থাকে। আমি অজ্ঞ, এইরূপ বোধ সকলেরই হইয়া থাকে, সুতরাং অজ্ঞানই আত্মা। নিদ্রিতাবস্থায় সকলেই নিজেকে সুখী বলিয়া মনে করে। নিদ্রা অজ্ঞানাবস্থা, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন; সুতরাং উহাই আত্মা। শ্রুতিও "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" বলেন, সুতরাং আনন্দরূপ অজ্ঞানাবস্থাই আত্মা। তাহা হইতে পারে না, কারণ অপরে বলেন—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এই আমি অজ্ঞ, এইরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান সকলেরই হইয়া থাকে।

জ্ঞানাজ্ঞানাত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন—

সুতরাং আত্মা জ্ঞান ও অজ্ঞানময়। যেমন জোনাকী পোকার আলো ও আঁধার উভয়ই বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ চৈতন্য ও জড় উভয়ই আত্মার স্বভাব। অপরে বলে—জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ে আত্মা হইতে পারে না, কারণ উহা আলো ও আঁধারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; সুতরাং উহা এক বস্তুতে থাকে না। নিদ্রাবস্থায় আমি আছি, এইরূপ বোধও থাকে না। তখন সকলই শূন্য বলিয়া মনে হয়। জাগরিত হইলেই আমি সুখে ছিলাম, এইজ্ঞান হয়, সুতরাং শূন্যই আত্মা।

শূন্যাত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন—

শ্রুতিও বলেন "অসদেবমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ এ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য ছিল, সুতরাং শূন্যই আত্মা। সিদ্ধান্তী বলেন—তাহা হইতে পারে না, কারণ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্যই ছিল, ইহা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; কারণ অভাব হইতে ভাবান্তর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ. ক্ষুদ্র বীজের অভ্যন্তরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, পুনরায় বৃক্ষাকারে প্রকাশিত হইলে তাহার ব্যক্তাবস্থা আগমন করে। তদ্রূপ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্তাবস্থায় ছিল, পরে ব্যক্তাবস্থার আগমনে নামরূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। যদি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ঘট লুক্কায়িত না থাকে, তাহা হইলে উহা আবির্ভূত হইতে পারে না। যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে বালুকা বা জল হইতে ঘট হওয়া সম্ভবপর হইত। যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাতে তাহার স্বভাব বিদ্যমান আছে, নতুবা জল হইতে দধি, অথবা দুগ্ধ হইতে ঘট ইত্যাদি হইতে পারে। শ্রুতিও বলেন "কথমসতঃ সজ্জায়তে" অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শূন্য বস্তুই মিথ্যা, তাহা হইতে সত্য বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব। সুষুপ্তিকালে শূন্যই থাকে, ইহা কে বলিল? যদি শূন্যই অবশিষ্ট থাকে ইহাই অভিপ্রেত হয়, তবে সেই শূন্যের অনুভবিতা কেহ থাকা প্রয়োজন, কারণ শূন্য থাকে ইহা অনুভব করে কে? এই অনুভবকর্ত্তাই আত্মা। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। সূর্য্যকে যেমন কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধিপ্রভৃতি জড় পদার্থ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি সর্ব্বাবস্থায় প্রকাশমান। অগ্নি যেমন সমস্ত বস্তু দগ্ধ করে, অথচ অগ্নিকে দাহ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, তদ্রূপ আত্মা সকলের জ্ঞাতা, তাঁহার জ্ঞাতা আর কেহই নাই। সর্ব্বাবস্থায় এই আত্মা জ্ঞাতা। সুষুপ্তি অবস্থায় মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদি কারণে বিলীন হওয়ায় জ্ঞান, সুখাদি উৎপন্ন

হয় না, বিকল্পশূন্য অবস্থায় অবস্থান করেন। এই আত্মা সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই তিনি একরূপ থাকেন। তাঁহার কখনও বিনাশ নাই। কারণ আমি ছিলাম না—এরূপ জ্ঞান কখনও হয় না। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক প্রভৃতি দেহেরই পরিণাম আছে, আত্মাতে তাহা নাই। মনঃ, বুদ্ধি আদির সর্ব্বদাই পরিণাম আছে, কিন্তু আত্মা অপরিণামী। জাগতিক সমুদয় বস্তু যেরূপ সূর্য্যের আলোকে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আত্মার প্রকাশীলতাতেই জড় বুদ্ধি ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, সুতরাং তিনি স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানরূপ। নিরতিশয় প্রীতির স্থান বলিয়া ইনি সুখস্বরূপ। সাংসারিক সমুদয় বস্তুতেই প্রীতি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে পৃথক্‌ভাবে হইয়া থাকে,—কিন্তু আত্মবিষয়ে প্রীতি কখনও সসীম হইতে দেখা যায় না। দুর্ব্বল ক্ষীণ অথবা অতি বৃদ্ধ কেহই তাহার মৃত্যু হউক এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহার কারণ আত্মার প্রতি প্রীতি। এই আত্মপ্রীতি হইতেই আত্মসুখের নিমিত্ত অন্য বস্তুতে প্রীতি উদিত হইতে দেখা যায়। পুত্র, কলত্রাদি যত কিছু সাংসরিক পদার্থ, সমুদায়ই আত্মার প্রীতির নিমিত্ত ; যাহা কিছু চেষ্টা বা ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই আত্মার নিমিত্ত। তজ্জন্যই আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলা হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—আত্মা যদি আনন্দস্বরূপ হইলেন, তবে আনন্দ পাইবার নিমিত্ত এত আগ্রহ কেন ? তাহার কারণ আত্মাসম্বন্ধে অজ্ঞানতা। আত্মাকে না জানিতে পারিয়াই আত্মা ভিন্ন অপর কিছু সুখের বস্তু আছে, মনে করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তি নিজের গৃহে ধন আছে, না জানিতে পারিয়া যেরূপ ভিক্ষার নিমিত্ত বহির্গত হয়, কিন্তু জানিতে পারিলেই আর বহির্গত হয় না, তদ্রূপ আত্মাকে জানিতে পারিলেই আর অন্যত্র প্রীতির বস্তু অন্বেষণ করিতে হয় না। সাধারণতঃ আত্মাতেই সুখ

আছে, তাহা কেহ জ্ঞাত নহে, তাহারা সুখ এবং আত্মাকে ভিন্ন বস্তু মনে করে। তবে বাহ্য বস্তু দর্শনে বা ভোগে যে আনন্দ হয়, তাহা সেই বস্তুতে নাই অর্থাৎ গন্ধ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির দর্শনে ও উপভোগে যে আনন্দ হয়, তাহা গন্ধাদির ধর্ম্ম নহে। আনন্দ যদি গন্ধাদির ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে শীতকালেও চন্দন প্রীতিকর হইত বা বাল্যকালেও স্ত্রী প্রীতিকর হইত, সুতরাং আনন্দ বস্তুর ধর্ম্ম হইতে পারে না। আনন্দ মনের ধর্ম্ম নহে, কারণ বিষয় না থাকিলে মনে আনন্দের উদয় হয় না। নির্গুণত্ববশতঃ আনন্দ আত্মারও ধর্ম্ম নহে। পুণ্য এবং ইষ্ট বস্তুর সান্নিধ্যবশতঃ ভাল, মন্দ নানাপ্রকার বোধ হইয়া থাকে। সার্ব্বভৌম নরপতি হইতে হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্ত যে আনন্দশ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা ক্ষয়শীল, এবং কারণে লয় হইয়া যায়। সুখের কারণ পুণ্য ক্ষয় হইলে, সেই আনন্দও লয় প্রাপ্ত হয়। ভোগকালীনও উহাতে দুঃখ থাকে এবং উহার পরিণামও দুঃখপ্রদ। কারণ, ভোগকালে ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, মনে করিয়া জীবগণ সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে, এজন্য বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় উহা স্বাদু হয় না। ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুনরায় পতন হয়। তজ্জন্যই বিদ্বান্ মনুষ্য এতাদৃশ সুখ কামনা করেন না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়, দেহাদি বর্ত্তমান থাকায়, আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায় এই আত্মা প্রকাশিত হন। কারণ, সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর সকলেই বলে যে, আমি অতিশয় সুখে ছিলাম। অনেকে বলেন দুঃখের অভাবই সুখশব্দবাচ্য। কিন্তু তাঁহারা সুখশব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত নহেন। বিষয়ের সান্নিধ্যবশতঃ যত প্রকার আনন্দ অনুভূত হয়, আত্মার সুখই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনুভূত হইয়া থাকে। যে কোন স্থলে যত প্রকার আনন্দ হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই আত্মার আনন্দ। অনেকে বলেন সত্ত্ব এবং আনন্দ আত্মার ধর্ম্ম, তাঁহার

স্বরূপ নহে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ নির্গুণ আত্মার গুণসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সত্ত্ব, চিত্ত ও আনন্দ যদি আত্মার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে উঁহারা আত্মার বিশেষণ হইবে, বিশেষণ অন্য বস্তুর নিষেধ করিয়া থাকে। যদি ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু থাকিত, তবেই তাহা অন্য বস্তুর নিষেধ করিত, কিন্তু জগৎ মিথ্যা, সুতরাং ব্রহ্মই অদ্বিতীয় বস্তু। শ্রুতিতে "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির স্বরূপ, সেইরূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। পরমাত্মা, একমাত্র অদ্বিতীয়, তাহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না। প্রপঞ্চের অপবাদ (বাধ) বশতঃ বিরুদ্ধজাতীয় বস্তু-জনিত ভেদ স্বীকৃত হয় না। রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প। রজ্জুকে রজ্জুরূপে দর্শনের ন্যায় জগৎকে সন্মাত্র ব্রহ্মরূপে দর্শনের নাম অপবাদ। যে বস্তু যাহার কার্য্যরূপে দৃষ্ট হয়, বিচারকালে সে বস্তু তাহাই বলিয়া অনুভূত হয়। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন, অন্য কোন বস্তু নহে। ঘটের অন্তর বাহিরে সর্ব্বত্রই মৃত্তিকা। আকৃতি যেরূপই হউক না কেন, উহা মৃত্তিকাভিন্ন অন্য কিছুই নহে। নাম দ্বারা যতই উহার পার্থক্য করা হউক না কেন, উহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, কার্য্য যখন কারণ হইতে ভিন্ন নহে, সুতরাং পঞ্চভূতের কার্য্যসমুদয় পঞ্চভূত হইতে অন্য কিছুই নহে। এবং পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতরূপ স্থূল ভূতসমুদয় অপঞ্চীকৃত ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ত্রিগুণের সহিত এই পঞ্চভূত বাস্তবিক অজ্ঞানমাত্র এবং অজ্ঞান চিদাভাসযুক্ত; সুতরাং সর্ব্বাধার, সর্ব্বাধিষ্ঠান একমাত্র সন্মাত্র চৈতন্যই অবশিষ্ট আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই যেমন চক্ষুর দোষে এক চন্দ্র দুই বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ বুদ্ধির দোষে

একই ব্রহ্ম নানারূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান হইলে, সর্পবুদ্ধি আর থাকে না রজ্জুতেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ জ্ঞান আর থাকে না; যতক্ষণ বুদ্ধিপ্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে এবং বুদ্ধির সহিত আত্মা অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন, ততক্ষণই আত্মা স্বজাতীয়ভেদ-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। উপাধির অপগম হইলে আত্মা ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, সুতরাং আর পার্থক্য থাকে না। ঘট বিনষ্ট হইলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে পরিণত হয়, সেইরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি হয়। শ্রুতি "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা উঁহার একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এক্ষণে তৎ, ত্বং এবং অসি—তিন পদের অর্থদ্বারা কি বোঝা যায়, তাহাই দেখিতে পাইবে। প্রথমে 'ত্বং' পদের অর্থ বিবেচনা করা যাউক। 'ত্বং' অর্থ 'তুমি' বুঝায়। এই তুমি কে তুমি-শব্দের দ্বারা দেহকে বুঝায় না কারণ দেহ দৃশ্য, ভৌতিক জড় এবং অনিত্য; কিন্তু যিনি 'ত্বং' পদ প্রতিপাদ্য, তিনি অদৃশ্য, চেতন এবং নিত্য। তাঁহার কোন রূপ বা জাতি নাই। দেহের রূপ ও জাতি আছে। যে পদার্থ দৃশ্য, তাহা কখনও দ্রষ্টা হয় না এবং দ্রষ্টা কখনও দৃশ্য হয় না। যেরূপ ঘটকে সকলে দেখিতে পায়, কিন্তু ঘট কখনও কাহাকেও দেখিতে পায় না, তদ্রূপ 'ত্বং' পদার্থ দ্রষ্টা, দৃশ্য নহে। সুতরাং বিচার দ্বারা দেখা যাইতেছে স্থূল দেহ কখনও 'ত্বং'পদ প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। তবে কি সূক্ষ্ম দেহরূপ ইন্দ্রিয়াদি "ত্বং" পদপ্রতিপাদ্য তাহাও নহে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি করণ অর্থাৎ তাহা দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু 'ত্বং' পদপ্রতিপাদ্য বস্তু কর্ত্তা, করণ নহে। কর্ত্তা কখনও করণ হইতে পারে না। করণের উপর প্রভুত্ব করাই কর্ত্তার কাজ, সুতরাং করণ 'ত্বং' পদপ্রতিপাদ্য নহে। আবার করণগুলি অনেক, কিন্তু তুমি এক, ইহাতে করণ হইতে, 'তুমি' পৃথক্ বুঝা গেল, তাহা ছাড়া এক ও বহু দুইটী একার্থক নহে। যদি বলা যায়—ইন্দ্রিয় অনেক

হইলেও ইন্দ্রিয়সমুদয় অনেক নহে, সুতরাং ইন্দ্রিয়সমুদয়ই 'ত্বং' পদপ্রতিপাদ্য হউক, তাহাও হইতে পারে না। সমুদয় ইন্দ্রিয়মধ্যে যদি একটীর বিনাশ হয়, তাহা হইলে জীবের বিনাশ হয় না, সুতরাং ইন্দ্রিয় কি করিয়া 'ত্বং'-পদপ্রতিপাদ্য হইবে। উহা সম্ভব হইলে এক ইন্দ্রিয়ের নাশে 'আমি' এইরূপ বোধ আর হইত না। যদি বলা যায়, সমুদয় ইন্দ্রিয় 'ত্বং' পদপ্রতিপাদ্য না হইলেও প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ হউক্, তাহাও হইতে পারে না, কারণ—প্রত্যেকের গতিই বিভিন্নমুখী অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া বিভিন্নদিকে ধাবমান্ হয়। সুতরাং তাহা হইলে অনেকগুলি আত্মা হইয়া পড়িল, কিন্তু এক দেহে অনেকগুলি আত্মা আছে ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ এবং বহুত্ব ও একত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ; সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেকে আত্মা হইতে পারে না। যদি অনেকগুলি স্বামী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিভিন্নমতহেতু দেহের নাশ অবশ্যম্ভাবী। যেমন সম্রাটের অধীনে অনেক ক্ষুদ্র রাজাও বাস করে, তদ্রূপ আত্মার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়াদি বাস করে। যদি বলা যায়—ইন্দ্রিয়গুলি 'ত্বং' পদপ্রতিপাদ্য না হইয়া মনঃ ও প্রাণ হউক,— তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, উভয়েই জড়। আমার মনঃ বিষণ্ণ অন্যত্র গিয়াছে ইত্যাদি দ্বারা জানা যায়—মনঃ ও আত্মা বিভিন্ন। অতএব, মনঃ 'ত্বং' পদপ্রতিপাদ্য নহে। আমার প্রাণ চলিয়া যাইতেছে, ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছে—ইত্যাদি বোধ সকলেরই হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রাণ ও আত্মা স্বতন্ত্র। অতএব মনঃ ও প্রাণের একজন স্বতন্ত্র দ্রষ্টা আছে। যেমন ঘটের দ্রষ্টা ঘট নহে, সেইরূপ মনঃ ও প্রাণের দ্রষ্টা মনঃ ও প্রাণ এক নহে। যদি বলা যায়, বুদ্ধিই 'ত্বং' পদবাচ্য হউক, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, বুদ্ধি যদি আত্মা হইত, সে নিদ্রাবস্থায় লীন হইত না বা জাগ্রৎকালে নানাপ্রকার হইত না। এই বহুরূপ এবং বিলীনতা আত্মার স্বরূপ নহে। আত্মা ইহাকেও উপলব্ধি করিয়া থাকেন,

সুতরাং বুদ্ধি হইতে আত্মা স্বতন্ত্র বস্তু। আত্মা বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় বস্তু দর্শন করিতেছেন। যদ্রূপ অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠ দগ্ধ হয়, অগ্নিকে কাষ্ঠ দগ্ধ করিতে পারে না ; তদ্রূপ আত্মাই বিশ্বকে জানিতে পারেন, বিশ্ব আত্মাকে জানিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহাকে এইরূপ সেইরূপ বলিয়া, বুঝান যায় না তুমিই সেই সৎপদার্থ ব্রহ্ম। এই বলিয়া যত কিছু বুঝায়, তৎসমুদয় নিষেধ করিয়া, তাহার অতীত যে বস্তু বুঝা যায় তাহারই নাম 'আত্মা' তাঁহাকে 'এই' বলিয়া বুঝান যায় না। যেমন আকাশকে বুঝাইতে যদি বলা যায় যে, ঐ দেয়ালের দিকে দৃষ্টি কর, উহা যেখানে শেষ হইয়াছে তাহাই আকাশ, এখানে ঐ ভিত্তির সাহায্যে আকাশকে পরিজ্ঞাত হওয়া গেল। এইরূপ ব্রহ্মকে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা, জ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। তোমাতেও সেই সমুদয় বর্ত্তমান আছে সুতরাং তুমিই তাহা অর্থাৎ ব্রহ্ম। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—জীব ও ঈশ্বর পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মযুক্ত সুতরাং উভয়ে এক, উহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? 'ত্বং' পদের অর্থ দুই প্রকার, বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ।

ত্বং-পদের বাচ্যার্থ—

আত্মাতে শরীর, ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম আরোপ করিয়া, অভিমানবশতঃ আমি দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যে জ্ঞান হয় অর্থাৎ আমি দেহ এইরূপ বোধযুক্ত চৈতন্য ও তাহার কারণ অজ্ঞানতা এই দুইটী 'ত্বং'পদার্থের বাচ্যার্থ। ইহা দ্বারা অল্পজ্ঞ, দুঃখে জীবনযাত্রানির্ব্বাহকারী, সংসার আশ্রয়যুক্ত প্রাকৃত জীব 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ হইল।

'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ—

যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী, অথচ দেহেন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ তাঁহাকে 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ বুঝা যায়। যেমন প্রদীপের আবশ্যক হইলে তৈলাধার, বর্ত্তি প্রভৃতি লক্ষ্য না করিয়া, দীপশিখাকে লক্ষ্য করা হয়,

তদ্রূপ 'ত্বং'শব্দ দ্বারা দেহেন্দ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তদতীত অজ্ঞান দ্বারা অসংস্পৃষ্ট চৈতন্যকে বুঝা যায়।

'তৎ' পদের বাচ্যার্থ—

আকাশ হইতে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্ত যে সমষ্টিরূপে 'অজ্ঞান' বর্ত্তমান আছে, সত্ত্বগুণবহুল সেই অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরত্ব ও অন্তর্য্যামিত্বপ্রভৃতি গুণসমূহসমন্বিত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তৃরূপ যে সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই বাচ্যার্থ বলিয়া কথিত হন।

'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ—

যিনি বেদবাক্যপ্রতিপাদ্য, অনন্ত বিশ্বের অতীত অবিনশ্বর, অদ্বয়, শুদ্ধ, সর্ব্বপ্রকারবিকারবিহীন ও যিনি স্বয়ং জ্ঞেয় তিনিই 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ। 'তৎ' ও 'ত্বং' পদদ্বয়ের বাচ্যার্থে বিরোধ দেখা যায়। কারণ জীব ও ঈশ্বর পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী। অগ্নিও হিম যেমন বিরোধী, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব তেমনই বিরোধী, সুতরাং তাহাদের ঐক্য সম্ভব নহে, ইহাই বাদীর উক্তি। কিন্তু শ্রুতি পুনঃ পুনঃ একত্বই ঘোষণা করিতেছেন, সুতরাং উহাতে শ্রুতির নিরসন হওয়া সম্ভব। তজ্জন্য উহার প্রকৃত অর্থ এবং কিরূপে একত্ব-প্রতিপাদন হইতে পারে, তাহাই দেখিতে হইবে। 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থে কোনরূপ বিরোধ নাই সুতরাং ঐ শব্দদ্বয় দ্বারা যদি লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি শ্রুতি রক্ষা হইতে পারে। অতএব অভিমত অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষণা তিন প্রকার—'জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা, জহদজহল্লক্ষণা।' জহৎ অর্থ ত্যাগ। "গঙ্গায় গোপ বাস করে" এখানে গঙ্গাশব্দে জলের খাত (ভাগীরথীপ্রবাহ) বুঝা যায়, কিন্তু গঙ্গায় গোপের বাস সম্ভব নহে, লক্ষণা দ্বারা তীর বুঝিয়া লইতে হয়। এ স্থলে গঙ্গার প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করিয়া, তীর অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, ইহাকে 'জহল্লক্ষণা' বলা হয়।

"তত্ত্বমসি" বাক্যে জহল্লক্ষণা স্বীকার করা যায় না। কারণ গঙ্গায় ঘোষ বাস করে, একথা বলিলে গঙ্গা ও ঘোষের আধার-আধেয়স্বরূপ সম্বন্ধ জ্ঞাত হয় অর্থাৎ গঙ্গা আধার এবং ঘোষ আধেয় হয়। কিন্তু "তত্ত্বমসি" বাক্যে আধার-আধেয়ভাব নাই। রক্তবর্ণ যাইতেছে, এইরূপ বলিলে গুণের গমন অসম্ভবহেতু, তদ্‌গুণবিশিষ্ট অশ্বপ্রভৃতিকে বুঝায়, ইহার নাম 'অজহল্লক্ষণা'। অজহল্লক্ষণাও 'তত্ত্বমসি' বাক্যে সম্ভবপর নহে। যে হেতু ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব-প্রতিপাদক 'তত্ত্বমসি' এইবাক্যে পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য ও অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যকে বুঝায়, উভয়ের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব ত্যাগ করত উভয়ের একত্ব সম্পাদন হয় না, তজ্জন্য অজহল্লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে না। 'তৎ' শব্দের অর্থ পরোক্ষ চৈতন্য ও 'ত্বং' পদের অর্থ অপরোক্ষ চৈতন্য, এখানে চৈতন্য অংশে উভয়ের তুল্যতা আছে, সুতরাং এখানে 'জহদজহল্লক্ষণা' স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারই নাম 'ভাগলক্ষণা' যদি বলা যায়, সর্ব্বত্র একপদে লক্ষণা স্বীকৃত হয়, কিন্তু 'তত্ত্বমসি' বাক্যে উভয় প্রকারে লক্ষণার প্রয়োজন কি? কেবল 'তৎ' বা 'ত্বং' পদের প্রতিপাদ্য অর্থের লক্ষণা স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করিলেই চলিতে পারে, সুতরাং উভয়পদে লক্ষণা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার উত্তরে বলা যায়—একটী মাত্র পদ নিজের অংশ ও পরের অংশ কিরূপে লক্ষিত করিবে। যদি একটীমাত্র পদেই অর্থ পরিস্ফুট হইত, তবে লক্ষণাব্যতীত অর্থ প্রতীতি হইতে পারিত, সুতরাং লক্ষণা স্বীকার করা প্রয়োজন ছিল না। তজ্জন্য উভয় পদেই লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে। 'সেই এই দেবদত্ত' বলিলে, তৎকাল এবং তদ্দেশে যে দেবদত্ত উপস্থিত ছিল, তাহাকে এতৎকাল এবং এতদ্দেশে উপস্থিত বুঝা যায়, পৃথক্ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় না। সেই এই এবং এই সেই বিশিষ্টতা ত্যাগ করিলে অবিরোধী দেবদত্তকে বুঝা যায়। তদ্রূপ 'তত্ত্বমসি' বাক্যে বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করিলে,

সমস্ত উপাধিরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, বিশেষশূন্য, আদি ও বিনাশরহিত ব্যাপকমাত্র, কূটস্থ, তর্কের অবিষয়, একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই, অবশিষ্ট থাকেন। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ উপাধি দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। ঐ উপাধিদ্বয় অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত, সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়ই অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া তুল্য (মিথ্যা), বাস্তবিক, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত এই তিন প্রকার ভেদ ব্রহ্মে নাই। শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, বুদ্ধি কিংবা অহঙ্কার অথবা ইহার সমষ্টি কিছুই আত্মা নহে। যিনি এই সমুদয়ের সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই 'আত্মা'। যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহারই বৃদ্ধি অথবা নাশ উভয়ই আছে। কিন্তু আত্মার উৎপত্তি বিনাশ বা কোন প্রকার বিকার কিছুই নাই। সমাধিপরায়ণ নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তি আত্মাকে এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন---তিনি একমাত্র আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তা দেখিতে না পাইয়া নিজেকেই অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন। যাঁহার এতাদৃশ জ্ঞান হয়, তাঁহার আর ভয় করিবার কিছু থাকে না, কারণ নিজেকেই সর্ব্বব্যাপী দেখিতে পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা না থাকায় তাঁহার আর ভয়ের কিছু থাকে না। তখন তিনি নিজেকেই সর্ব্ব পদার্থে বিদ্যমান সর্ব্বাত্মক সর্ব্ব পদার্থ হইতে অতিরিক্ত 'নেতি নেতি' দ্বারা উপলব্ধ, সত্যস্বরূপ, নিত্য, অদ্বিতীয় বোধস্বরূপ আত্মা বলিয়া জ্ঞাত হন, সুতরাং তাঁহার আর কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না। যাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনার বলে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে তীব্র মুমুক্ষা ও সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, এমন ধন্য ব্যক্তিই শ্রবণে মুখ্য অধিকারী। তাঁহার গুরুমুখে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থ শ্রবণমাত্রই ব্রহ্ম এবং আত্মার অভেদ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, এবং যথার্থ রজ্জুজ্ঞানরূপ অধ্যারোপ ও অপবাদনামক রীতিদ্বয় অবলম্বন

করিয়া "তত্ত্বমসি" বাক্যার্থ কথিত হইলে নির্ম্মলান্তঃকরণ পুরুষের তৎক্ষণাৎ 'সেই ব্রহ্মই আমি' এইরূপ জ্ঞান উদিত হয়। তখন তাঁহার অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি উদিত হইলে ক্ষুদ্র আমি (জীব) এইরূপ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, কারণ অখণ্ডাকার বৃত্তি উদিত হইলেই অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞান বাধা পাইয়া নষ্ট হয়। সূত্র দগ্ধ হইলে যেরূপ তৎক্ষণাৎ পটও দগ্ধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান নষ্ট হইলে যাবতীয় অজ্ঞানের কার্য্য দেহ, আমি, আমার প্রভৃতি ঘুচিয়া যায়। যতদিন এই অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, ততদিন আত্মা প্রকাশিত হইতে পারে না। যেমন সূর্য্য উদিত হইলে, সমস্ত অন্ধকার আপনি দূরীভূত হয় এবং তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কোন দীপের আবশ্যকতা থাকে না; তদ্রূপ অখণ্ডাকার বৃত্তি উদিত হইলেই, ক্ষুদ্র জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। দর্পণে যেরূপ মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু দর্পণ অপসৃত হইলেই মুখই অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞানরূপ উপাধি দূর হইলেই বিম্বস্থানীয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। যাহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল নহে, তাহারা শ্রবণের পর ক্রমাগত ঐ তত্ত্ব মনন করিতে থাকিবেন, নতুবা তাহাদের তাদৃশ অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অবিরত তৎপরভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বুদ্ধি সূক্ষ্মভাব ধারণ করে, তাহার পর যথার্থ বস্তুর উপলব্ধির জন্য, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিমিত্ত গুরুমুখ হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। দেহপ্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিজাতীয় প্রত্যয় পরিত্যাগ করিয়া তৈলধারার ন্যায় অবিরত আত্মতত্ত্বচিন্তার প্রবাহ উত্থাপিত করাকে ধ্যান বলা হয়। যতদিন প্রমাণগত সন্দেহ নিঃসংশয়রূপে দূরীভূত না হয়, ততদিন গুরুমুখে নিরন্তর শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, এবং যতদিন প্রমেয়গত সন্দেহ দূরীভূত না হয়, ততদিন শ্রুতির অনুকূল যুক্তিসমূহদ্বারা পুনঃপুনঃ আত্মতত্ত্ব মনন করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ বোধ দূর না

হয়, ততদিন এই প্রকার ধ্যান করিতে হইবে, তদনন্তর সমাধির উদয় হইবে। এই সমাধি সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প ভেদে দ্বিবিধ। সবিকল্প সমাধি আবার দুই প্রকার যথা—দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধ।

সবিকল্প সমাধি যথা—

জ্ঞান ও জ্ঞাতা বিলয় প্রাপ্ত না হইয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মের তদাকারাকারিত চিত্তে যে অবস্থিতি, তাহার নাম সবিকল্প সমাধি। এই অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিন বস্তুই থাকে, কিন্তু জ্ঞেয় বস্তুতে চিত্ত তদাকারাকারিত হয়। যেমন মাটীর হাঁড়ী দেখিয়া তাহাকে মাটী বলিয়া জানিয়াও হাঁড়ী বলিয়া বোধ হয়।

নির্ব্বিকল্প সমাধি—

জ্ঞাতৃত্বাদিভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞেয় বস্তুতে মনের দৃঢ় অবস্থানকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। যেমন জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে লবণের আর পৃথক্ সত্তা প্রতিভাত হয় না, শুধু জলই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তায় চিত্তবৃত্তি স্ফুরিত হয়।

শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি—কাম, ক্রোধপ্রভৃতি দৃশ্যসমুদায় লোপপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ পুরুষের, আমি শুদ্ধ এই প্রকার শব্দমিশ্র যে জ্ঞান দেখা যায়, তাহাকে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে। যেমন এই তিন প্রকার সমাধি হৃদয়দেশে অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্রূপ দ্বৈতকার্য্য নিবৃত্তির নিমিত্ত বাহ্য দেশেও অন্য প্রকার সমাধি আবশ্যক। ব্রহ্মে আরোপিত নাম, রূপ উপেক্ষা করিয়া স্বরূপমাত্র বোধকে বাহ্য সমাধি বলে। নাম ও রূপকে পৃথক্ করিয়া বিলীন করত সকলের অধিষ্ঠানভূত "সচ্চিদানন্দ পর ব্রহ্ম আমিই" এই রূপ নিশ্চয়-চিত্ত হইবে। "শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দেহ, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, দেশ, কাল, দিক্ ইত্যাদি সকলের অধিষ্ঠানভূত

সদাত্মক পরব্রহ্মই আমি ; আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, ব্যাপক, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ মহাকালস্বরূপ ব্রহ্ম"—এই রূপ চিন্তা করিবে। সাবধান ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এবংপ্রকার চিন্তা করিবে। ইহারই নাম যোগ। যথা—

"নির্ব্বিকল্পসমাধি র্যো বৃত্তির্নৈশ্চল্যলক্ষণা।
তমেব যোগ ইত্যাহুর্যোগ-শাস্ত্রার্থকোবিদাঃ ।।"

"চিত্তবৃত্তির স্থিরতাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। যোগবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকেই যোগ বলিয়াছেন।" যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি—এই আটটিকে যোগাঙ্গ বলে।

সকলই ব্রহ্ম—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্রিয়সকলের সংযম করার নাম যম। আমি পর ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞানপ্রবাহ ও ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতের মিথ্যাজ্ঞান, ইহাকে—'নিয়ম' কহে। যাঁহাতে সর্ব্বভূত সিদ্ধ আছে এবং যে সুখস্বরূপ ব্রহ্মে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা নাই—সেই কালত্রয়াবস্থায়ী ব্রহ্মকেই 'আসন' বলে। চিত্তাদি সর্ব্বপ্রকার ভাবপদার্থে ব্রহ্মভাবনা-বশতঃ যে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাকে 'প্রাণায়াম' কহে। প্রপঞ্চের নিষেধ অর্থৎ মিথ্যাত্বপরিজ্ঞানকেই 'রেচক' বায়ু কহে।

আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ ভাবনাকে পূরক বায়ু কহে। 'একই ব্রহ্ম সর্ব্বময়' এইরূপ বৃত্তির নিরোধকে 'কুম্ভক' কহে। এই প্রকার রেচক পূরক ও কুম্ভকাত্মক প্রাণায়ামই জ্ঞানীদিগের প্রাণায়াম। প্রাণবায়ুর পীড়ন দ্বারা যে প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান, তাহা অজ্ঞানীরাই করিয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়সমূহে আত্মত্বপরিহারপূর্ব্বক চৈতন্যে মনকে নিমজ্জনের নাম "প্রত্যাহার"। মনঃ যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক যে মনঃস্থাপন, তাহাকে উৎকৃষ্ট ধারণা বলে। 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ সাধুবৃত্তি দ্বারা মনকে আশ্রয়হীন অবস্থায় আনিতে পারিলে তাহাকে 'ধ্যান' বলে। নির্ব্বিকার চিত্তে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ

বস্তুতেই আসক্তিরহিত হয় এবং সমাধিপরিপাকহেতু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে থাকে। ইহারই নাম 'অসংসক্তি'নামক পঞ্চম ভূমিকা।"

(৬) পদার্থাভাবনী—

"ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া দৃঢ়ম্।
আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থনামভাবনাৎ॥"

"পাঁচটী ভূমিকা অভ্যস্ত হইলে দৃঢ়রূপে আত্মাতেই আনন্দ উৎপন্ন হইতে থাকে, সুতরাং আভ্যন্তরিক মনঃপ্রভৃতি বা বাহ্য দৃশ্য পদার্থের ভাবনা সম্পূর্ণপ্রকারে তিরোহিত হয়, সুতরাং আত্মা দৃষ্টৃরূপে স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। ইহারই নাম "পদার্থাভাবনী।"

(৭) তুর্য্যগা—

"ভূমিষট্কচিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ।
যৎ স্বভাবৈক-নিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ॥"

"সর্ব্বদা ছয়টী ভূমিকা অভ্যাস করিতে করিতে ভেদবুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা সমুদয় লোপ পাইয়া যায় এবং আত্মভাবের সম্পূর্ণ নিষ্ঠা উদিত হয়। ইহারই নাম 'তুর্য্যগা গতি।" এইরূপ অবস্থার নাম জীবন্মুক্তি। ইহার পর বিদেহমুক্তি হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তি অবস্থায় দেহাদি প্রপঞ্চের প্রতীতি সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত হয় না। অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপনামক দুইটী শক্তি আছে। জীবন্মুক্তিতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং আবরণশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়, বিক্ষেপশক্তি বর্ত্তমান থাকে, তজ্জন্যই প্রপঞ্চ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় না। রজ্জুতে সর্পভ্রম দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ রজ্জু দেখিয়া যেমন সর্পভ্রান্তির উদয় হয় এবং রজ্জুজ্ঞান হইলেও কিয়ৎকালপর্য্যন্ত ভয় কম্পাদি বর্ত্তমান

থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়ায় জীবন্মুক্তের দৃশ্য-প্রপঞ্চের প্রতীতি হইয়া থাকে।

জীবন্মুক্তির লক্ষণ—

(১) মিথ্যা দৃশ্য জগৎ দর্পণপ্রতিবিম্বিত নগরের ন্যায় বোধ হয়।

(২) সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া ব্যবহারেও কর্ত্তৃত্বশূন্য, জাগ্রতেও সুষুপ্তির ন্যায় নির্ব্বিকার।

(৩) তাঁহার মুখপ্রভা সুখে, দুঃখে সমান এবং তিনি যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট।

(৪) তিনি আত্মাতে সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়া অবিদ্যালেশনাশের জন্য আত্মাতে জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকিয়া কোন কিছুই করেন না, কোন কিছুই দেখেন না, সর্ব্বপ্রকার বাসনাশূন্য।

(৫) বাহিরে রাগদ্বেষাদির অভিনয় করেন, ভিতরে তদ্বর্জ্জিত এবং চিদাকাশে অবস্থিত।

(৬) ইঁহার অহংভাব নাই এবং বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, পাপপুণ্য কিছুতেই লিপ্ত নহে।

(৭) তিনি কাহারও উদ্বেগ জন্মান না, তাঁহাকেও কেহ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না।

(৮) সংসারে আস্থা নাই, অনাস্থাও নাই, ইন্দ্রিয় থাকিলেও তাহার অনধীন, চিত্ত থাকিলেও চিত্তরহিতের ন্যায়।

(৯) জীবন্মুক্ত চিদাত্মার উন্মেষে ও অর্দ্ধনিমেষে যথাক্রমে তিন লোকের নাশ ও উৎপত্তি হয়।

(১০) বিষয়ব্যবহারে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি রাগ, দ্বেষ, হর্ষ-বিপদাদি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা অবিচলিত, সর্ব্বদা সুশীতল, শান্তিপূর্ণ এবং সর্ব্ব পদার্থে আপনার পূর্ণতা অনুভব করেন।

(১১) পবন চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলে যেমন স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ দেহপতন হইয়া গেলে জীবন্মুক্তও বিদেহমুক্ত হন। বিদেহমুক্তের পুনরায় উদয়, অস্ত নাই; তিনি ব্যক্তও নহেন অব্যক্তও নহেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী।"

যোঃ বাঃ উঃ কালীবরবেদান্তবাগীশ (অনুবাদ)

"নিঃসঙ্গ এব মুক্তঃ স্যাদ্ দোষাঃ সর্ব্বে চ সঙ্গজাঃ।
সঙ্গাৎ পতত্যধো জ্ঞানী চাবশ্যং কিমুতাঽল্পবিৎ॥
সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্ব্বীত সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্।"

নবম অধ্যায়।

যোগসাধনাই প্রকৃষ্ট উপায়।

জাগতিক সমুদয় পদার্থই পরিচ্ছিন্ন এবং পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং মানবও পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের অন্তর্গত। জগতের অন্য কোনও জীব ইহা জ্ঞাত নহে। তজ্জন্য অপরিবর্ত্তনীয় কোন পদার্থ পাইবার আকাঙ্ক্ষাও তাহাদের নিকট পরিচিত নহে। চিরকাল ক্রমাগত বস্তুসমূহের পরিণাম দেখিয়া এবং অবশের ন্যায়, ত্যাগ ও গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়া মানুষ, তাহার গণ্ডি একটু বাড়াইতে চায়। যাহার ফলে এ জগৎ তাহার নিকট সুখের নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন স্বতঃই একটা প্রশ্ন হৃদয়ে জাগরূক হয়—যে তবে এটা কি? নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলিয়া কিছু আছে, অথবা এইরূপ সুখ-দুঃখ-মিশ্রণই জগতের পরিণাম? এই যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, যাহা নিত্যতার দিকে মানুষের মনটাকে প্রকারান্তরে চালিত করে, তাহা হইতেই সমুদয় দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। "বিশ্বাসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি যিনি যাহাই বলুন না কেন, জিজ্ঞাসাবৃত্তি সকল জীবেরই অন্তর্নিহিত জ্ঞানলাভের বাহ্য চিহ্ন, তাহা কাহারও অস্বীকার করার উপায় নাই। বেদ বা শ্রুতি মানুষকে এই জ্ঞানরূপী অমৃতের সন্ধান বলিয়া দেয়। কিরূপে এই অমৃত পান করিয়া জীব অমর হইবে এবং জরামৃত্যুরূপ দুঃখসঙ্কুল সংসারকে গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান করিতে সমর্থ হইবে, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি মাতার ন্যায় হিতকারিণী হইয়াছেন। শ্রুতির আদেশ প্রতিপালন করিলেই আমরা জাগতিক সমুদায় সুখ, শান্তির অধিকারী হইয়া চরমে পরম শান্তির অধিকারী হইতে পারি।

সন্দেহ জীবের পক্ষে অতি স্বাভাবিক বস্তু। সুতরাং মনে হইতে

পারে, শ্রুতিকে এই প্রকার বিশ্বাস করিতে যাই কেন? কিন্তু শ্রুতিতে এই প্রকার সন্দেহের অবসর নাই। মনুষ্যবুদ্ধি ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল। সুতরাং সেই বুদ্ধিসাহায্যে, বিচার দ্বারা যে সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহার প্রতিপদেই ভ্রম অসম্ভব নহে। পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রেই অপরিচ্ছিন্ন বস্তুকে জানিতে অসমর্থ। কারণ, তাহা স্বল্পদেশব্যাপী এবং ক্ষুদ্র। শ্রুতি-প্রতিপাদিত সত্য অপরিচ্ছিন্ন এবং বৃহৎ। কারণ উহা মানবের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত নহে। উহাতে কোনরূপ ভ্রান্তদৃষ্টি নাই। শ্রুতিতে যে সত্যের তথ্য লিখিত আছে তাহা সমাধিজাত বুদ্ধি দ্বারা অনুভূত, সুতরাং তাহাতে ভ্রমের বিন্দুমাত্রও অবসর নাই। যে সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়-সাহায্যে অনুভূত হয়, তাহাতে অনেকগুলি সহকারী কারণ প্রয়োজন এবং ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি ততোধিক ধারণক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা ছাড়া বুদ্ধিশক্তি তাহার একমাত্র উপাদান। কিন্তু বুদ্ধি ব্যক্তিবিশেষে অতি প্রখর বা অতিমন্দ। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির বিচারেই উহার ফল, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে; সমাধিজা প্রজ্ঞা তাদৃশী নহে। সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযত হইলে এবং চিত্ত সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইলে, সেই নিরুদ্ধ চিত্তে যে অনুভূতি আসে, তাহাকে সমাধিজা প্রজ্ঞা বলে। ঐ সমাধি সকলেই অভ্যাস করিতে পারে এবং যদি সিদ্ধি লাভ করে, তাহা হইলে একই প্রকার অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। সমাধির স্তরবিশেষে আবদ্ধ হইলেই ঐ সত্য পৃথক্‌রূপে অনুভূত হওয়া সম্ভব।

আমরা শ্রুতির পক্ষপাতী এবং অন্য শাস্ত্রাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তাহার কারণ এই যে, তাহা মূল শ্রুতি অনুযায়ী হইলেও বিচারকালীন তাঁহারা পরপক্ষখণ্ডন এবং নিজ মত সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক স্থলে অতি প্রাকৃত নানাপ্রকার যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। তাহাতে মূল বিষয় শাখা-প্রশাখার আবরণে আবৃতপ্রায়। বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং

ধৈর্য্যব্যতিরেকে, বহু অসত্য মতবাদ হইতে সত্য বস্তু নিষ্কাষণ কঠিনতম ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য অল্পবুদ্ধি মানবগণ স্বীয় বুদ্ধিকেই তুলাদণ্ড ধরিয়া নিজেও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আর সহস্র ব্যক্তির জন্য মোহময় ভীষণ কূপসমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে পতিত হইয়া আরও অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ চিরতরে ডুবিয়া যাইতেছেন। আমরা এতটুকু চাই যে, তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার সীমা নির্দ্দেশ করুন এবং অন্য সকলের সর্ব্বনাশের কারণ না হন।

আমরা বৈদিক সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া কেন ধারণা করি তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও যুক্তির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। আশা করি, এই সূত্র অবলম্বনে পাঠকেরা প্রকৃত সিদ্ধান্তে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবেন। এবার আমরা মূল বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্রতী হইতেছি।

বৈদিকমতানুযায়ী জ্ঞানপথের অনুসরণ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় বিচার ও ধ্যানপ্রণালী পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। বিষয়ের গুরুত্ব এবং জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করিতে সমর্থ, এরূপ সাধক অতি বিরল; তজ্জন্য আমরা কর্ম্মযোগ বর্ণনা করিতেই বিশেষ প্রয়াস পাইব।

কর্ম্মযোগ আবার মন্ত্র, হঠ, লয় এবং রাজযোগ এই চারি প্রকার যোগপ্রণালীতে বিভক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—মন্ত্র, হঠ ও লয় রূপ যোগের ফলে রাজযোগরূপ জ্ঞান উপলব্ধিতে উন্নীত হওয়া যায়। রাজযোগ কোন প্রকার প্রণালী নহে। ইহার আংশিক সত্যতা থাকিলেও যোগাচার্য্যগণ, পাতঞ্জল এবং গীতাকথিত সাধনপ্রণালীকে রাজযোগ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাদেরই মতে অগ্রসর হইব। তাহার কারণ এই যে জ্ঞান সর্ব্বসম্মত চরম বস্তু, তাহাকে কোনও প্রকার যোগ নামে অভিহিত না করাই সঙ্গত। উহা সর্ব্বপ্রকার যোগসাধনার ফলস্বরূপ বলিলেই ঠিক বলা হয়। যোগসম্বন্ধে আমরা

অনেক কথাই বলিতেছি, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই প্রায় একই কথ শুনিতে পাওয়া যায় যে—যোগ কলিযুগের জন্য নহে। উহা সত্যাদি যুগেই ছিল, উহা বর্ত্তমান সময়ের অতিশয় প্রতিকূল। যোগাভ্যাসে শারীরিক উন্নতি হয়, কিন্তু ভগবানের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। যোগে প্রতিপদেই পতনের আশঙ্কা আছে। যোগের ফলে অতি দুঃসাধ্য ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। মোটের উপর যোগ-কথাটীই এ যুগে অতি হেয়। তজ্জন্য তাহাদের মতে মহাজনগণ ও শাস্ত্রাদি কলিযুগে যোগ-সাধনা করিতে নিষেধ করিয়া শুধু ভগবানের নাম অবলম্বন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যদি এই সমুদয় বিশ্বাস করিয়া লই, অবশ্যই তাহা হইলে এতাদৃশ গ্রন্থপ্রণয়ন নিতান্ত অপকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা ঐ সব মতবাদ অলস ও কাপুরুষদিগের উক্তি বলিয়া গণ্য করি। এরূপ মতবাদীদের অস্তিত্ব জগতে চিরকালই আছে, সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগের দলপুষ্টির নিমিত্ত ঐরূপ মত পোষণ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ঐ সব কলিচরদিগের বাক্যে কখনই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই যে, ভৃত্য কখনও প্রভুর উপর ক্ষমতা স্থাপন বা আদেশ করিতে পারে না। ভৃত্যের ধর্ম্ম প্রভুর আদেশপালন এবং তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করা। সুতরাং ভৃত্যস্থানীয় পুরাণাদিতে কষ্ট-কল্পিত বা প্রক্ষিপ্ত কোন একটী বচন বাহির করিয়া প্রভুস্থানীয় শ্রুতি, স্মৃতির শাসনের উপর এতাদৃশ কটাক্ষপাত এ যুগেই সম্ভব। কেহ যদি উপনিষদাদি হইতে ঐরূপ প্রমাণ বাহির করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতাম যে, কলিযুগে যোগপ্রথাটী অনুষ্ঠেয় নহে। কিন্তু কেহ কখনও অদ্যাপি এরূপ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের সম্বল পদ্মপুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এক আধটী বচন। সেই

়ব পুরাণবচনের উপর গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভিন্ন, কাহারও আস্থা নাই। না থাকার কারণ যে, উহাতে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শাস্ত্রে বলে ঃ—"অতঃ সর্গো বিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তর এব চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।"

অর্থাৎ "সৃষ্টি, (স্থিতি) প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশমালা (প্রধান ব্যক্তিদিগের জীবনীআলোচনা) এই পাঁচটী পুরাণের লক্ষণ। এতাদৃশ লক্ষণপঞ্চক যাহাতে আছে, তাহাকেই পুরাণ বলা যায়।"

এতদতিরিক্ত যাহা কিছু, তাহা পুরাণের অন্তর্গত নহে। সুতরাং তাহা পুরাণ বলিয়া বুদ্ধিমান্ লোক স্বীকার করেন না। হইতে পারে তাহাতে অনেক উত্তম উপদেশ আছে বা তাহা বহু গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। দুধের নামে যদি ঘোল বিক্রয় হয়, তাহা হইলেও উহা দুগ্ধ নহে। বর্ত্তমান পুরাণে অনেক নূতন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক শ্রুতির আজ্ঞা সর্ব্বোপরি বলবতী; সুতরাং শ্রুতিপ্রামাণ্যে যদি যোগ বর্ত্তমান কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তবেই আমরা মানিতে বাধ্য, নতুবা বেদবিরুদ্ধ কোন কথাই হিন্দুর গ্রাহ্য নহে। তাহার প্রমাণস্বরূপে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের কথা বলিতে পারি যে, একদিন বুদ্ধদেবের ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং অহিংসার বাণীতে সমস্ত ভারতবাসী বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে, সেই অবৈদিক মত ভারত হইতে চিরতরে প্রস্থান করিয়াছে। বেদের অনুকূল উপাসনাদি হিন্দুর গ্রহণীয়, অন্য উপাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

যাঁহারা বলেন—যোগের সহিত ভগবানের কোনও সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা

হয়ত যোগ কাহাকে বলে, তাহা জ্ঞাত নহেন; অথবা ভগবান্‌-শব্দের দ্বারা বেদস্মৃতিবিরুদ্ধ খোদা বা গড্‌ কিছু বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের যদি ইহার একটীও অভিপ্রেত না হয়, তবে হিন্দুর যে কোন শাস্ত্র তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাই একটু লক্ষ্য করিতে বলি। যে শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের বেদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রায় প্রতিস্কন্ধেই যোগ-সম্বন্ধীয় কিছু না কিছু উপদেশ আছে। ভগবৎ-সখা উদ্ধবের সহিত কথোপকথন (ভাগবত ১১ স্কন্ধ ১৪ অধ্যায়) অধ্যয়ন করিলেই তাঁহাদের এ ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে। যদি তাঁহারা ঐ সব স্বীকার করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে বাতুলালয়ে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করা বুদ্ধিমান্‌মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যদি ১০ম স্কন্ধই তাঁহাদের উপজীব্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাষাতেই বলিতে পারি যে, ত্রেতাযুগে ঋষিরা দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ভগবত্তা উপলব্ধি করিতে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই বৃন্দাবনে গোপিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরী হইয়াছিলেন, সুতরাং এই সব ভক্ত-নামধারী কামকাঞ্চনকলুষিত, শিশ্নোদরপরায়ণ মানবদিগের তাদৃশ আকাঙ্ক্ষা সুদূরপরাহত। বহু জন্মের তপস্যাসঞ্চিত পুণ্যবলে তাদৃশ ঋষিত্ব প্রথমে তাঁহারা লাভ করুন, তার পর বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনে যত্নবান্‌ হইবেন, নতুবা বৃথা অভিনয় করিয়া নিত্য নূতন নরকের সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নহে। তাহা বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের কলুষিত চিত্রে প্রতিপদেই সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। আমরা চাই, স্বীয় হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যবেক্ষণ করত নিজের জ্ঞান, ভক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করা, এবং সরল, ব্যাকুল প্রাণে শাস্ত্রকথিত মার্গে অন্তঃকরণ পরিচালিত করা। নতুবা বচন-সর্ব্বস্ব নামের বলে সর্ব্ববিধ পাপানুষ্ঠানকারী কতকগুলি অবতার, জাতি এবং সমাজের পক্ষে আবর্জ্জনামাত্র। যোগের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বহু আছে। গীতার একটী শ্লোকমাত্র এখানে উল্লেখ করিতেছি, কারণ উহা

শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য। যাঁহার ভগবদ্‌বাক্যে বিশ্বাস আছে, তিনি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন, আশা করা যাইতে পারে। যথা :—

"বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।

অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্" ॥৮॥২৮॥

যাঁহারা বলেন—যোগের দ্বারা শারীরিক উন্নতিমাত্র হয়, পারমার্থিক উপকারিতা নাই, তাঁহারা নিতান্তই দয়ার পাত্র, সন্দেহ নাই। যোগ-শব্দের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, তাহা তাঁহারা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কিছুই জানেন না, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানোন্মেষের জন্য কিছু বলা আবশ্যক। কি প্রকার কার্য্যের বা কি প্রকার মনোবৃত্তির নাম যোগ, সে সঙ্কেতটী তাঁহাদের অজ্ঞাত, সুতরাং যোগ-শব্দের কতগুলি সঙ্কেত আছে, তাহা দেখান যাউক—

১। একটী বাহ্য বস্তুতে অন্য একটী বাহ্য বস্তু সংযোগের নাম যোগ।

২। বস্তুসমূহের পরস্পর সংমিশ্রণের নাম যোগ।

৩। কার্য্যের কারণগুলির সমবায়ের নাম যোগ।

৪। বিধানানুসারে যোদ্ধাদিগের অস্ত্র-শস্ত্রাদি ধারণের নাম যোগ।

৫। বস্তুতত্ত্ব-নিশ্চায়ক যুক্তি-যুক্ত বাক্যের নাম যোগ।

৬। প্রকৃত তত্ত্ব গোপনপূর্ব্বক, ছলপূর্ব্বক কার্য্যপ্রদর্শনের নাম যোগ।

৭। দেহকে দৃঢ় এবং সুস্থির করার প্রণালীর নাম যোগ।

৮। সুশৃঙ্খলা সহ শব্দবিন্যাসের নাম যোগ।

৯। যে শক্তি সাহায্যে শব্দ অর্থ প্রকাশ করে, তাহার নাম যোগ।

১০। কর্ম্মের কুশলতার নাম যোগ।

১১। লব্ধ বস্তুর রক্ষণসামর্থ্যের নাম যোগ।

১২। দুর্লভ বস্তুর লাভোপায়নির্ণয়ের নাম যোগ।

১৩। এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিণত করার নাম যোগ।

১৪। আত্মাকে পরমাত্মায় সংযোগের নাম যোগ।

১৫। বস্তুবিষয়ক চিন্তাপ্রবাহ উত্থাপিত করার নাম যোগ।

১৬। সমস্ত মনোবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ।

১৭। চিত্তের একতানতার নাম যোগ।

১৮। যে অবস্থায় গুরুতর দুঃখের উপস্থিতিতেও চিত্ত বিচলিত হয় না, তাহার নাম যোগ।

১৯। সর্ব্ব বস্তুতে সম জ্ঞানের নাম যোগ।

২০। ভগবন্মূর্ত্তিতে (রাম, কৃষ্ণাদি) মনোনিবেশের নাম যোগ।

যোগ এই বিংশতি প্রকারে পূর্ব্বাচার্য্যগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত ছয়টীর উপায় অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ এবং দুঃসাধ্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ৭নং যোগকেই অজ্ঞগণ একমাত্র যোগ ধরিয়া লইয়াছেন। তাই তাঁহাদের ঐরূপ বালকের ন্যায় উক্তি। শেষোক্ত উপায় কয়টীতে যে ভগবান্ পাওয়া যায় বা উহার একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান, তাহা তাঁহারা জ্ঞাত হইয়া স্বীয় অজ্ঞতা পরিহার করুন, ইহাই প্রার্থনীয়।

যোগে পতনের আশঙ্কা আছে, এ আর একটী ব্যাধি। যাহার উত্থান আছে, তাহারই পতনের আশঙ্কা রহিয়াছে। শিশু যখনই নিজের পায়ে দাড়াইতে চায়, তখনই সে পড়ে। যখন সাঁতার শিখিতে চায়, তখনই সে জলে ডুবে। সুতরাং তথাকথিত বুদ্ধিমান্‌দিগের কথায় অদ্য হইতে তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ চেষ্টারহিত করা হউক। এইরূপ আদেশ যেরূপ নির্ব্বোধের বাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য, সেই রূপ পতনের আশঙ্কা দেখাইয়া যোগভ্যাসের নিবৃত্তি করাও বাতুলতা। যে শুইয়া থাকিবে সে আর পড়িবে কোথায়? অতএব, এখন হইতে আমরা সকলে মিলিয়া শয়ন করিয়াই থাকিব। কিন্তু ইহা অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে

আমাদের শারীরিক যন্ত্রাদি বিকল হইয়া সত্বরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। সুতরাং যোগে পতনের ভয় থাকিতে পারে, তথাপি তাহা অনুষ্ঠেয়। অন্যান্য সমুদয় পন্থায় কোন না কোনরূপ পতনের ভয় আছে, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিতেও পাওয়া যায়। 'সকলই ব্রহ্ম' এই ভান করিয়া যথেচ্ছাচার গ্রহণ আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীর পতনের এক লক্ষণ বলা যায়। নামে সর্ব্ববিধ পাপ যায়, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার পাপ অনুষ্ঠান অথবা রাধাকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিতে যাইয়া বৈরাগী বাবাজীদের যুগলরূপে অবস্থান, পুত্র উৎপাদন এবং সর্ব্ব বর্ণের একীকরণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের পতনের কারণ। সর্ব্বপ্রকার মদ্য, মাংসাদির আস্বাদন করত ভৈরবীর কোলে শয়ন তন্ত্রোক্ত বামাচারীর অধঃপতনের কারণ। স্ত্রীপুত্রপালনই একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে অন্যান্য আত্মীয়দিগকে দূরীভূত করা এবং ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান না করা, গৃহস্থের পতন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের উচ্ছেদসাধন অন্য তিন আশ্রমীর পতনের কারণ। ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসঙ্গে বাস ব্রহ্মচর্য্য নষ্টের কারণ। আশ্রমাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভজনাদির ছলে ইন্দ্রিয়তর্পণ সন্ন্যাসীর পতনের কারণ। প্রজার দুঃখ না দেখিয়া উদর পোষণের চেষ্টা হিন্দুরাজশক্তির পতনের কারণ হইয়াছে। ফলতঃ সর্ব্বত্রই এই পতনের কারণ আছে এবং হইতেছে, শুধু যোগের উপর তোমাদের এত আক্রোশ কেন? যোগ কি কাহারও মাথায় আঘাত করে? সাধনা করিতে করিতে ক্ষমতা লাভ হইবে তবে তাহার অযথা ব্যবহারে পতন হইতে পারে, এইত কথা? কিন্তু সেই অবস্থালাভের পূর্ব্বে আহারবিহারাদির যে সংযম অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দরকার, তাহাতে সমাজের উন্নতি ভিন্ন অবনতির কারণ কোথায়? তবে এই সংযম, ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিলেই অনেকের প্রাণে বড় আঘাত লাগে, তাঁহাদের ভোগে বিষম বাদ সাদে, তাই যোগের বিরুদ্ধে এত

প্রাণ কাঁদে। কিন্তু তাঁহারা নিজেরা না করুন, অন্যকে এইরূপ কুকথা বলা উচিত নহে।

আর একটী কথা শুনা যায় যে, যোগে রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব তাহা কর্ত্তব্য নহে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সকলেই যোগী, ঋষি ছিলেন, তাঁহারা আজ যোগের নামে রোগের ভয় দেখিতেছেন। শাস্ত্রে দেখি তাঁহারা বলিতেছেন—

'ভোগে রোগভয়ম্।' এবার লিখিতে হইবে—'যোগে রোগভয়ম্।' বাস্তবিক কি যোগাভ্যাসে রোগ হয়? তাহা নহে। উহা কতকগুলি স্বেচ্ছাচারীর বৃথা বাক্যাবলী। যাঁহারা পুস্তক দেখিয়া যোগাভ্যাস করেন, অথবা যাঁহারা অনিয়মিত আহার, বিহারে অভ্যস্ত ও ব্রহ্মচর্য্যহীন, তাঁহারাই নানাপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হন। ঘৃত শারীরিক বলপুষ্টির অতি শ্রেষ্ঠ উপাদান। কিন্তু অজীর্ণ রোগী তাহা কি কখনও জীর্ণ করিতে পারে? অথচ সে যদি বলে—কেহ কখনও ঘৃত খাইও না, উহাতে অজীর্ণ আনয়ন করে, তাহার এ কথায় কি কেহ কর্ণপাত করিবেন? তদ্রূপ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া 'যোগে রোগ হয়' এইরূপ বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতার ফল আর কি প্রকাশ করিবে? অনিয়মিত ভোজন, নিদ্রা এবং মৈথুন দ্বারা সংসার উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু রোগ হয় বলিয়া কাহাকেও ঐ সব ভোগের বস্তু ছাড়িতেও দেখা যায় না, বরং ভোগের উপকরণ যত প্রকারে বাড়াইতে পারা যায়, তাহারই জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম চলিতেছে। মোটের উপর যোগ-শাস্ত্রে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে, সেই সব অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র সুখের আশায়, বহু সাধ্য সাধনার ফলে প্রাপ্ত নরজন্ম, হেলায় নষ্ট হইত না। যদি যোগে শ্রদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে সমাজে অশীতিপর বৃদ্ধ, তৃতীয় পক্ষে বিবাহিত হইবার চেষ্টা করিত না। আর বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহরূপ নূতন ধর্ম্ম হিন্দুর সংসারে প্রবেশ করিত

না ও বালকাবস্থায় পুত্রলাভ করত হীনবীর্য্য কাপুরুষ কতকগুলি নরশরীর-ধারী পশুসদৃশ মানবের উৎপাতে বসুন্ধরা অস্থির হইয়া উঠিত না। তাই বলি যোগের উপর অযথা আক্রমণ না করিয়া, নিজের দিকে দৃষ্টি করাই ভাল এবং স্বীয় পন্থার প্রতিপাদ্য নামস্মরণাদি মহাপ্রভুর মতানুযায়ী অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। অসমর্থ হইয়া অন্যের দোষ খুঁজিতে যাওয়া মক্ষিকা-ধর্ম্মী জীবের কাজ। এ সব যুক্তিজাল পরিত্যাগ করিলেও ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, বারদীর ব্রহ্মচারী, রামদাস কাঠিয়া বাবাপ্রভৃতি মহাযোগী-দিগের দেশে ঐ সব উন্মত্তের প্রলাপ না বলাই শ্রেয়ঃ।

যোগী হওয়া বা যোগসিদ্ধিলাভ করা কতকটা শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই শারীরিক এবং মানসিক শক্তির তারতম্যহেতু, সময়ের দৈর্ঘ্য বা অল্পতা লাগিতে পারে। তজ্জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র শব্দদ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—মৃদু অধিকারী দীর্ঘকালে, মধ্য অধিকারী তদপেক্ষা অল্পকালে, এবং অধিমাত্র বা উত্তমাধিকারী অল্প কালেই যোগের এক অবস্থার সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ফলতঃ হতাশ হইবার কাহারও প্রয়োজন নাই। কারণ যতটুকু অভ্যাস করা যাইবে, ততটুকু ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সামান্য অভ্যাসদ্বারাই, যোগশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হইবে, যদ্দ্বারা তাহার কার্য্যশক্তি অতিশয় অধিক হইয়া যাইবে, সুতরাং ফললাভের সময় ততই নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। অমৃতসিদ্ধিনামক গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা :—

"ব্যাধিতা দুর্ব্বলা বৃদ্ধা নিঃসত্ত্বা গৃহবাসিনঃ।
মন্দোৎসাহা মন্দবীর্য্যা জ্ঞাতব্যা মৃদবো নরাঃ॥
এবং দ্বাদশভির্বর্ষৈরেকাবস্থা ন সিধ্যতি॥

নাতিপ্রৌঢ়া সমাভ্যাসাঃ সবীর্য্যাঃ সমবুদ্ধয়ঃ ।
মধ্যস্থা যোগমার্গেষু তথা মধ্যমযোগতঃ ॥
মধ্যোৎসাহা মধ্যরাগা জ্ঞাতব্যা মধ্যবিক্রমাঃ ।
অষ্টভির্বর্ষকৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি ॥
বীর্য্যবন্তঃ ক্ষমাবন্তো মহোৎসাহা মহাশয়াঃ ।
স্বস্থানসংস্থিতা স্বস্থা ভবেয়ুঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ ॥
সাক্ষরাশ্চ সদাভ্যাসাঃ সদা সংকারসংযুতাঃ ।
জ্ঞাতব্যা পুণ্যকর্ম্মাণো হ্যধিমাত্রা হি যোগিনঃ
একাবস্থাধিমাত্রাণাং ষড়্‌ভির্বর্ষৈঃ প্রসিধ্যতি ॥
মহাবলা মহাকায়া মহাবীর্য্যা মহাগুণাঃ ।
মহোৎসাহা মহাশান্তা মহাকারুণিকা নরাঃ ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-কৃতাভ্যাসাঃ সর্ব্ব-লক্ষণসংযুতাঃ ।
সর্ব্বাঙ্গসদৃশাকারাঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ ।
রূপযৌবনসম্পন্না নির্ব্বিকারা নরোত্তমাঃ ।
নির্ম্মলাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্ব্বিঘ্নাশ্চ নিরাকুলাঃ ॥
জন্মান্তরকৃতাভ্যাসা গোত্রবন্তো মহাশয়াঃ ।
তারয়ন্তি চ সত্ত্বানি তরন্তি স্বয়মেব চ ॥
অধিমাত্রতয়া সত্ত্বা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্বলক্ষণাঃ ।
ত্রিভিঃ সংবৎসরৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি ॥" অর্থাৎ—

১। যাঁহারা সর্ব্বদাই নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত, সুতরাং বলহীন দেহ, যাঁহাদের ধৈর্য্যগুণ মোটেই নাই অর্থাৎ যাঁহারা কোনপ্রকার ক্লেশই সহ্য করিতে পারেন না, যাঁহারা নিজের গৃহ ছাড়িয়া কোন পুণ্যতীর্থে বা নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে পারেন না, যাঁহাদের উৎসাহ নাই ও যাঁহারা ক্লীবতুল্য নর, তাঁহারা মৃদু অধিকারী নামে কথিত। এই সমস্ত গুণ-

সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ দ্বাদশ বৎসরেও যোগের কোন অবস্থা লাভ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। ইঁহারা মন্ত্রযোগের অধিকারী।

২। যাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ নহেন, যাঁহারা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে এবং সমমাত্রায় যোগ অভ্যাস করিতে পারেন, যাঁহারা অতিশয় বলবীর্য্যশালী, যাঁহাদের বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ সর্ব্বাবস্থায় সম থাকে অর্থাৎ যাঁহারা বিচলিত হন না, যাঁহারা যোগমার্গের মধ্য পথ অর্থাৎ হঠযোগ অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহাদের সংসারে অতিশয় আসক্তি বা বিরক্তি নাই, যাঁহাদের উৎসাহ মধ্যম এরূপ সাধকগণ মধ্যমাধিকারী বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহারা পরিশ্রম করিলে কোন এক অবস্থা আট বৎসরে আয়ত্ত করিতে পারেন।

৩। যাঁহারা শারীরিক অথবা মানসিক বলে অতিশয় বলী, যাঁহাদের উৎসাহ অদম্য অর্থাৎ কিছুই যাঁহাদের সাধনা হইতে বিচলিত করিতে পারে না, যাঁহারা সামর্থ্যসত্ত্বেও অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, যাঁহাদের হৃদয় অতি উদার, যাঁহারা দীর্ঘকাল একস্থানে বাস করিতে পারেন, যাঁহাদের দেহ নীরোগ, যাঁহাদের বুদ্ধি স্থির, যাঁহাদের শাস্ত্রে অধিকার আছে, সর্ব্বদা যাঁহারা সাধনায় ব্রতী থাকেন, শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রানুশীলনে যাঁহাদের সমধিক প্রীতি আছে, এরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তিকে অধিমাত্র অধিকারী বলা যায়। ইঁহারা কোন একটী যোগাবস্থা ছয় বৎসর সাধনার ফলে লাভ করিতে পারেন। লয়যোগে ইঁহাদের অধিকার।

৪। যাঁহাদের শরীরে প্রভূত বল আছে, দেহ-যষ্টি পুষ্ট এবং দৃঢ়, যাঁহাদের ভীরুতা নাই, যাঁহাদের বহুগুণ আছে, যাঁহাদের উৎসাহ অতি প্রবল, যাঁহারা অতি শান্ত, যাঁহারা করুণার সাগর, সর্ব্ব শাস্ত্রে যাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণ যাঁহাদের আছে, যাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমুদয় সমান, কোন প্রকার ব্যাধি যাঁহাদের শরীর আক্রমণ করিতে পারে না, যাঁহাদের চিত্ত কোনরূপ বিকৃত হয় না, যাঁহারা যুবা এবং

সুন্দর, যাঁহাদের মনে কোনরূপ মলিনতা নাই, যাঁহাদের অন্তঃকরণে কিছুতেই ভীরুতার সঞ্চার হয় না, যাঁহাদের কোন প্রকার সাধনায় বিঘ্ন হয় না, যাঁহারা কিছুতেই ব্যাকুল হন না, পূর্ব্ব জন্মে যাঁহারা বহু অভ্যাসের ফলে যোগী বা সিদ্ধ পুরুষের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ মহাসত্ত্ব-শালী ব্যক্তিগণ তিন বৎসরেই, কোন এক প্রকার যোগাবস্থা লাভ করিতে পারেন। এতাদৃশ ব্যক্তিগণ নিজেরাও উদ্ধার হন এবং সহস্র ব্যক্তিকে সংসারযাতনা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইঁহারা রাজযোগ বা সর্ব্ববিধ যোগের অধিকারী।”

দশম অধ্যায়

শিবসংহিতাদি-গ্রন্থমতে সাধনা।

সাধক প্রথমতঃ নিজ গৃহে যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য পাতঞ্জল-কথিত যম নিয়মাদির অনুষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করিবেন। যখন দেখিবেন. তাহার শরীর বা মনে কোনরূপ মল আর নাই অর্থাৎ কোনরূপ আসক্তি দ্বারা তাঁহার চিত্ত যোগপথ হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন গৃহ পরিত্যাগ করিবেন। কোন এক নির্জ্জন স্থানে আসনাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গগুলির যথাযথরূপে অভ্যাসে নিযুক্ত হইবেন। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রমাণগুলি এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। এইগুলি যথাযথ অনুধাবন করিলেই এই সম্বন্ধে সকলেরই একটা স্থির জ্ঞান জন্মিতে পারে;

"কৃতবিদ্যো জিতক্রোধো সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
গুরুশুশ্রূষণে রতঃ পিতৃমাতৃ-পরায়ণঃ।।
স্বাশ্রমাস্থঃ সদাচারো বিদ্বদ্ভিশ্চ সুশিক্ষিতঃ।।
যমাদি-গুণ-সম্পন্নঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।।
শুভদেশং ততো গত্বা ফলমূলোদকান্বিতম্।
তত্রস্থে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং কাননেঽপি বা।।
সুশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ব্বরক্ষাসমন্বিতম্।
ত্রিকালস্নান-সংযুক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।।
মন্ত্রন্যস্ততনুধীরঃ সিতভস্মধরঃ সদা
মৃদ্বাসনোপরি কুশান্ সমাতীর্য্যাঽথবাজিনম্।।
ইষ্টদেবং গুরুং নত্বা ততো আরুহ্য আসনম্।

উদন্মুখো প্রাঙ্মুখো বা জিতাসনগতঃ স্বয়ম্ ॥
সমগ্রীবঃ শিরঃকায়ঃ সংযতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।
নাসাগ্রদৃক্সমাসীনো যথোক্তং যোগমভ্যসেৎ ॥"

"প্রথমে যথাবিধি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করিতে হইবে, নতুবা বিজাতীয় বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইলে যোগসাধনায় প্রতিপদে সন্দেহ হইবে, কারণ তাহারা স্বয়ং পরলোকবিশ্বাসী নহে, সুতরাং তাহাদের কৃত গ্রন্থাদিও সেই সমস্ত দোষে পরিপূর্ণ। সেই সংস্কারগুলি মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার উচ্ছেদ সাধন দীর্ঘসময়সাপেক্ষ। তজ্জন্য সংশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ঐ সমুদয় হীনবৃত্তিগুলি, প্রথম উচ্ছেদ করিতে হইবে। তদনন্তর ক্রোধজয়ের নিমিত্ত সচেষ্ট হইবে ও কায়মনোবাক্যে সত্যপালনে ব্রতী হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পিতা, মাতা এবং বিদ্যাদাতা গুরুর সেবা দ্বারা শ্রদ্ধা, ভক্তি অর্জ্জন করা উচিত। কারণ শ্রদ্ধাহীনতা যোগসিদ্ধির অতি প্রতিকূল। স্বীয় আশ্রম এবং বর্ণধৰ্ম্মসমুদয় পালন করাও একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, তদ্দ্বারা সংযম এবং নিয়মগুলি অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা ছাড়া পিতৃপিতামহ অনুষ্ঠিত সদাচারগুলি অনুষ্ঠান করায় চিত্তের বিশুদ্ধি সত্বরই সম্পাদিত হয়। বিদ্যাদিও সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা করা উচিত; নতুবা শিক্ষার দোষে বুদ্ধি বিকৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপে যমনিয়মাদি অভ্যস্ত হইয়া সমুদয় সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। পরে ফল-মূল-জলাদিসম্পন্ন, কোন শুভ স্থানে অথবা নদীতীরে যাইয়া শুচিস্থান নির্ণয়পূর্ব্বক মনস্তৃপ্তিকর সুশোভন মঠ প্রস্তুত করিবে। তাদৃশ স্থানে ত্রিকালস্নানরত, শুচি এবং একচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি ও শুভ্রভস্মধারী হইয়া মৃদু আসন বা মৃগচর্ম্মাদি বিস্তারপূর্ব্বক, পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া গুরু এবং ইষ্টদেবকে প্রণাম করত আসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাসে রত হইবেন। তদবস্থায় শরীর, গ্রীবা এবং শিরঃ সমভাবে রাখিয়া

নিশ্চল অবস্থায় নাসিকাগ্র বা কোন অভীপ্সিত স্থানে দৃষ্টি স্থির করত সাধনা অভ্যাস করিবে।

কেহ কেহ বলেন—সাধনার নিমিত্ত এইরূপ স্থাননির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা নাই। যেখানে মনঃ প্রসন্ন হয়, সেখানেই সাধনা অভ্যাস করা যাইতে পারে। সুতরাং গৃহের অভ্যন্তরেও, কোলাহলবর্জ্জিত কোন স্থান নির্ণয়পূর্ব্বক প্রত্যহ নিয়মিতরূপে অভ্যাস করা উচিত। ঐ স্থানটীতে যাহাতে অন্য কোন প্রকার সাংসারিক কার্য্যাদির অনুষ্ঠান না করা হয়, এবং প্রত্যহ ধূপাদি দ্বারা ঐ স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধিতা রক্ষা হয়, তাহা করিতে হইবে। এইরূপ স্থানে প্রত্যহ প্রত্যূষে মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে এবং নিশীথে চারিবার অভ্যাস করিবে। এই সময় কয়টী ধ্যানাদির অতি প্রশস্ত সময়। কারণ ঐ সময়ে স্বভাবতঃ প্রাণবায়ু সুষুম্নার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সুতরাং অন্য সময় যাহা চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করা অসম্ভব, সময়ের গুণে তাহা বিনা চেষ্টাতেই সম্পন্ন হইবে। এ সম্বন্ধে ঘেরণ্ডসংহিতাকার কিছু বিশেষ বিধান দিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

"আদৌ স্থানং ততঃ কালো মিতাহারস্ততঃ পরম্।
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ প্রাণায়ামঞ্চ সাধয়েৎ ॥
দূরদেশে তথারণ্যে রাজধানৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ।
অবিশ্বাসোঃ দূরদেশে হ্যরণ্যে ভক্ষ্যবর্জ্জিতম্।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাৎ ত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকরাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টয়েৎ ॥
নাত্যুচ্চৈর্নাতিহ্রস্বঞ্চ কুটীরং কীটবর্জ্জিতম্।
সম্যগ্ গোময়লিপ্তঞ্চ কুড্যরন্ধ্রবিবর্জ্জিতম্।

এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ।
হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ।।"

স্থান, কাল এবং আহারের পরিমাণ, ও আহার্য্য বস্তুর সাত্ত্বিকতা প্রথমে স্থির করিতে হইবে। উপযুক্ত স্থান নির্ণীত না হইলে চিত্ত নানা প্রকারে বিক্ষুব্ধ হইতে পারে। যাঁহারা চিত্ত স্থির করিবার নিমিত্ত সামান্য চেষ্টাও করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে চিত্তস্থির কি ভয়ানক ব্যাপার। যে সমস্ত বিষয়, কখনও চিন্তা করা যায় নাই, এমন কি যাহা স্বপ্নেরও অগোচর, চিত্ত স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাও সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া চিত্ত বিচলিত করিয়া ফেলে। এমত অবস্থায় যে স্থানে কোনরূপ উদ্বেগকর বস্তুর সান্নিধ্যের সম্ভাবনা আছে, এরূপ স্থান সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। তার পর আরম্ভাবস্থায় কালনির্ণয়ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম, ও বর্ষা ঋতুতে যোগারম্ভ নিষিদ্ধ। এই কয়েকটী সময় শারীরিক বিপত্তি অতি সত্বর উপস্থিত হইতে পারে। শরীর ও মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, সুতরাং শরীর বিকৃত হইলে সাধনা করা দূরে থাক, বরং যোগ একটী বিভীষিকার বস্তু হইয়া পড়িবে। বায়ু, পিত্ত ও কফ ধাতুত্রয়ের সাম্যাবস্থায় শরীর রোগশূন্য থাকে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কথিত হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোত্তাপে শরীরে অবসাদ, এবং পিত্তাদির বৃদ্ধি হইলে তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ জলপানের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত জলের ক্ষয়ও তাহার অন্যতম কারণ। সুতরাং সেই সময় ঐ অবস্থায় বায়ুধারণার দ্বারা আরও রস ক্ষয় হইয়া হঠাৎ কোনও রোগ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ অতিশয় বেশী হয়, সে সময় বায়ুধারণা দ্বারা কোষ্ঠস্থ বায়ু কুপিত হইয়া বাতাজীর্ণাদি রোগ হইতে পারে, সুতরাং ঐ সময় নিষিদ্ধ।

বর্ষান্তে, শরৎকালে বায়ু এবং জলাশয়গুলি নির্ম্মল হয় এবং বর্ষায় উৎপন্ন ক্বমি, কীটাদি দূরীভূত হয়, প্রক্বতি এক মহতী শোভায় শোভান্বিত হয়, সুতরাং মনের প্রফুল্লতাহেতু শরীরও জড়তাশূন্য হয়, তজ্জন্য সেই সময় যোগারম্ভের প্রক্বষ্ট সময়। শীতকালে বায়ুর অতিশয় কুপিতাবস্থায় এবং ঘর্ম্মাদি নিঃসৃত না হওয়াতে শারীরিক স্রোতঃগুলি নিরুদ্ধ থাকায়, শরীরেই দূষিত বস্তু থাকিয়া যায়, সুতরাং ঐ সময় প্রাণায়ামাদি দ্বারা দূষিত বস্তু প্রকুপিত হইয়া নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাই যোগীরা ঐ সময় প্রথম অভ্যাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিছুদিন অভ্যস্ত হইলেই শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাতে অপকার হইবার কোন ভয় থাকে না।

গুরু হইতে দূরদেশে বাস হইলেও সাধকজীবন নিরাপদ্ নহে। কারণ তাহাতে অশ্রদ্ধা হওয়া সম্ভব। তাহা ছাড়া সাধনার প্রতিপদেই নানাপ্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া চিত্ত বিকল করিয়া ফেলে, সেই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলেই, শ্রদ্ধাহীনতা জন্য নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য উৎসাহভঙ্গ হইয়া মূলেই নষ্ট হইয়া যায়। অরণ্যে বাসও উপযোগী নহে, কারণ যোগিজনোচিত ভক্ষ্যাদি তথায় প্রাপ্ত হইবার কোন প্রকার সুযোগ নাই এবং যে কোন আহারের দ্বারা প্রাণ ধারণ করিয়া যোগাভ্যাস অসম্ভব, তাহার ফলে নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইতে পারে। লোকালয়ে অভ্যাস করিলে অব্যাহতি নাই। চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা প্রকার নিন্দায় সর্ব্বদা কর্ণকুহর বধির হইয়া যায়। সাধারণ প্রাণীর নিকট যোগাভ্যাসী একটী অপরূপ দর্শনীয় সামগ্রী হইয়া পড়েন। সেই সমুদয় নিন্দা, প্রশংসা সহ্য করিবার সামর্থ্য না থাকায় সাধককে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং বৃথা পরিশ্রমই সার হয়। এই সমস্ত উৎপাত নিবৃত্তির নিমিত্ত ধার্ম্মিক রাজার রাজত্বে উপদ্রবরহিত ও সহজে ভিক্ষা করা

যায়, এইরূপ স্থানে কাঁটাদিশূন্য অধিক উচ্চ বা নীচ নহে এইরূপ একটী মনোরম কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিয়মিত অভ্যাস করিলে সিদ্ধাবস্থা লাভ হইবে। কিন্তু আমরা যে সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে যে কোথাও সুভিক্ষ স্থান আছে এবং নিরুপদ্রবে সাধনা করা যাইতে পারে ও রাজার অনুকূলতা পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। তজ্জন্য চেষ্টা থাকিলেও, কদাচিৎ কেহ সিদ্ধ হইতে পারে। কলিযুগে ধর্ম্মের এই প্রকার দুর্দ্দশা। চোর ঘরে ঢুকিয়া ধর্ম্মের ভাণ্ডার লুটিয়া লইবে, ইহা সহ্য করা অপেক্ষা যত দূর সাধ্য বাধা দেওয়া এবং নিজে ধর্ম্মকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া যতটুকু সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করা যাইবে, তাহার ফল অক্ষয় এই ভরসায় সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। স্থান ও কাল স্থির করত আহারের নিয়মাদিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। অনেকেই বলেন—আহারের সহিত সাধনার কোনরূপ সম্বন্ধই নাই। যাহার যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, তাহাই তাহার গ্রহণীয়, সুতরাং নির্ব্বিচারে যথেচ্ছ-ভোজন করিলে কোন প্রকার ক্ষতিরই কারণ নাই। ইহকালবাদী, আত্মোদরভরণে তুষ্ট, পরসুখসহনে অক্ষম ব্যক্তিদের এতাদৃশ উক্তি অসমীচীন নহে। যাহাদের ভোগের জন্য ভগবান্ জগৎটা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা এ কথা বলিতে সাহস পায়, কিন্তু আমাদের সে সাহস নাই। কারণ আমরা জানি এ জগৎটা শুধু মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বা ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই। সকল প্রাণীরই ভোগের নিমিত্ত ও কর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত, এ জগৎটা নানারূপে প্রকাশ পাইয়া পুনরায় স্বকারণে লয় হইয়া যাইতেছে। সুতরাং স্বস্বকর্ম্মক্ষয়হেতু সকলেই অধিকার অনুযায়ী ইহাতে দাবী করিতে পারে। এই অধিকার নির্ণয়পূর্ব্বক আহার-ব্যবহারাদি, একমাত্র মনুষ্য-জাতিতেই সম্ভব। অন্যান্য সমুদয় প্রাণী স্বদেহানুকূল প্রকৃতির প্রেরণাতে আহারাদি সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সুতরাং তাহারা পরস্পরের খাদ্য

হইলেও, আমরা মানুষ হইয়া ঐ নীতি অনুসরণ না করি, ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রেত। কারণ ভালমন্দ বিচার করিয়া মন্দ বস্তু ত্যাগ করত, উত্তম বস্তুর গ্রহণসামর্থ্য আমাদিগের আছে। তথাপি আমরা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত প্রবল অভ্যাসের ফলে অন্যরূপ কাজ করিতে বাধ্য হই। পিতামাতার শুক্রশোণিতে উৎপন্ন দেহ খাদ্য দ্রব্যের সংযোগেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাঁহারা যেরূপ মনোবৃত্তি ও আহারবিহারাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া, পুত্রোৎপাদন করেন, তাদৃশ শরীর ও মনোবৃত্তি অনেকটা আমরা প্রাপ্ত হই। যদিও সময় সময় ইহার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ঐ সব অসাধারণ নিয়মের কারণ আছে। কিন্তু সাধারণ নিয়মানুসরণই বিচার-সঙ্গত। তজ্জন্য আমরা বলিতে বাধ্য, যে অনুকূল আহার-ব্যবহার সত্ত্বগুণী দেহ ও মনের কারণ। আহার্য্য বস্তু হইতে রস, রক্ত, মাংস, মজ্জা, অস্থি, শুক্র ও সর্ব্বশেষে ওজোধাতুতে পরিণত হয়, এই আহার্য্যে সূক্ষ্মাংশ দ্বারা মনের পুষ্টি সাধিত হয়। ইহাই শাস্ত্রকারের উক্তি। তাঁহারা বলেন—যদি মনঃ পঞ্চভূতের উপাদান হইতে কোন অতিরিক্ত বস্তু হইত, তাহা হইলে নিরাহারে মানসিক দুর্ব্বলতা আসিত না। চিন্তাশক্তি নষ্ট হইত না, এবং বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত না। আজকাল যেরূপ সমুদয় খাদ্য দ্রব্য স্থূলরূপে বিশ্লেষণ দ্বারা কতটুকু হাইড্রোজেন, জল, শর্করা প্রভৃতি দেহের উপযোগী পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা হয়, পূর্ব্বে তদ্রূপ মানসিক বিশ্লেষণ দ্বারা বস্তুতে কতটা সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃগুণের বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি, জাতিভেদে, আহারভেদ উল্লিখিত হইত। যাহার যে প্রকার কাজ, তাহার সহায়তার নিমিত্ত তদ্‌গুণের সহায়তাকারী খাদ্য দ্রব্যের কল্পনা করাই সঙ্গত। যদি কেহ যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত স্থির করত পরমাত্মার ধ্যানে মানানিবেশ করিতে চান, তাঁহাকে যোগশাস্ত্রানুযায়ী সাধনার অবস্থাবিশেষে যেরূপ খাদ্য প্রয়োজন,

তদ্রূপই ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা যোগের ফলে রোগ ভিন্ন আর কিছু পাইবার আশা নাই। এ সমস্ত কারণ দেখিয়াও কলিচরেরা ভোগের অসুবিধা মনে করিয়া কলিযুগে যোগ নাই—ইত্যাদি বলে ও তাহাদের স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রসূত নিত্য নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া চর দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছে। কারণ তাহারা জানে যে, যদি বৈদিক ধর্ম্মের কোনরূপ অভ্যুত্থান হয়, তাহা হইলে তাহাদের রাজ্য সত্বরই ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং যাহাতে মানব সাধারণ, আহার, বিহারাদিতে সংযত হইয়া, যোগাভ্যাসে ব্রতী না হয়, তাহার জন্য বক্তৃতা পত্রিকা ও অবতার দ্বারা সকলের উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছে। যদি এইরূপ না করে, তাহা হইলে অতি সহজে, ব্রহ্মদর্শন, দেবতাদর্শন, সূক্ষ্ম শরীরে গমনাগমনপ্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যাদি যোগীদের নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সুতরাং তাহাদের অস্তিত্বসম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িতে হইবে। তাই যাহাতে বিচারের মাপকাটী কেহ গ্রহণ না করে, তজ্জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা ঐ সব মতবাদ অসার বলিয়া জানি, সুতরাং যোগশাস্ত্র-সম্মত আহার্য্য বস্তু এবং পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতেছি। যদি কাহারও সত্যানুসন্ধিৎসাবৃত্তি থাকে, তিনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। যথা ঘেরণ্ডসংহিতা—

"মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।
নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিৎ যোগো ন সিধ্যতি॥"

যে পরিমাণ আহার করিলে, শরীর ও মনঃ গ্লানিযুক্ত না হয় এবং কোনরূপ অবসাদ না আসে, তাহারই নাম মিতাহার। এইরূপ আহার সত্ত্বগুণবর্দ্ধক, পবিত্র ও হিংসাদি দোষে দুষ্ট হয় না। অর্থাৎ অন্যের প্রাণঘাতপূর্ব্বক উৎপন্ন না হয়, কারণ শুক্রশোণিতে উৎপন্ন দেহ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। শারীরিক পুষ্টি হইলেও উহা অবিধেয়, কারণ উহা

সাত্ত্বিকপ্রকৃতির বিরোধী। মিতাহার না করিয়া যোগাভ্যাসে ব্রতী হইলে সিদ্ধি হওয়া দূরে যাক্, নানাপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি দ্বারা, শরীর চিরতরে নষ্ট হইবে। যোগের আরম্ভ অবস্থায় ও নিষ্পত্তি অবস্থায় আহারের কিছু ভিন্নতা আছে; তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। শিব ও ঘেরণ্ড-সংহিতার মত; যথা—

"শাল্যন্নং যবপিণ্ডং বা গোধূম-পিণ্ডকং তথা।
মুদ্গমাষঃ কালকাদি শুভ্রঞ্চ তুষবর্জ্জিতম্॥
পটোলং পনসঞ্চৈব কক্কোলঞ্চ সুকাশকম্।
দ্রাঢ়িকা কর্কটী রম্ভা ডুম্বুরঞ্চ সুকণ্টকম্॥
আমরম্ভা বালরম্ভা রম্ভাদণ্ডঞ্চ মূলকম।
প্রায়োমূলং তথা ঝিঙ্গী যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥
কালশাকং বালশাকং তথা পটোলপত্রকম্।
পঞ্চশাকং প্রশংসীয়াং বাস্তুকং হিলমোচিকা।
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং গুড়ং শর্ক্রাদি চৈক্ষবম্॥
পক্করম্ভা নারিকেরং দাড়িম্বং বিষমায়সম্।
দ্রাক্ষা তু লবনী ধাত্রী কটুকাম্লবিবর্জ্জিতম্।
এলাং জাতিং লবঙ্গঞ্চ পৌরুষং জম্বু জাম্বকম্॥
হরীতকীং খর্জ্জুরঞ্চ যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥
ক্ষীরং ঘৃতঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতম্
কর্পূরং বিষ্টুরং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মবস্তকম্॥
লঘুপাকং প্রিয়স্নিগ্ধং যথা বা ধাতুপোষণম্।
মনোভিলষিতং যোগী দিব্যং ভোজনমাচরেৎ॥"

"শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের-যূস, শুভ্র ও তুষরহিত শস্যাদি, পটোল, কাঁটাল, কক্কোল, কাকুড়, ফুট, কাকরী, রম্ভা, কলার ফুল (মোচা),

ডুমুর, থোড়, মূলক, আলু, ঝিঙে, কচিশাক বা ক্ষুদ্রশাক, কালশাক, পলতা, বেতো, হিঞ্চে ; নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, গুড়, কিস্‌মিস্, আঙ্গুর, মনকা, লোনা, আমলকী, অম্লবর্জ্জিত অন্যান্য ফল, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ, জাম, খুদেজাম, হরীতকী, খর্জ্জুর, ক্ষীর, মিষ্টান্ন, চূণবর্জ্জিত পান, কর্পূর জামরুল, কানক, মুষ্টক, বিষনাশক, বিষ্টুর, গিষ্ট, লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ ও ধাতুপোষক এই সমুদয় দ্রব্য যোগীদিগের আহার্য্য।" এই সমুদয় বস্তু পরিমিতরূপে আহার করিয়া যোগাভ্যাসে ব্রতী হইবে। ক্ষুধানুযায়ী উদরের অর্দ্ধভাগ অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা পূর্ণ করিবে, এক ভাগ জল, দুগ্ধাদি তরলদ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিবে, এবং অবশিষ্ট অন্যভাগ, বায়ুসঞ্চারের জন্য খালি রাখিবে ; ইহারই নাম মিতাহার, মাংসাদি ভোজন করিলে তাহা মেধ্য হয় না। তজ্জন্য তাহা নিষিদ্ধ—

"মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং সাত্ত্বিকং লঘু।"

অর্থাৎ 'হবিষ্যান্নগ্রহণই মেধ্য আহার বলিয়া কথিত। এক্ষণে যোগাভ্যাসকালে যাহা যাহা বর্জ্জনীয়, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

"অথ বর্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরংপরম্।
অম্লং রূক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সর্ষপং কটু॥
বাহুল্যভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকম্।
স্তেয়ং হিংসা পরদ্বেষাঞ্চাহঙ্কারমনার্জবম্॥
উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিপীড়নম্॥
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
অতীব-ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্॥
কট্বম্লং লবণং তিক্তং ভ্রষ্টঞ্চ দধি-তক্রকম্।
শাকোৎকটং তথা মদ্যং তালঞ্চ পনসস্তথা॥
কুলোত্থং মসূরং পাণ্ডুং কুষ্মাণ্ডং শাকদণ্ডকম্।
তুম্বীং কোলং কপিত্থঞ্চ কণ্টবিল্বং পলাশকম্॥

বিল্বং কদম্বজম্বীরং লকুচং লশুনং বিষম্।
কামরঙ্গং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গুং বা গনিকেতনম্॥
যোগারম্ভে বর্জ্জয়েচ্চ পরস্ত্রীবহ্নিসেবনম্।
কাঠিন্যং দুরিতঞ্চৈব স্থূষ্কং পর্য্যুষিতং তথা॥
অতিশীতঞ্চাতিচোগ্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ।
প্রাতঃস্নানোপবাসাদি কায়ক্লেশবিধিংতথা।
একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেহপি ন কারয়েৎ॥" ঘেরণ্ডসংহিতা।

যোগীদের বর্জ্জনীয় বিষয় লিখিত হইতেছে। অম্ল, রূক্ষ—তীক্ষ্ণ (সর্ষপাদি) লবণ ও কটু দ্রব্য ত্যাগ করিবেন। অধিক পরিমাণে ভ্রমণ, বহু বাক্যব্যয়, প্রাতঃকালে স্নান, তৈল ও বিদাহী দ্রব্যের ব্যবহার, হিংসা, দ্বেষ, কৌটিল্য, উপবাস, মিথ্যাচার ও মিথ্যা ব্যবহার, মুগ্ধতা, প্রাণিপীড়ন, স্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবা, বহুলোকের সহিত আলাপ বা আসক্তি, অপ্রিয়াচরণ, অতিরিক্ত ভোজন—এই সমুদয় যোগী জন অবশ্যই ত্যাগ করিবেন। ভৃষ্ট দ্রব্য (ভাজা জিনিষ), দধি, তক্র, কঠোর দ্রব্য, অধিক পরিমাণে শাক, মন্থ, তাল, কাঁচা কাঁঠাল, কুলত্থকলাই, মসূর, পলাণ্ডু, কুমড়া, শাকের ডাঁটা, লাউ, কুল, কৎবেল, বেল, কদম্ব, জম্বীর, ডেয়ো, লশুন, পদ্মবীজ, কামরাঙ্গা, পিয়াল, হিঙ্গু, পরস্ত্রীসংসর্গ, কর্কশব্যবহার, পাপ-কার্য্য, অতি উষ্ণ, অতি শীতল, পর্য্যুষিত দ্রব্য, এ সমস্তই বর্জ্জনীয়। যোগাভ্যাসকালে, একাহার, অল্পাহার, উপবাস বা অবৈধ কায়ক্লেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু সমাধির অভ্যাসকালে উপবাসাদি করণীয়।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে বলিতেছেন। যথা:—
যুধিষ্ঠির উবাচ—

"আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত!
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥" (মোক্ষধর্ম্ম, শান্তিপর্ব্ব)।

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরূপ আহার করিয়া এবং কি কি জয় করিয়া যোগী বল প্রাপ্ত হইবেন, তাহা আপনি বলুন।

ভীষ্ম উবাচ :—"কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত!
স্নেহানাং বর্জ্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥"

"যোগিগণ শালি বা গোধূমচূর্ণ ভক্ষণ, তিলকল্ক ভক্ষণ ও তৈলপ্রভৃতি স্নেহ দ্রব্যের বর্জ্জন করিয়া যোগবল লাভ করেন।

"ভুঞ্জানো যাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম!
একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
পক্ষান্ মাসান্ ঋতূংশ্চৈব সংবৎসরানহস্তথা
অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রং যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
অখণ্ডমপি বা মাসং সততং মনুজেশ্বর!
উপোষ্য বা সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণং বর্ষমেব চ।
ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষং বিষয়াংস্তথা॥
অরতিং দুর্জ্জয়াঞ্চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব!
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রাং দুর্জ্জয়াং নৃপসত্তম!
দীপয়ন্তি মহাত্মনঃ সূক্ষ্মমাত্মনমাত্মনা॥" (মোক্ষধর্ম্ম। শান্তিপর্ব্ব)

অর্থাৎ "ঘৃততৈলাদিবিহীন যবপিণ্ড, একবার আহার করত, দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলে, যোগবল লাভ করা যায়। পক্ষ, মাস, ঋতু বা সংবৎসরকাল, জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া, যোগী বল প্রাপ্ত হন। অথবা মাসাবধি কাল নিরাহারে থাকিয়া সমাধির উপযুক্ত বল লাভ করেন তাঁহারা কাম, ক্রোধ, শীত, উষ্ণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ, রস, ঘোর বিষয়তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রাপ্রভৃতি দুর্জ্জয় রিপুগণ শান্ত করিয়া

যোগপ্রাপ্ত হন এবং নিজ আত্মাকে নিজেই দর্শন করেন।" এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সমাধির কঠিনতা অনুভব করা যায়। সুতরাং চব্য, চোষ্যাদি ভোজন করত, যাঁহারা সমাধির ভান করেন, তাঁহাদের হৃষ্টপুষ্ট শরীর দেখিলেই উহার সত্যতা সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায়।

"অত্যাহারো প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ
জনসঙ্গঞ্চ লৌলঞ্চ ষড়ভির্যোগো বিনশ্যতি ।। ১৫ ।"

(হঠপ্রদীপিকা)

"অধিক আহার, শ্রমজনক কর্ম্ম, অনেক কথা বলা, প্রাতঃস্নানাদি নিয়ম অবলম্বন, অধিক মনুষ্যের সহিত আলাপ ব্যবহার, চঞ্চলতা এই ছয়টী দ্বারা যোগ নষ্ট হয়।"

যাঁহারা যোগশাস্ত্রের এই সমুদয় উপদেশ না মানিয়া যোগ শিক্ষা করেন বা শিক্ষা দেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাচরণ করেন বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

অনেকে রাজযোগের অভিনয় করিয়া নিজেদিগের স্থুল শরীরকে সাধনা-লব্ধ বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ প্রলাপ বলিয়া যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

এই বিষয়ে যোগশাস্ত্রে কথিত আছে। যথা—হঠযোগপ্রদীপিকা—

"বপুঃকৃশত্বং বদনে প্রসন্নতা
নাদস্ফুটত্বং নয়নে সুনির্ম্মলে
আরোগ্যতা বিন্দুজয়োঽগ্নিদীপনং
নাড়ীবিশুদ্ধি র্হঠযোগলক্ষণম্ ।।"

"হঠযোগ দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি করিলে, শরীর কৃশ, মুখ প্রসন্ন, বাক্য পরিস্ফুট, চক্ষুঃ নির্ম্মল, শরীর নীরোগ হয়, বীর্য্যস্তম্ভ ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যোগের নিয়মগুলি যথাযথ পালন না করিয়া যোগাভ্যাসে ব্রতী

হইলে নানাপ্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে হইবে, তাহা শাস্ত্রানুযায়ী দেখান যাইতেছে।

"প্রাণায়ামনিযুক্তেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ।
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বরোগসমুদ্ভবঃ॥
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃ কর্ণাক্ষিবেদনা।
ভবন্তি বিবিধাঃ দোষাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥"

"প্রাণায়াম দ্বারা সমুদয় রোগ নষ্ট হয়, প্রাণায়ামের ব্যতিক্রম হইলে নানা রোগ উপস্থিত হয়। যোগাঙ্গগুলি যথাযথ নিয়ম ভিন্ন অভ্যাস করিলে, হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া চক্ষুঃ ও কর্ণে বেদনা, প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।" এই জন্যই যোগের ফলে রোগ উৎপন্ন হয় এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই নানাপ্রকার ক্ষমতা লাভ হইবে, এই আশায় পুস্তকসাহায্যে, অনিয়মিতরূপে সাধনাদি অভ্যাস করিয়া, মরণপথের যাত্রী হন। তাহার নিমিত্ত যোগাভ্যাস দোষের নহে। সর্ব্ব বিষয়েই নিয়মানুযায়ী না চলিলে নানাপ্রকারে পীড়িত হইতে হয়, সুতরাং বৃথা যোগের দোষ উদ্ঘাটন না করাই শ্রেয়ঃ।

যোগ-শব্দের দ্বারা কত কি বুঝা যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সাধারণতঃ যোগ বলিলে লোকে বুঝে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তিকে হৃদয়স্থিত জীবাত্মার সহিত মিলিত করত সহস্রারে পরমশিব বা পরমাত্মার সহিত মিলন। এখন ঐ ঐক্যসাধন ব্যাপার দ্বারা কি বুঝা যায়, তাহা কি কেহ চিন্তার অবসর পান? জীবাত্মা ও পরমাত্মা যদি জল ও তৈলের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন বস্তু হন, তবে তাঁহাদের সংযোগ কোন কালেই সম্ভবপর হয় না; যদি সংযোগ করাও যায়, তাহা হইলে পরস্পর মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং মিশ্রণে অন্য একটী নূতন পদার্থের উদ্ভব হইবে। সুতরাং তাঁহারা একজাতীয় বা এক বলিলে

তবেই মিলন সম্ভব। যদি দুই ধরা যায়, তাহা হইলে সংযুক্ত হইলেই বিয়োগের সম্ভাবনা রহিয়াছে মানিতে হয়। তজ্জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন কখনই সম্ভব হইবে না। সুতরাং তাঁহাদিগকে এক বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। বেদবাক্যে ইহার যথার্থতা নির্ণীত হয়। তাঁহারা বলেন চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা এক হইলেও, অজ্ঞানাচ্ছাদিত হইয়া জগতে বহু জীবাত্মার ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। কোন উপায়ে সেই অন্ধকাররূপ অজ্ঞানাবরণ, দূর করিতে পারিলেই ইহার রহস্য ভেদ হইয়া যায়। জীবাত্মা বলিয়া যাঁহাকে এতদিন জানা গিয়াছিল, তিনি সাধকের নিকট পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হন। মানুষ ঐ অজ্ঞানে গাঢ়ভাবে ডুবিয়া আছে, তাই উহা ভেদ করিতে পারে না। দুই প্রকারে উহা ভেদ করা যায়। একটী বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মের নানাপ্রকার কৌশল, অন্যটী বিচারজনিত সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান। এই উভয়ের কোন একটী স্বীয় অধিকার অনুযায়ী অনুসরণ করিতে পারিলেই ঐ অন্ধকার দূর করিতে পারা যায়—তাহা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত করিয়াছি। কর্ম্ম দ্বারা যোগ অর্থাৎ ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জানা বা বিচারপ্রণালী দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জ্ঞাত হওয়া। এ জন্যই যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে "যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যোগঃ প্রবর্ত্ততে।" "যোগ হইতে জ্ঞান জন্মে আবার জ্ঞান অনুষ্ঠান করিতে করিতে আত্ম-প্রকাশ হইয়া পড়ে।" পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনবল অনুযায়ী কেহ বা উহার একটীর আশ্রয় করত আত্মাকে জানিতে পারেন। কেহ বা উভয়েরই আশ্রয়-গ্রহণ করত সেই অবস্থা লাভ করিতে পারেন। অন্য বাঁকী সকলেই ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে নিগমগ্ন হইয়া যায়।

এই যোগ শব্দ দ্বারা, বর্ত্তমানকালে কতকগুলি প্রণালীবিশেষকে বুঝায়, যদ্দ্বারা ঐ অবস্থা লাভ করার সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সব প্রণালী অনুষ্ঠান দ্বারা যদি জীবকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞাত হওয়া

যায়, তবেই যোগ বলা যাইতে পারে ; এই জন্যই পূর্ব্বকালে উহাকে যোগাঙ্গ বলা হইত। ঐ যোগাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিতে করিতে, যদি এতাদৃশ জ্ঞান লাভ হয় তখনই যোগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। শিবসংহিতায় পঞ্চম পটলে এই কর্ম্মযোগকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

"মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ দ্বিধাভাববিবর্জ্জিতঃ ॥"

"প্রথম মন্ত্রযোগ, দ্বিতীয় হঠ-যোগ, তৃতীয় লয়-যোগ ও চতুর্থ রাজযোগ।" এই রাজ-যোগের ফলেই দ্বৈতভাব অতিক্রম করা যায়।" সুতরাং এই শ্লোকটীর অর্থ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র, হঠ বা লয় যোগের দ্বারা দ্বৈতভাবের বিনাশ নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা যোগ কি প্রকারে বলা যায়? রাজ-যোগই প্রকৃত যোগ। অন্যগুলি ঐ যোগে লইয়া যাইবার উপায়। তাই শাস্ত্র বলেন—

"সর্ব্বে হঠলয়োপায়াঃ রাজ-যোগস্য সিদ্ধয়ে।
রাজযোগসমারূঢ়ো পুরুষঃ কালবঞ্চকঃ ॥"

"সমস্ত হঠযোগোক্ত উপায় বা লয়যোগের উপায় লয় অর্থাৎ মনোলয়কে আশ্রয় করিয়া রাজযোগে পৌঁছাইয়া দেয়, যদ্দারা পুরুষ মৃত্যু অতিক্রম করেন অর্থাৎ নিজকে অজর, অমর বলিয়া জ্ঞাত হন।" অতঃপর মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের প্রকৃত অর্থাদি অবধারণ করা যাউক।

মন্ত্রযোগ ঃ—দুই বস্তুর পরস্পর মিলনের নাম যোগ বা সন্ধি। যেমন দিবা ও রাত্রির মিলনের নাম সায়ং-সন্ধ্যা, এবং রাত্রিদিনের মিলনের নাম প্রাতঃ-সন্ধ্যা। তেমনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনের নাম সন্ধ্যা বা যোগ। এই যোগ মন্ত্রের সহায়তায় হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার নাম মন্ত্রযোগ। দ্বিজাতির সন্ধ্যাবন্দনা এই উদ্দেশ্যের জন্যই সাধিত হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা জীব ও পরমাত্মার ঐক্য সাধিত হইলে, তাহাকেও

রাজযোগ বলা যাইতে পারে। অন্যথা উহা কর্ম্মভোগ ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে ঐ কর্ম্মভোগের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইয়া যোগের উপযুক্ত অন্তঃকরণ, লাভ করা যাইতে পারে।

হঠযোগ :—

"দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদিসুসাধিতঃ।
অন্যো মৃকণ্ডুপুত্রাদ্যৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ।"

"হঠযোগ দুই প্রকার,—গোরক্ষমতানুযায়ী এবং মার্কণ্ডেয় মতানুযায়ী।" গোরক্ষমতে উহার অঙ্গ ৮টী এবং মার্কণ্ডমতে ছয়টী। মার্কণ্ডেয় মত যথা—

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্॥"

"আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টী অঙ্গ।" হঠশব্দ দ্বারা জবরদস্তি বা দৈহিক বল বুঝা যায়। সুতরাং শরীরের সামর্থ্য দ্বারা, যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায় তাহারই নাম হঠযোগ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক শারীরিক বল সাধন দ্বারা যোগ সাধিত হয় না। মলসংযুক্ত দেহের শুদ্ধির নিমিত্তই, ঐ সমুদয় কথিত হইয়াছে। আসন, মুদ্রা, নেতি, ধৌতি, বস্তি, ত্রাটক, লৌলি ও কপাল-ভাতি এই ষট্কর্ম্ম দ্বারা শরীরশুদ্ধি সম্পাদন করা যায়। আসন বলিতে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন-প্রভৃতি বহু প্রকার আসন ও মুদ্রা বলিতে মহাবন্ধ, মহামুদ্রাপ্রভৃতি দশবিধ মুদ্রা বুঝা যায়। এই সমুদয় প্রায় সর্ব্বত্রই লিখিত আছে এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ কুফল হয়। সুতরাং তাহার আলোচনা করা গেল না। মোটের উপর সম্প্রদায়বিশেষে নানাপ্রকার ক্রিয়া, মনোলয়ের জন্য ও দেহমলের দূরীকরণের উপায়রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

লয়যোগ—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নদ্যৈস্তু সাধিতো লয়সংজ্ঞিতঃ।
নবস্বেব চ চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ॥

বেদব্যাসপ্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা এই লয়যোগের প্রবর্ত্তক। এই যোগে নবচক্রে চিত্তলয় করিয়া রাজযোগের অধিকারী হওয়া যায়। এই লয়যোগের উদ্দেশ্য শক্তিদ্বয়ের পরিচালনপূর্ব্বক মধ্যশক্তিনামক শক্তি-বিশেষকে উদ্বোধিত করা। তাঁহারা বলেন—মানবশরীরে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যশক্তি নামে তিনটী শক্তি আছে। ঊর্দ্ধশক্তি নিপাতন দ্বারা এবং অধোশক্তির উদ্বোধন দ্বারা মধ্যশক্তির উদ্বোধন করিতে পারিলে, সাত্ত্বিক আনন্দের প্রাচুর্য্য হয়। যোগীরা সেই আনন্দ আশ্রয় করিয়া চিত্ত সমাহিত করেন। যথা—

"প্রথমং ব্রহ্মচক্রং স্যাৎ ত্রিরাবর্ত্তং ভগাকৃতি।
অপানে মূলকন্দাখ্যং কামরূপঞ্চ তজ্জগুঃ।
তদেব বহ্নিকুণ্ডে স্যাৎ তত্র কুণ্ডলিনী মতা।
তাং জীবরূপিণীং ধ্যায়েজ্জ্যোতিষ্কং মুক্তিহেতবে॥
স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়ং স্যাৎ চক্রং তন্মধ্যগং বিদুঃ।
পশ্চিমাভিমুখং তত্র প্রবালাঙ্কুরসন্নিভম্॥
তত্রোড্ডীয়ানপীঠে তু তদ্ ধ্যাত্বা কর্ষয়েজ্জগৎ
তৃতীয়ং নাভিচক্রং স্যাত্তন্মধ্যে ভুজগী স্থিতা॥
পঞ্চাবর্ত্তা মধ্যশক্তিশ্চিদ্রূপা বিদ্যুতাকৃতিঃ।
তাং ধ্যাত্বা সর্ব্বসিদ্ধীনাং ভাজনং জায়তে বুধঃ॥
চতুর্থং হৃদয়ে চক্রং বিজ্ঞেয়ং তদধোমুখম্।
জ্যোতীরূপঞ্চ তন্মধ্যে হংসং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ।
তং ধ্যায়তো জগৎ সর্ব্বং বশ্যং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥
পঞ্চমং কালচক্রং স্যাত্তত্র বামে ইড়া ভবেৎ।

দক্ষিণে পিঙ্গলা জ্ঞেয়া সুষুম্না মধ্যতঃ স্থিতা ॥
তত্র ধ্যাত্বা শুচি জ্যোতিঃ সিদ্ধীনাং ভাজনং ভবেৎ।
ষষ্ঠঞ্চ তালুকাচক্রং ঘণ্টিকাস্থানমুচ্যতে।
দশমদ্বারমার্গস্তু··· ·········জগুঃ ॥
তত্র শূন্যে লয়ং কৃত্বা মুক্তো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥
ভূচক্রং সপ্তমং বিদ্যাৎ বিন্দুস্থানঞ্চ তদ্বিদুঃ ॥
ভ্রুবোর্মধ্যে বর্ত্তুলঞ্চ ধ্যাত্বা জ্যোতিঃ প্রমুচ্যতে।
অষ্টমে ব্রহ্মরন্ধ্রং স্যাৎ পরং নির্ব্বাণসূচকম্ ॥
তং ধ্যাত্বা সূচিকাগ্রাভং ধূমাকারং বিমুচ্যতে।
তচ্চ জালন্ধরং জ্ঞেয়ং মোক্ষদং লীনচেতসাম্ ॥
নবমং ব্রহ্মচক্রং স্যাদ্দলৈঃ ষোড়শভির্যুতম্।
সচ্চিদ্রূপা চ তন্মধ্যে শক্তিরূর্দ্ধা স্থিতা পরা ॥
তত্র পূর্ণং মেরুপৃষ্ঠে শক্তিং ধ্যাত্বা বিমুচ্যতে।
এতেষাং নবচক্রাণামেকৈকাং ধ্যায়তো মুনেঃ ॥
সিদ্ধয়ো মুক্তিসহিতাঃ করস্থাঃ স্যুর্দিনে দিনে।
কোদণ্ডদ্বয়মধ্যস্থং পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষা।
কদম্বগোলকাকারং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥
ঊর্দ্ধশক্তিনিপাতেন হ্যধঃশক্তে র্নিকুঞ্চনাৎ।
মধ্যশক্তিপ্রবোধেন জায়তে পরমং সুখম্ ॥"

"প্রথম চক্রের নাম ব্রহ্মচক্র—ইহা যোনিমণ্ডলের ন্যায় এবং তিনটী বৃত্তের ন্যায়—ইহারই নাম মূলাধার, তথায় কামকলা বর্ত্তমান আছে। এখানে অগ্নিকুণ্ড বর্ত্তমান এবং কুণ্ডলিনীশক্তিও তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহাকে জীবরূপী এবং জ্যোতিঃস্বরূপ চিন্তা করিবে। এই প্রকার ধ্যান মুক্তির সহায়তাকারী। তাহার মধ্যস্থলে স্বাধিষ্ঠাননামক দ্বিতীয় চক্র।

উহা পশ্চিমাভিমুখী এবং প্রবলাঙ্কুরনিভ, সেই উড্ডীয়ানপীঠে ধ্যান করিলে জগৎ আকর্ষণ করার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। তৃতীয় চক্রের নাম নাভিচক্র। তন্মধ্যে বিদ্যুতাকৃতি, চৈতন্যরূপিণী পঞ্চাবৃত্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলিনী বিরাজমানা। এইরূপ ধ্যান করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। চতুর্থ চক্র, হৃদয়মধ্যে অধোমুখে অবস্থিত। তাহার অভ্যন্তরে জ্যোতীরূপ হংস ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান দ্বারা সমুদয় জগৎ বশীভূত হয়। পঞ্চম চক্রের নাম কালচক্র, ইহার বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত, মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। সেই স্থানে শুভ্রজ্যোতিঃ চিন্তা করিলে নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। ষষ্ঠ তালুকাচক্র, অলিজিহ্বার নিকট অবস্থিত। সেই স্থানে শূন্যে চিত্তলয় করিলে, শূন্যস্বরূপ মুক্তির আবির্ভাব হয়। সপ্তম চক্রের নাম ভ্রূচক্র। ঐ স্থান ভ্রূমধ্যে অবস্থিত। তথায় (ভ্রূমধ্যে) গোলাকার জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে মুক্ত হয়। অষ্টমে ব্রহ্মরন্ধ্রনামে নির্ব্বাণস্থান। সেই স্থানে ধূম্রাকার জ্যোতিঃ চিন্তা করিলে মুক্ত হয়। নবম চক্রের নাম ব্রহ্মচক্র। উহা ষোড়শদলপদ্মে যুক্ত। তাহার অভ্যন্তরে সচ্চিদ্রূপিণী অপরা শক্তি বিরাজমানা। সেই স্থানে পূর্ণ শক্তির ধ্যান করিয়া জীব মুক্ত হন। এই নবচক্র, একে একে, ক্রমশঃ ধ্যান করিতে করিতে সিদ্ধির সহিত মুক্তি উপস্থিত হয়। দুইখানি ধনুঃ স্থাপিত করিলে যেরূপ আকৃতি ধারণ করে, তাদৃশ জ্যোতিঃস্বরূপ কদম্বের ন্যায় কেশরাদিযুক্ত স্থান, জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করিলে ব্রহ্মলোক গমন করে। উর্দ্ধশক্তি নিপাতন এবং অধঃশক্তির আকুঞ্চন দ্বারা মধ্যশক্তি জাগ্রত হইলে পরম সুখ উৎপন্ন হয়।" মোটের উপর জগতের নানাত্ব বিদ্যমান থাকায় একত্ব অনুভূত হয় না। সুতরাং সমুদয় চিত্তবৃত্তি লয় করিতে পারিলেই জগৎ লীন হইবার আশা করা যাইতে পারে। এই প্রকার চিত্তবৃত্তিনিরোধের নামই লয়যোগ। এক্ষণে কথা এই যে এই প্রকার নবচক্র চিন্তা বা নাদানুসন্ধান দ্বারা মনোলয় করা

যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে আত্মজ্ঞান জন্মিবে তাহার প্রমাণ কি? সুষুপ্তিকালে মানবমাত্রেরই চিত্তবৃত্তি লীন থাকে, তাহাতে কাহারও আত্মজ্ঞান হইয়াছে এইরূপ জানা যায় না। এই নিমিত্তই জ্ঞান ভিন্ন কেবল যোগ দ্বারা মুক্তি লাভ হইবে, এরূপ বলা যায় না। যত্ন দ্বারা চিত্ত লয় করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তি তাহার ফলে হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। অবশ্য সুষুপ্তিতে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায়, মনোলয়ে তদপেক্ষা সহস্র গুণ আনন্দ পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যে জ্ঞান-স্বরূপা মুক্তি তাহা কে বলিবে? লয়যোগীর উদ্দেশ্যই এতাদৃশ মনোলয় বা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ। যদি তাঁহারা মনোলয়ের ও সিদ্ধির ফল বিচার করত ত্যাগ করিতে পারেন ও জ্ঞানের জন্য যত্ন করেন, তবেই জ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যোগীদের ইহাই চরম অবস্থা। যথা—

"সোঽয়মেবাস্তু মোক্ষাখ্যো মাস্তু বাপি মতান্তরে।
মনঃপ্রাণলয়ে কশ্চিদানন্দঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
অস্তু বা মাস্তু বা মুক্তিরত্রৈবাখণ্ডিতং সুখম্॥" হঠপ্রদীপিকা।

"এই লয়সমাধিতে মুক্তি হউক বা মতান্তরে নাই হউক, কিন্তু মনঃ-প্রাণলয়ে বিশেষ আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাই অখণ্ড সুখ, ইহাই হঠযোগপ্রদীপকারের উক্তি। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, সমাধিভঙ্গেই তজ্জনিত সুখের তিরোধান হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তজ্জন্যই যোগশাস্ত্রের অনেকাংশ বেদসম্মত হইলেও সম্পূর্ণ তদনুযায়ী নহে বলিয়া মুক্তি লাভ ইহা দ্বারা অসম্ভব। তজ্জন্য বেদসঙ্গত অন্য যোগের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

"প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে॥

অমৃতবিন্দূপনিষৎ।

"প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, তর্ক ও সমাধি এই ষড়ঙ্গ যোগ বেদসম্মত।" এখানে তর্কশব্দের অর্থ বেদসঙ্গত বিচার দ্বারা প্রকৃত-তথ্যনির্ণয়। ধ্যানের পরে তর্কের স্থান দেওয়ার অন্যান্য যোগের সহিত উহার পার্থক্য সূচিত হইল। কারণ, অন্য মতে ধ্যানের পর ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তের লয় হইয়া তদাকারাকারিত হওয়াই সমাধিনামে কথিত। কিন্তু বৈদিক মতে বিচার চলিতে থাকিলে সেই ধ্যানের পরে লয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং প্রচলিত যোগের সহিত তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ লক্ষিত হয়।

রাজযোগ যথা—

"দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্ব্বং সাধিতোঽয়ং মহাত্মভিঃ।
রাজযোগে মনোবায়ূ স্থিরৌ কৃত্বা প্রযত্নতঃ॥
পূর্ব্বাভ্যস্তৌ মনোবাতৌ মূলাধারনিকুঞ্চনাৎ।
পশ্চিমং দণ্ডমার্গন্তু শঙ্খিন্যন্তঃ প্রবেশয়ৎ॥
গ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্বা ভ্রমরকন্দরম্।
ততস্তু নাদয়েদ্বিন্দুং ততো শূন্যালয়ং ব্রজেৎ॥
অভ্যাসাত্তু স্থিরঃ শান্তঃ উর্দ্ধরেতাশ্চ জায়তে।
পরমানন্দময়ো যোগী জরামরণবর্জ্জিতঃ॥
অথবা মূলসংস্থানমুদ্ঘাতৈঃ সম্প্রবোধয়েৎ।
সুপ্তাং কুণ্ডলিনীং নাম বিসতন্তুনিভাকৃতিম্॥
সুষুম্নান্তঃপ্রবেশেন পঞ্চ চক্রাণি ভেদয়েৎ।
ততঃ শিবে শশাঙ্কেন স্ফুর্জন্নির্ম্মলরোচিষি॥
সহস্রদলপদ্মান্তঃস্থিতেঃ শক্তিং নিযোজয়েৎ।
অথ তৎসুধয়া সর্ব্বাং সবাহ্যাভ্যন্তরং তনুম্॥
প্লাবয়িত্বা ততো যোগী ন কিঞ্চিদিতি চিন্তয়েৎ।

তত উৎপন্থতে তস্থ সমাধি নিস্তরঙ্গিণী
এবং নিরন্তরাভ্যাসাদ্ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥”

“দত্তাত্রেয়প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা এই যোগপথ প্রচলিত করেন। মনঃ ও শারীর বায়ু স্থির করাই ইহার অঙ্গ। অভ্যাস দ্বারা মূলাধার আকুঞ্চনপূর্ব্বক, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে মনঃ এবং বায়ুকে প্রবেশ করাইবে, পরে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থিনামক গ্রন্থিত্রয় ভেদপূর্ব্বক ভ্রমর-গুহাতে লইয়া যাইবে। তথা হইতে শূন্য স্থানে লইতে হইবে। এইরূপ অভ্যাসের ফলে স্থির ও উর্দ্ধরেতা হইয়া জরামরণবর্জ্জিত হইবে, এবং পরমানন্দ লাভ করিবে। অথবা মূলাধারে আঘাত দ্বারা মৃণালতন্তুসদৃশ কুণ্ডলিনীর চৈতন্য করত সুষুম্নাপথে পঞ্চচক্র ভেদ করত সহস্রদল পদ্মে পরমশিবে যোজনা করিবে। তথায় সুধাদ্বারা সমস্ত শরীর প্লাবিত হইলে অন্য কোন চিন্তা করিবে না, সেইরূপ অবস্থায় সমাধি উপস্থিত হইবে। ক্রমাগত এইপ্রকার অভ্যাস দ্বারা এতাদৃশী অবস্থা লাভ করা যায়।” যোগাচার্য্যগণ এই সাধনপ্রণালীকেও রাজযোগ বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের ভাষায় আমরাও ইহাকে রাজযোগই বলিব অন্যান্য আচার্য্যদিগের মতে যেরূপে এই যোগ হইতে পারে, তাহা এইরূপ। যথা—

“অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥
শাম্ভব্যা চৈব খেচর্য্যা ভ্রামর্য্যা যোনিমুদ্রয়া
ধ্যানং নাদো রসানন্দো লয়ঃ সিদ্ধিশ্চতুর্ব্বিধা ॥
পঞ্চধা ভক্তিযোগেন মনোমূর্চ্ছা চ ষড়্‌বিধা।
ষড়্‌বিধোঽয়ং রাজযোগঃ প্রত্যেকমবধারয়েৎ ॥”

“আমি ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নই, সুতরাং আমার শোকের কোন কারণ নাই; আমি সচ্চিদানন্দরূপ, নিত্য-মুক্ত-স্বভাবে অবস্থিত, ইহাই রাজ যোগের

স্বরূপ। এই রাজযোগ শাম্ভবী, খেচরী, ভ্রামরী ও যোনিমুদ্রা দ্বারা ক্রমে ধ্যান, রসানন্দ, নাদ ও লয়নামক চারি সিদ্ধিতে বিভক্ত। পঞ্চম মনোমূর্চ্ছা এবং ষষ্ঠ ভক্তিযোগ। এই সমস্তগুলি বা প্রত্যেকটীর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেকটীকেই রাজযোগ স্বীকার করা যায়।" ঐরূপ জ্ঞানলাভের নামই রাজযোগ। নতুবা কাহার সমাধি হইয়াছে শুনিয়াই, তাহাকে যোগী বা অবতার ইত্যাদি বলা মূর্খতার লক্ষণ। কীর্ত্তনাদিতেও সাময়িক ঐরূপ অবস্থা কাহারও আসে। উহাও এক শ্রেণীর সমাধির অন্তর্গত। কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে শেষ অবস্থা বলা যাইতে পারে না। ঘেরণ্ডসংহিতায় এই সমাধিকে ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে। যথা—

"স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরূপকম্।
চিন্তয়েদ্ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্ব্বকম্।
আনন্দাশ্রুপুলকেন দশাভাবঃ প্রজায়তে।
সমাধিঃ সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চ মনোন্মনিঃ॥"

"পরম আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়ে ভক্তিযোগসহকারে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে আনন্দাশ্রুপাত হইতে থাকে এবং দশাভাব উপস্থিত হয় এবং মনের উন্মনি অবস্থা প্রাপ্তি হয়, ইহাতেও সমাধি উপস্থিত হয়।"

"উন্মন্যবাপ্তয়ে শীঘ্রং ভ্রূধ্যানং মম সম্মতম্।
রাজযোগপদং প্রাপ্তুং সুখোপায়োঽল্পচেতসাম্।
সদ্য-প্রত্যয়-সন্ধায়ী জায়তে নাদজো লয়ঃ।"

"শীঘ্র উন্মনি অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত আত্মারাম মুনি ভ্রূধ্যানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। রাজযোগপ্রাপ্তির নিমিত্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের জন্য এই সাধনাই সহজসাধ্য। নাদের উৎপত্তিহেতু সদ্যই চিত্তের লয় হয়।"

"কর্ণৌ পিধায় হস্তাভ্যাং যঃ শৃণোতি ধ্বনিং মুনিঃ।
তত্র চিত্তং স্থিরীকুর্য্যাৎ যাবৎ স্থিরপদং ব্রজেৎ॥

অভ্যস্ত-মানোনাদোঽয়ং বাহ্যমাবৃণুতে ধ্বনিম্।
পক্ষাদ্বিপক্ষমখিলং জিত্বা যোগী সুখী ভবেৎ ॥
মকরন্দং পিবন্ ভৃঙ্গো পদং নাপেক্ষতে যথা।
নাদাসক্তং তথা চিত্তং বিষয়ান্ন হি কাঙ্ক্ষতে ॥
মনোমত্তগজেন্দ্রস্য বিষয়োদ্যানচারিণঃ।
নিয়মনে সমর্থোঽয়ং নিনাদনিশিতাঙ্কুশঃ ॥
বদ্ধস্তু নাদশব্দেন মনঃ সন্ত্যক্তচাপলম্।
প্রযাতি সুতরাং স্থৈর্য্যং ছিন্নপক্ষো খগো যথা ॥
পূজাকোটী সমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটীসমো জপঃ।
জপকোটীসমং ধ্যানং ধ্যানকোটীসমোলয়ঃ।
নহি নাদাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মনঃ পরঃ।
নানুসন্ধে পরা পূজা ন হি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্ ॥" কুলার্ণব।

"যোগী দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ণ বিবর চাপিয়া ধরিবে। তাহাতে যে ধ্বনি শুনা যায়, সেই ধ্বনিতে চিত্ত স্থির করিবে। এইরূপ করিতে করিতে চিত্ত স্থির পদ প্রাপ্ত হইবে। নাদের অভ্যাসে বাহিরের শব্দ আর শ্রবণে আসিবে না। অর্দ্ধমাস ধরিয়া অভ্যাস করিতে করিতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর হইবে। প্রথম অভ্যাসে সমুদ্রগর্জ্জন, মেঘধ্বনি, ভেরীশব্দ ইত্যাদির মত শব্দ শুনা যাইবে। আরও অভ্যাসে সূক্ষ্মতর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু স্থির হইলে মাদল, শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি ধ্বনি শুনা যাইবে। প্রাণ বহুকাল ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতিলাভ করিলে ক্ষুদ্রঘণ্টা বা কিঙ্কিনী ধ্বনি, বীণা, ভ্রমরঝঙ্কার ইত্যাদি বহুপ্রকার শব্দ দেহমধ্যে শুনা যাইবে। বহুল শব্দ শুনিয়া সূক্ষ্ম ধ্বনিতে মনোনিবেশ করিবে। তাহাতে চিত্ত আসক্ত হইলে ক্রমশঃ স্থির হইয়া যাইবে। যে নাদে মন আসক্ত হইবে তাহাতেই মনস্থির করিলে মনঃ লয় হইয়া যাইবে। মধুপান

করিলে ভ্রমর যেমন গন্ধকে ইচ্ছা করে না সেইরূপ চিত্তনাদে আসক্ত হইলে গন্ধ, মাল্য, স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়ে আর আসক্ত হয় না। মনঃ উন্মত্ত হস্তিবৎ বিষয় উদ্যানে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে, কিন্তু নাদ তাহার পক্ষে সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশস্বরূপ। নাদশব্দ শ্রবণে অতি চপল মন ও ছিন্ন পক্ষ পক্ষীর মত স্থির হইয়া পড়ে।

স্তবপাঠ, কোটী পূজার সমান, জপ আবার কোটী স্তোত্রপাঠের সমান; ধ্যান কোটী জপের সমান, আর মনোলয় কোটী ধ্যানের সমান। নাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর নাই। নিজের আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর নাই। নাদের অনুসন্ধানই শ্রেষ্ঠপূজা, তৃপ্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল আর নাই।" হঠপ্রদীপিকাকার মতে জ্ঞানীর লক্ষণ এতাদৃশ, যথা—

"যাবন্নৈব প্রবিশতি চরণ্মারুতো মধ্যমার্গে
যাবৎ বিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ
যাবৎ ধ্যানে সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
তাবৎ ধ্যানং জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যাপ্রলাপঃ ॥"

"প্রাণ বায়ু মধ্যমার্গ দ্বারা বিচরণ করত যতদিন ব্রহ্মরন্ধ্রে যাইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত না হয়, কুম্ভকের দ্বারা যতদিন না শুক্র স্থির হয়, যতদিন তত্ত্বগুলি ধ্যান ফলে সহজ সদৃশ অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক না হয় ততদিন ধ্যান বা জ্ঞানের কথা যতই বলুক না কেন উহা দম্ভ মিথ্যা এবং প্রলাপে পূর্ণ বলিয়া জানিতে হইবে।"

একাদশ অধ্যায়

সন্ধ্যা ও মন্ত্রযোগ।

মনোলয় করিবার নিমিত্ত অনেক উপায় কথিত হইল। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, চিত্ত যখন একাগ্র হইয়া পরমাত্মাকে অনুভব করে, তখনই তাহার নাম যোগ। চিত্তের একাগ্রতানামক ব্যাপারকে বুঝিতে যে সমাধিশব্দ প্রযুক্ত হয়, তাদৃশ সমাধি চেষ্টা করিলে সকল চিত্তেই সম্ভব হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা দশাভাব হইতে আরম্ভ করিয়া লয়যোগের সর্ব্বপ্রকার সমাধিই কথিত হয়। আর চিত্তসমাধান অর্থে যে সমাধি পদ সিদ্ধ হয়, সে সমাধিশব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিতে হয়, তাদৃশ সমাধিরই নাম যোগ বা রাজযোগ। ইহাই বৈদিক মতের সমাধি, সুতরাং ইহাকেই করণীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পরমাত্ম-প্রত্যক্ষ করিতে জ্ঞানবিচারের আবশ্যক। এই নিমিত্ত বৈদিক মতে ধ্যানের পর তর্ক দ্বারা আত্মনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হয়। উহা ঋষিকথিত প্রণালীতেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ সেই জ্ঞানমার্গ ব্যক্তিগত বুদ্ধি দ্বারা আলোচিত হয় নাই। কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানলাভের জন্য এতাবৎকাল যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সর্ব্ব বর্ণের সমান অধিকার। অতঃপর দ্বিজাতির অবশ্য করণীয় সন্ধ্যার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। বেদব্যাস পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ' যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ" অর্থাৎ যোগের সহিত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হয়।" মন্ত্র আবৃত্তিরূপ যোগই বৈদিক পন্থা। তজ্জন্য দ্বিজাতির সন্ধ্যাবন্দনই যোগের মধ্যে পরিণত ছিল, তাই তাঁহারা অন্য প্রকার হঠাদি প্রক্রিয়ার আশ্রয় লন নাই। যদি ঐ সন্ধ্যাবন্দনাদি পরমাত্মদর্শনের উপযোগী হয়, তবেই তাহাকে যোগ বলা যাইবে। নতুবা দেবতাসিদ্ধির ন্যায় উহা মন্ত্রযোগমাত্র।

এই সন্ধ্যাদিতে হঠাদির ন্যায় কোনরূপ আসনের আবশ্যকতা নাই। তাই অনেকে বলেন, উহা দ্বারা কি প্রকারে সমাধি বা যোগ হইতে পারে? কিন্তু তাহা ঠিক নহে। তৎসম্বন্ধে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যধৃতর বচন উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

"আসনস্থানবিধয়ো ন যোগস্য প্রসাধকঃ।
বিলম্বজননাঃ সর্ব্বে বিস্তরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শিশুপালঃ ফলং প্রাপ স্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ॥"

"আসন, স্থানাদির ব্যবস্থা এ সকল, যোগসাধনের তত অনুকূল নহে। তাহাতে বিলম্ব ও কার্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিশুপালনামক কোন সাধক কেবল স্মরণ ও অভ্যাস দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।" সন্ধ্যাতে ধ্যান এবং বিচারের স্থান আছে, সুতরাং তদ্দ্বারা সাধক পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তজ্জন্যই তাঁহাদের চিত্তলয়রূপ যোগের ব্যবস্থা নাই। পাতঞ্জল সূত্রে এই জন্যই ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকেও নির্ব্বিকল্প সমাধির বহিরঙ্গ বলিয়াছেন।

যথা ঃ—"তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য।"

সন্ধ্যা ও পূর্ব্বোক্ত হঠ-লয়াদির পার্থক্য মদীয় আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট প্রণালীর্তে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয়।	সর্ব্ববর্ণের অনুষ্ঠেয়।
সন্ধ্যাঙ্গ।	যোগাঙ্গ।
১। স্নান অথবা তদনুকূল মার্জ্জন ও সামান্য আচমন।	পদ্মাদি আসন—ধৌত, বস্তি আদি ষট্‌কর্ম্ম।
২। ঋষ্যাদি পরিজ্ঞানপূর্ব্বক প্রাণায়াম।	মহামুদ্রাদি দশবিধ মুদ্রা ও প্রাণায়াম।
৩। আচমন।	

৪। মার্জ্জন।	প্রত্যাহার।
৫। অঘমর্ষণ।	
৬। সূর্য্যোপস্থান।	ধারণা।
৭। সন্ধ্যাঙ্গ তর্পণ।	
৮। ন্যাস।	
৯। গায়ত্রী জপ করিতে করিতে ধ্যান ও বিচার।	ধ্যান ও সমাধি, বৈদিক যোগের তর্ক।
১০। পরিণামে আত্মজ্ঞান ও তদ্দ্বারা মুক্তি।	জ্ঞানলাভে পরমাত্মদর্শন ঘটিলে রাজযোগপ্রাপ্তি ও মুক্তি।

বর্ত্তমান প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা যাইতেছে, সুতরাং তাহার কারণও কিছু দেখান যাইতেছে ; এক ঈশ্বর উপাসনা, সর্ব্বজাতি-ধর্ম্মসমন্বয় এ যুগের নাকি উদারতা, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিয়া কি করিব। তবে যাঁহাদের মনে অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস আছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অসভ্য ছিলেন না, তাঁহারা তাঁহাদেরই কথা একটু বিচারের চক্ষে দেখিলে পরিশ্রম সার্থক হইবে, মনে করা যায়।

একটী প্রশ্ন আজকাল সর্ব্বত্রই উঠিতেছে যে, ব্রাহ্মণজাতি অতি কঠিন সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রাদি করিয়াছেন। ইহা অতি দুর্ব্বোধ, অতএব তোতা-পাখীর ন্যায় মন্ত্র আবৃত্তি দ্বারা কি হইবে ? সুতরাং তাঁহারা বেদের অর্থ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিলেন উহা কতকগুলি কৃষকের গান। গরু, ছাগল প্রভৃতি রক্ষার জন্য ও ক্ষেত্রের শস্যাদি বর্দ্ধনের জন্য, মনঃ-কল্পিত কতকগুলি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন যে, তোমরা বেদ আমাদের নিকট প্রচার কর নাই এবং উহা অতি গোপনে রাখিয়াছিলে আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে উলুকের ন্যায় তোমাদের বেদবিদ্যা লুক্কায়িত হইয়াছে। এবার আমরাও

বেদ জানিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম ইত্যাদি। বাস্তবিক সেই সব প্রভুগণ যদি তাহা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরাও নিজেকে ধন্য মনে করিতাম ও তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতাম। কারণ, আমরা এত ভূতের বোঝা বহনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, তাঁহারা ও আচারাদিহীন হইয়াও বেদাঙ্গ ছয়টী না জানিয়াও বেদজ্ঞানের একটী নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার ফলে এই হইল যে, বেদ কতকগুলি চাষার গান। কথায় বলে –

'কুলো, তুষ ফেলিয়া ধান রাখে,—আর 'চালুন' ধান ফেলিয়া মাটি গ্রহণ করে।"

এখন ইহারা কোন দলে ভর্ত্তি হইলেন? মোট কথা নব্য সভ্যগণ শব্দ-শক্তি বা মন্ত্রমাহাত্ম্য কিছুই বোঝেন না। তাই তাঁহারা ঐরূপ বুঝিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মন্ত্রাদি দ্বারা চিকিৎসা হইত। বিষঝাড়া ইত্যাদি না ধরিলেও আয়ুর্ব্বেদে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কালধর্ম্মে মন্ত্রচিকিৎসা লোপ পাইয়া দ্রব্যচিকিৎসার প্রাচুর্য্য হইয়াছে। অন্যদিকে মন্ত্রবলের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বে কায়িক বলের দ্বারা রাজত্বাদি লাভ হইত, এখন মন্ত্রণাবলের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়। যে রাজ্যের মন্ত্রিগণ যতটা জাল জুয়াচুরি, মিথ্যা বঞ্চনায় অভ্যস্ত, সেই রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কূটনীতিবিশারদগণ, বক্তৃতা, পত্রিকা, চর প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় ভাব গোপন করত সকলকে বশীভূত করিতেছেন। পূর্ব্বে যিনি হিতজনক সত্য ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য বলিতেন, তিনি বাগ্মী নামে কথিত হইতেন। এখন যিনি যতটা মিথ্যা আড়ম্বর করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তিনি ততটা বক্তা বলিয়া অভিহিত হন। আদালতে দেখা যায়, যে উকিলমহাশয় যত মিষ্টভাষী এবং জাকজমকপরায়ণ এবং মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যাতে পরিণত করিতে

পারেন, তিনি ততটা বড় হইয়া থাকেন। ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি। যিনি এইরূপ মন্ত্রণাকুশলতায় অদ্বিতীয়, তিনি সকলকে বশীভূত করিয়া স্বীয় কার্য্য প্রচার করিতে সমর্থ। ইহা কি এক প্রকার মন্ত্রবল নহে? রাজা রামমোহন রায়, কেশব সেন, কৃষ্ণানন্দ স্বামী বা স্বামী বিবেকানন্দ যে লোকের নিকট এতটা সম্মান পাইয়াছেন তাহা কি? কোন কার্য্যের ফল? বচনবিন্যাসের পারিপাট্য তাঁহাদের অন্তর্নিহিত গুণগুলির প্রকাশক হইয়াছে। নতুবা যাঁহার নীরব কর্ম্মী তাঁহাদের ভিতর ইহাদের সমকক্ষ বা এতদপেক্ষা উন্নত কেহ নাই, ইহা কে বলিতে পারে? মনোভাব-প্রকাশের নিমিত্ত শব্দই অদ্বিতীয়। যদি কাহাকেও বলা যায়,—এই লোকটী অতিশয় জঘন্য, বদমাস, চোর ইত্যাদি অথবা ইনি মহাত্মা, অবতার, সৎপুরুষ ইত্যাদি এই উভয়বিধ বাক্য দ্বারা শ্রোতার মনে বিরক্তি বা তুষ্টির উদয় হয় না কি? ক্রমাগত দশ জন এইরূপ বলিতে বলিতে সেই লোকটীকে উচু বা নীচশ্রেণীতেই দাঁড় করিয়া তুলে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার। বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা পশু, পক্ষী আদি আকৃষ্ট হয়। বংশীরবে হরিণ ছুটিয়া আসে, সর্প হিংস্রস্বভাব ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া পড়ে, এ গুলি কি শব্দশক্তির ফল নহে? এই সমুদয়গুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহাও একপ্রকার বিজ্ঞান। অর্থাৎ শব্দশক্তির সাহায্যেই এই সমুদয় সাধিত হয়। নব্যগণ সাংসারিক রূপেই এই শব্দশক্তির মাহাত্ম্য দেখিতে পান, কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিরা এই শব্দশক্তির সাহায্যে নানারূপ অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক কার্য্য সমাধা করিতেন, এখনও তাহার সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে। এখনও দুই এক স্থানে মন্ত্রবলে বিষনাশ, বাটী চালান, অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রশমন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য দেখিতে পাইতেছি।

আধুনিক শিক্ষিতগণ বলেন—জড় পরমাণুসহযোগে জগতের সৃষ্টি এবং মনুষ্য স্বীয় মনোভাব প্রকাশের নিমিত্ত নানাপ্রকার ভাষার সৃষ্টি

করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা তদ্রূপ হইলেও বৈদিক মন্ত্রাদির ভাষা তদ্রূপ নহে। বৈদিক মতে আগে নাম, পরে রূপ। পাশ্চাত্য মতে জড়ই জগতের কারণ। চৈতন্য শক্তিমান্ এবং জড় শক্তির প্রকাশ স্থান। শক্তিমান্ যখন একক অবস্থায় থাকেন, তখন তিনি অব্যক্ত, যখন আপন শক্তি বিকাশ করেন, তখন তিনি জগদাকারে পরিণত হন। সেই অব্যক্তাবস্থা ব্যক্ত হইবার কালে একটী স্ফোট (ধ্বনি) হয়, তাহারই নাম প্রণব অথবা অব্যক্তেরই ব্যক্ত অবস্থা প্রণব। সেই প্রণবনামক শব্দ হইতে অন্যান্য যাবতীয় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বয়ম্ভু ভগবান্ শব্দরূপে ভিতরে অবস্থান করত জড়ের আবরণে নানা দেহ ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ শব্দের স্পন্দন-শক্তিতে জড় ঘনীভূত হইয়া নানাপ্রকার দেহে পরিণত হইয়াছে। ঐ শব্দশক্তি যখনই দেহ হইতে নিঃসৃত হয়, তখনই জীবের মরণ হইয়াছে বলা যায়। ঐ প্রণবধ্বনিরই অভ্যন্তরে নানাপ্রকার শব্দ লুক্কায়িত ছিল। সেই স্বয়ংজাত পুরুষের নাম ব্রহ্মা। তিনি ঐ শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে তাহার অভ্যন্তরে নিবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে পারিলেন এবং শব্দবাচ্য অনেকগুলি রূপ ও দর্শন করিলেন। সেইগুলি তিনি বাহিরে বিকাশ করিবার ইচ্ছা করায়, সঙ্কল্পের সত্যতাহেতু, ইচ্ছামাত্রই তাহা বাস্তব ব্যাপারে পরিণত হইয়া গেল। ইহারই নাম মানস সৃষ্টি। ব্রহ্মা সেই মানসজাত পুত্রগণের নিকট সেই সমুদয় শব্দগুলি প্রকাশ করেন। তাঁহারা আবার নিজ নিজ পুত্র বা শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। তাহাই বংশপরম্পরাক্রমে শ্রুতি বা বেদ বলিয়া অভিহিত হইতেছে। বরাবর ইহা গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইত বলিয়া ইহার নাম শ্রুতি। কলিযুগের মানবগণ স্মৃতিশক্তির হীনতাহেতু ইহাকে লিপিরূপে প্রকাশ করেন। তাই আজ পুস্তকাকারে ছাপাখানায় প্রবেশ করিয়া, উহার নানাপ্রকার অর্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু ঐ সব অর্থ বা ভাষান্তর দ্বারা প্রকৃত

বস্তু বা শব্দপ্রতিপাদ্য দেবতাগুলির দর্শন পাইবার কোনই আশা নাই। সুতরাং তাহার শব্দগত আভিধানিক অর্থ নিষ্প্রয়োজন। যেমন সেই শব্দগুলি ব্রহ্মার হৃদয়ে নিহিত ছিল, আমরাও তেমনি অসংখ্য জীবগণ তদীয় হৃদয়েই ছিলাম এবং আমরা তাঁহার অংশ হওয়াতে, ঐ সব মন্ত্র ও তৎপ্রতিপাদ্য দেবতাগুলিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। যদি তাঁহার ন্যায় অন্তর্মুখ হইয়া ডুবিতে পারি তাহা হইলে, অন্তরে সেই সকল দেবতাদি দর্শন করিতে পারি। অতএব বেদমন্ত্রের সহায়তায় ব্রহ্মার ভাব অবলম্বন করিলে মন্ত্রের অর্থস্বরূপ দেবতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব।

প্রণিধান করিলে ইহা বুঝা যাইবে যে, বাক্য জগতের বাহ্য ভাব ধরিয়া সৃষ্ট হয় নাই। পশু, পক্ষী, ক্রিমি, কীট প্রভৃতি সকলেরই মনোগত ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত নানা প্রকার সঙ্কেত আছে। তাহাই বাগিন্দ্রিয়ের সহায়তার সম্পন্ন হইলে তাহার নাম ভাষা বলা যায়। মানব শৈশবাবস্থায় হাঁসি, কান্না দ্বারা স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করে, বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে নিজ পিতা, মাতা বা পালকের কথিত ভাষায় অভ্যস্ত হয়। বৈদিকভাষা তাহা নহে, উহা ব্রহ্মা ও তদীয় মানস পুত্রের অনুভূত ভাষা। তাহা হইতেই সংস্কৃত ভাষা উদ্ভূত হয়। তাহারই অপভ্রংশ হইতে নানা প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং তাহার অভিধানও তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিক ভাষা অন্য অভিধানের সাহায্যে বুঝিবার উপায় নাই। তাই এতাদৃশ ভাষা অর্থান্তর করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা-মাত্র। আমাদের মনোবৃত্তিগুলি তদ্ভাবভাবিত করিতে পারিলে ঐ শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। জন্মান্তরীণ সাধনের বলে তাদৃশ মনোবৃত্তিলাভ সম্ভব। তাই পতঞ্জলিকথিত প্রণবজপ সাধারণরূপে হইতে পারে না, কারণ উহা স্থূলরূপ বৈখরীমাত্র। অগ্নি আনয়ন করিতে বলিলে যেমন কাষ্ঠ-সংযুক্ত অগ্নি বা কোন আধারযুক্ত অগ্নিই আনয়ন করা যায়, তদ্রূপ প্রণব জপ করিতে বলিলে, গায়ত্রী বা

অন্য বৈদিক কোন উপায়ে তাহার জপ করিতে হয়। তজ্জন্য গায়ত্রীকে প্রণবের বিস্তার বলা হয় এবং গায়ত্রীই বিস্তৃত হইয়া চারিবেদে পরিণত হইয়াছে বলা যায়। তজ্জন্যই কলির অল্পায়ুঃ মানবগণের জন্য প্রণব বা গায়ত্রীজপেরই কথা বলা হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে মন্ত্রশক্তির উপর কাহারও আস্থা নাই। অনেকেই বলেন—শব্দ বাহ্য বস্তুর উপর বা আভ্যন্তর শক্তির উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। এই জন্য তাঁহাদের বিশ্বাস মন্ত্রজপের বা মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা কোন প্রকার ইষ্ট, অনিষ্ট কিছুই সম্ভব নহে। হিন্দুর সমুদয় শাস্ত্র ইহার বিরোধী; প্রত্যক্ষ জ্ঞানও ইহার বিরোধী, তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

বেদনামক শব্দরাশি হইতেই আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। এই জন্যই যাহারা বেদপরাঙ্মুখ, তাহারা ধার্ম্মিকনামের যোগ্য নহে ইহাই আর্য্যসিদ্ধান্ত। বৈদিক শব্দরাশি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় কাণ্ডে বিভক্ত; শব্দই মনোগত ভাবের পরিচায়ক॥ শব্দের ব্যবহার দ্বারাই পিতাও পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, শব্দের উত্তেজনায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া একে অপরকে বিনাশ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আমি একটি কটুবাক্য উচ্চারণ করিলাম, অমনি তোমার অন্তঃকরণ পীড়িত হইয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গেই তোমার হাত উঠিল এবং তুমি আমাকে আঘাত করিলে—হয় তো উহাই আমার প্রাণনাশের কারণ হইল। এখন জিজ্ঞাস্য, যদি শব্দের শক্তি না থাকে, শব্দ জড়ের উপর কোন ক্রিয়া না করে, তবে হাতখানা উঠিল কাহার শক্তিতে? হাতটা কি চেতন? যদি বল উহা চেতনসংযুক্ত তাই উঠিয়াছে, তবে আমি বলি,—চৈতন্য নাই অথচ জড় আছে বা জড় ক্রিয়া করিতেছে তাহার মূলে চৈতন্য নাই, এইরূপ কেহ দেখিয়াছে কি? জগতে এমন কোন কিছু কি আছে যাহা আপনি চলিতে পারে? প্রকাণ্ড ইঞ্জিন লক্ষ, লক্ষ গুণ ওজনের বস্তু লইয়া দৌড়াইতেছে, তুমি বলিবে উহা

জড়ের শক্তি, আমি বলি, জল, অগ্নি প্রভৃতির সহায়তায় হইতেছে, কিন্তু মূলে যদি ইঞ্জিনচালক না থাকে, তাহা হইলে বহন করিবার ক্ষমতা বা চালাইবার ক্ষমতা ইঞ্জিনের আছে কি? যদি থাকে ইহা প্রমাণিত হয়, তবে জড়ই করে বলিতে পারিতে। এইরূপ জগতের সমুদয় বস্তু বিশ্লেষণ কর দেখিবে, প্রতিকার্য্যের মূলেই চৈতন্য শক্তি রহিয়াছে। নতুবা সব অসাড় নিস্পন্দ, কাহারও কিছু ক্রিয়া নাই সব শবাকার। তাই চৈতন্য স্বীকার করিয়া ঈশ্বর মানিতে হয়। সেই ঈশ্বরের বাচক প্রণব। বাচক ও বাচ্য অভেদে তিনি একই। সেই প্রণবের স্পন্দনে সমস্ত জগৎ পুনঃপুনঃ উত্থিত হইতেছে।

সর্ব্ব শব্দের মূল প্রণব, তাহা হইতেই সমুদয় বর্ণের উৎপত্তি, সুতরাং তাহারা প্রণবের অঙ্গ। যদি অঙ্গী সত্য হন, তবে অঙ্গ মিথ্যা হইবে না। অঙ্গী ছাড়া অঙ্গ থাকিতে পারে না। তজ্জন্য প্রণবকে আত্মস্বরূপে যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের মুখ হইতেও যে সব বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা প্রাকৃত বা সংস্কৃত হউক তাহাতে কোন মাত্র ক্ষতি নাই, তাহা যে উদ্দেশ্যে যেখানে ব্যবহৃত হইবে তাহা নিশ্চয়ই ফল প্রসব করিবে। তাই সংস্কৃত মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও উচ্চারণ জানিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। প্রাকৃত মন্ত্রেও তাহার বিনিয়োগ আছে, এবং যাঁহারা মন্ত্রতত্ত্ব অনুধাবন করেন তাহারাই বুঝিবেন।

আমরা যাহা বলি, তাহা মন্ত্র হয় না কারণ আমাতে শক্তি নাই। রাজা যদি হুকুম করেন—ইহাকে ফাঁসী দাও, তৎক্ষণাৎ সহস্র লোক তাহা সম্পাদনে ব্যস্ত হয়; আমার কথায় কেহ কোন কাজেই অগ্রসর হয় না—কারণ আমি শক্তিহীন, জড়তুল্য। কিন্তু যদি আমিই আবার রাজশক্তিসম্পন্ন হই, আমার কথাই সকলের পালনীয় হইবে। ইহাই মন্ত্রশক্তির লৌকিক যুক্তি।

গায়ত্রী বা প্রণব জপেরদ্বারা ক্রমশঃ মানসিক ভাব পূর্ব্বকালীন ঋষিদের মত অবস্থায় পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। শাস্ত্রমতে প্রথমে সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল। ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং বর্ত্তমান কলিযুগে ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমরা ক্রমশঃ অবনত হইতেছি এবং এখন প্রায় তাহার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়াছি। আর পাশ্চাত্য মতে তাহারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বর্ত্তমান বাহ্যবিজ্ঞানাদির আবিষ্কার করিতেছে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপসমুদয়, ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত। কিন্তু আমরা সেই বেদনামক শব্দরাশির অধীন, যে বেদ সমাধিজাত বুদ্ধি দ্বারা অনুভূত সত্য, সুতরাং আমাদের বৈদিক ভাষা মনুষ্য-কৃত নহে। অতএব গায়ত্রীজপ এবং লৌকিক মন্ত্রজপে অতিশয় পার্থক্য আছে। তাহাদের মতে ঈশ্বর প্রার্থনা দ্বারাই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু আমরা সেরূপ আশা করিতে পারি না। আমাদের বৈদিক শব্দগুলি ব্যাবহারিক বস্তুর পরিচায়ক নহে, তাহা উচ্চ ভাবের পরিচায়ক। সুতরাং মন্ত্রের প্রতি মনঃসংযোগ করিবার জন্য জপের প্রয়োজন। যদিও পাশ্চাত্য-ভাবে ভাবিত আমাদের নব্য শিক্ষিতগণ জপের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, কিন্তু প্রকারান্তরে তাঁহারাই ব্যাবহারিক বস্তুগুলি মানবসাধারণের নিকট পরিচিত করিবার জন্য দেওয়ালে রাস্তায়, গাছে, থিয়েটারে বায়স্কোপ-প্রভৃতিতে নানারূপ বিজ্ঞাপন দ্বারা জপ করাইতেছেন ও তাহার ফলে ক্রমশঃ সেই সমুদয় দ্রব্যের ক্রীতদাস করিয়া তুলিতেছেন এবং উহা আমাদের প্রায় অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈদিক মন্ত্র ক্রমাগত জপের দ্বারাও তাদৃশ মানসিক ভাব না হইবার কোন কারণ নাই। তাই তাঁহারা জপের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই জপ তিন প্রকার—বাচিক, উপাংশু ও মানসিক। অন্যে শ্রবণ করিতে পারে এইরূপ ভাবে জপের নাম বাচিক। ওষ্ঠাদিসঞ্চালনপূর্ব্বক জপ করা যাইবে,

অথচ অন্যে না শুনিতে পায়, এরূপ জপের নাম উপাংশু। আর মনে মনে স্মরণ করার নাম মানসিক জপ। ইহার মধ্যে মানসিক জপের স্থান অতি উচ্চে, তৎসম্বন্ধে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর তৃতীয় অনুবাকের ভাষ্যে বলিয়াছেন ঃ—

"এবঞ্চ মনোবৃত্তিত্বে মন্ত্রাণাং বৃত্তিরেবাবর্ত্ততে ইতি। মনসো জপ উপপদ্যতে। অন্যথা বিষয়াত্মামন্ত্রো নাবর্ত্তয়িতুং শক্যেত ঘটাদিবদি"তি মন্ত্রগুলি ক্রমাগত মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে তাহা মনোবৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করে, তাহারই জন্য মানসিক জপের উৎকর্ষ সিদ্ধি হয়। নতুবা মন্ত্রগুলি শুধু উচ্চারণমাত্রে কোন ফল হইত না। যদি বসিয়া অনবরত 'জল' 'জল' জপ করা যায়, তথাপি জলপানব্যতিরেকে তৃষ্ণা নিবৃত্তি যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ মন্ত্রগুলি মানসিকভাবে পরিণত না হইলে জপের কোন ফল হইবে না। কারণ মন্ত্রের লক্ষ্য কোন বাহ্য বস্তু নহে।

অন্তরের ভাবশুদ্ধির নিমিত্তই মন্ত্রের আবৃত্তি প্রয়োজন। সুতরাং বৈদিক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ দ্বারা বা মানবকৃত ভাষা দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যথা—"গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি বেদবাহ্যবিবর্জ্জিতঃ। বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ ॥" "বেদবাহ্য কোন মন্ত্রও গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে তাহা বর্জ্জন করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মন্ত্রাভ্যাস করাকেই জপ বলা যায়।" ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অন্য জাতির কি কোন উপায় নাই ? আমরা বলিব তাহাদের কাম্য ঈশ্বর তাহাদের প্রণালীতে লভ্য হইলেও বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সকলেরই উপাস্য এক ঈশ্বর, ইহা বৈদিক ধর্ম্ম নহে। বর্ত্তমান সাম্য ও উদারমতের অতিরিক্ত আন্দোলন-সময়েও এরূপ বৈষম্যাদি প্রচার অতি সাহসের কথা। পণ্ডিত ব্যক্তির সে সাহস না থাকিলেও আমাদের তাহাতে কোন ভয় নাই। কারণ ঐরূপ

ঈশ্বর বেদ ও বেদসম্মত কোন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া আমাদের ধারণা—মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন—"সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়"ইতি। স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত। যদিদং কিঞ্চ তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশত।"

"তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইয়া উৎপন্ন হইব। তিনি তপস্যা (আলোচনা) করিলেন, তপস্যা করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। এই যাহা কিছু, তাহা রচনা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।"

প্রথমতঃ তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করেন। তজ্জন্য তপস্যা করেন, কিন্তু অন্য ধর্ম্মীদিগের ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারী। সুতরাং আমাদের ঈশ্বর তাহাদের নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি বহু হইয়াছিলেন, করেন নাই। এবং দৃশ্যমান জগৎরূপ বহুসৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে চৈতন্যরূপে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং তিনিই বহুরূপে প্রবেশ করিলেন। অতএব তিনিই বহুরূপে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ-রূপে, জীব, জগৎ ও ঈশ্বররূপে আছেন। সুতরাং তাঁহাকে যে কোন কল্পিত নামে ডাকার আবশ্যকতা রহিল না। কারণ তাহা হইলে জগতের বাহিরে তাঁহাকে লইতে হয়। তিনি বেদানুযায়ী, সুতরাং বেদ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন। যথা—

"অনাদিনিধনা বিদ্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যত সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ।
নানারূপঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মিমীতে স ঈশ্বরঃ।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষধর্ম্ম।

"বাগ্বিদ্যার আদি, অন্ত নাই। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রথমে শব্দমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই বেদময়ী দিব্যা বাণী হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড

দৃষ্ট হইয়াছে। ঋষিদিগের নাম ও বৈদিক বিভাগসকল এবং প্রাণিগণের যে নানাপ্রকার রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তৎসমুদয় আদিতে সেই ঈশ্বর বেদশব্দ অবলম্বন করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।” তজ্জন্য দ্বিজগণের নিমিত্ত বৈদিক বাণী সন্ধ্যাই একমাত্র অবলম্বন। তাই তাঁহারা অন্য প্রকারে যোগের অনুশীলন না করিলেও একই ফল পাইতে পারেন, অতঃপর আমরা সন্ধ্যারূপ মন্ত্রযোগ অবলম্বনে কিরূপে রাজযোগে উপনীত হইতে পারি, তাহাই আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রণব পরমাত্মার নাম বা অব্যক্তাবস্থার প্রকাশক ব্যক্ত শব্দ, তাহা হইতে গায়ত্রী এবং তাহাই বিস্তৃতরূপে বেদনামে অভিহিত। প্রণবটী প্রথমে অ-উ-ম্ এই তিন মাত্রাতে বিভক্ত হয়। ইহা হইতে ভূ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন মহাব্যাহৃতি জন্মে। তাহা গায়ত্রীর তিন চরণে পরিণত হয়। আট অক্ষরে এক চরণ। সুতরাং চতুর্বিংশতি অক্ষরে পূর্ণ গায়ত্রী ত্রিপদা নামে অভিহিত। তাহা হইতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকাল উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বৈদিক শব্দ হইতে কালক্রমে প্রয়োজনানুযায়ী নানাপ্রকার শব্দরাশি ও ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। প্রণব বাচ্য ও বাচক ভেদে বিবিধ। বাচক হইতে শব্দ এবং বাচ্যমাত্রা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। তাহা হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রকারান্তরে গায়ত্রীর প্রতি অক্ষর হইতে এক এক তত্ত্বরূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উদ্ভব এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বই জগদ্রূপে পরিণত। সুতরাং একমাত্র গায়ত্রীজ্ঞানে জগৎ ও তাহার অতীত চৈতন্য উভয়ই জানিতে পারা যায়।

শাস্ত্র বলেন—সন্ধ্যা-উপাসনা দ্বারাই দ্বিজাতি জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, অন্য দেবতা উপাসনার প্রয়োজন নাই। যথা—

"যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরূপাসিতঃ ॥
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ ॥"

"সন্ধ্যা এবং গায়ত্রী এই দুই রূপে একই। যিনি সন্ধ্যা উপাসনা করেন তাঁহার বিষ্ণু উপাসনা করা হয়। আজীবন সন্ধ্যা-উপাসনাকারী দ্বিজের পদধূলিতে বসুন্ধরা পবিত্র হন। সন্ধ্যাপূত তেজস্বী দ্বিজ জীবন্মুক্ত।"

আজকাল যেমন একটা কথা উঠিয়াছে—সন্ধ্যা করিলে কি হয়? কতকগুলি শব্দমাত্র, তাহার অর্থ কিছুই বোঝা যায় না, অথচ উচ্চারণও কঠিন, সুতরাং ঐ সব অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা মনে মনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই তিনি শুনিতে পাইবেন। সুতরাং তাহাই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহা পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং সংসর্গের ফল; এইরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বকালীন কোন দ্বিজাতিসন্তানের মনে উদিত হইত, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজকাল যেমন বালকের জন্মমাত্রেই পিতামাতা তাহাকে ইংরাজীবিদ্যায় অভিজ্ঞ করিতে যত্ন করেন, পূর্ব্বকালে তদ্রূপ বেদ এবং তৎপ্রতিপাদ্য গায়ত্রী শিক্ষাদানই পিতামাতার একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। সুতরাং তাহারা কখনও ভাবিতে পারিতেন না যে সন্ধ্যা করিলে কি হয়? বৃদ্ধবয়সে ঐ সব অনুষ্ঠান করিতে বসিলেই এতাদৃশ প্রশ্ন মনে আসা অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলেন, যে গায়ত্রী জপ করে সেই ব্রাহ্মণ। সুতরাং সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার। ইহাও একপ্রকার অযৌক্তিক কথা। কারণ তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অভ্যস্ত হইয়া, নিজেকে বিদ্বান্ মনে করেন এবং সেই বিদ্যা উপার্জ্জিত ধনে ধনী হইয়া কাহাকেও নিজ সমকক্ষ বিবেচনা করেন না। তজ্জন্য ঐ বিদ্যা ও ধনের বলে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব দূরে থাক্, মনুষ্যোচিত গুণগ্রামে তাহারা ভূষিত, ইহা স্বীকার করিতেও

অধিকাংশ স্থলে আপত্তি থাকে। জন্মগত ও গুণগত জাতিই পূর্ণ ব্রাহ্মণত্বের কারণ। অনেক স্থলে জন্মগত বিশিষ্টতা অপেক্ষা গুণগত বৈশিষ্ট্যও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যাহাতে গুণ এবং জন্ম দুইই আছে, তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই হীন হইবে। যে সমস্ত বালক ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজী-বিদ্যাভিজ্ঞ, তথাকথিত পণ্ডিতকুলের ও সম্মানের পাত্র হন এবং পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা সেই বালকের তোষামোদ করিতে থাকেন। ইহা দ্বারা জন্ম কিরূপে গুণকে অতিক্রম করে, তাহা দেখান হইল। সেইরূপ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ-মাত্রই, তাহার পৈতৃকসম্পত্তি বেদে অধিকার জন্মে, অন্যান্য সাংসারিক বস্তুর ন্যায় দৈহিক বল বা লেখনীর সাহায্যে তাহা কাহারও অধিকার করার সুযোগ নাই। কারণ উহার কোন ভাষান্তর করিলে প্রকৃত বস্তুর তথ্য মিলিবার উপায় নাই। তাহা গুরুগত এবং অনুভবজাত জ্ঞান। সুতরাং অন্যের পাইবার আশা নিষ্ফল।

কেহ কেহ বলেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া গায়ত্রীচ্ছন্দে লিখিত গায়ত্রীমন্ত্র দর্শন করেন। এই সব প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারপ্রণালী এইরূপ—রাজা রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে অযোধ্যার রাজা ছিলেন এবং রাবণ বধ —প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য করিয়া যান। এখন কেহ রামচন্দ্রনামধারী তথায় রাজা হইলে তিনিই সেই রামচন্দ্র হইবেন, এরূপ আবিস্কার বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে ও বশিষ্ঠাদি মুনিগণ গায়ত্রী জপ করিয়া সিদ্ধ হন, ইহাই পরম সত্য। সুতরাং বিশ্বামিত্র-দৃষ্ট গায়ত্রী না বলাই সঙ্গত। বরং গায়ত্রীসাধনায় স্বীয় ইষ্ট সিদ্ধি না হওয়ায় তিনি শাপ প্রদান করেন, তাহার কিছু ঐতিহাসিকতা পাওয়া যায়। গায়ত্রীদ্রষ্টা ঋষি অন্য বিশ্বামিত্র। যাহা হউক যাহার যাহা ইচ্ছা বলিতে থাকুন।

সত্য মেঘাবৃত হইলেও একদিন তাহা প্রকাশিত হইবে। আমরা জানি আরও সপ্তবিংশতি কলিযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাও অতীত হইবেই। পুনরায় সত্যযুগে সমুদয় জীবন্মুক্ত ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া বেদমন্ত্রাদি লাভ করিবেন। তাঁহারা শুধু সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। বর্ত্তমান উদারতার হুজুগে যতই একাকার হউক না, বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কাহারও না কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইবেই। এখনও কিছু আছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"সর্ব্বাবস্থোঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ।
ব্রাহ্মণ্যান্ন তু হীয়তে অন্যজন্মগতোঽপি সন্॥"

"ব্রাহ্মণ নানাজাতির সংমিশ্রণে পড়িয়া যদি নানাপ্রকার কুকর্ম্মে রত হইয়া পড়েন, তথাপি সন্ধ্যা উপাসনাহীন না হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না। পুনরায় জন্মান্তরে সেই ভাব লাভ করিয়া নিকৃষ্ট ভাব হইতে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হন।" তাই ব্রাহ্মণজন্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া মনু বলিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে!
উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তি ধর্ম্মস্য শাশ্বতী॥
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।"

"ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন (ধনে নহে)। বিপ্রের উৎপত্তিটী ধর্ম্মের স্থায়ী মূর্ত্তিস্বরূপ। কারণ তিনি ধর্ম্মার্থ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মে পরিণত হইতে সমর্থ হন।" মূল বৃক্ষের সহিত তদীয় শাখা প্রশাখার যেরূপ সম্বন্ধ আছে, মূল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সহিত আমাদের তদ্রূপ সম্বন্ধ আছে। সেই সন্ধি স্থান আমাদের হৃদয়। কারণ, তাঁহার হৃদয় হইতে আমাদের হৃদয় নিঃসৃত হইয়াছে। "হৃদি অয়ং হৃদয়মি"তি শ্রুতি। মনোমধ্যে যে স্থান হইতে ইচ্ছার সঞ্চার হয় তাহার নাম হৃদয়। সুতরাং

আমরা সেই ইচ্ছা অবলম্বন করত মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, স্বীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারি এবং তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া গায়ত্রীতত্ত্বরূপ পরমাত্মাকেই নিজ আত্মা বলিয়া জানিতে পারি। তিনি যে প্রকার গতি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বা জগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, আমরা তাহার বিপরীত গতিতে ব্রহ্মে উপনীত হইবার জন্য তদ্দৃষ্ট গায়ত্রীমন্ত্রাদি আশ্রয় করত সেই ভাব পাইতে পারি। ঋষিরাও সেইরূপে ঋষিত্ব লাভ করিবার জন্য, অপ্, অগ্নি, সূর্য্যপ্রভৃতি দেবতাগণ দর্শন করিয়াছিলেন। আমরাও তদ্রূপ অভ্যাস করিতে করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও কতকটা সমর্থ হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ঐ সব দেবতাদর্শন তান্ত্রিক মন্ত্রের ন্যায় সামান্য প্রয়োগে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি নিয়মিত সংখ্যানুযায়ী উপাংশু জপ দ্বারা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার দর্শন হয় এবং তদ্দ্বারা নানাপ্রকার ঐহলৌকিক কার্য্যসিদ্ধির সহায়তা করে। কিন্তু বৈদিক মন্ত্র উপাংশু জপ দ্বারা তদ্রূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাহার উদ্দেশ্য তদ্রূপ নহে। এইবার আমরা সন্ধ্যা-উপাসনা দ্বারা কিরূপে সেই অবস্থা লাভ করিতে পারি, তাহাই দেখাইতেছি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গায়ত্রী-উপাসনার প্রণালী।

বৈদিকসন্ধ্যার প্রথম অঙ্গ স্নান। স্নান ভিন্ন ঐ সব কার্য্যে অধিকার জন্মে না। বর্ত্তমান সময়ে জলবায়ুর গুণে এবং বংশানুক্রমিক বীর্য্যহীনতার ফলে সকলে যেরূপ দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ত্রিকাল স্নান দূরে থাকুক, একবার স্নানেরই সামর্থ্য অনেকের নাই। শাস্ত্রে আরও চারি প্রকার স্নানের উল্লেখ আছে। যথা—

"স্নানানি পঞ্চ পুণ্যানি কীর্ত্তিতানি মনীষিভিঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ॥
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমবগাহ্যং তু বারুণম্।
আপোহিষ্ঠেতি তদ্ ব্রাহ্মং বায়ব্যং রজসা স্মৃতম্ ॥
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে।
তত্র স্নানে তু গঙ্গায়াং স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥"

পরাশর-সংহিতা

"বিদ্বদ্‌গণ পঞ্চপ্রকার স্নানকে পুণ্যজনক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আগ্নেয়, বারুণ, বায়ব্য, ব্রাহ্ম ও দিব্য। ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে মার্জ্জনা করার নাম আগ্নেয়, জলে অবগাহন করিয়া স্নানের নাম বারুণ, "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা মস্তকে জলসেচনের নাম ব্রাহ্ম স্নান, বায়ু দ্বারা প্রবাহীকৃত গোরুর পদোত্থিত ধূলি দ্বারা শরীর ডুবাইলে তাহাকে বায়ব্য স্নান বলে, এবং সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিতে যে বৃষ্টি হয়—তাহাতে স্নান করাকে দিব্য স্নান বলে। এইরূপ স্নানও গঙ্গাস্নানের তুল্য।"

প্রাণায়াম দ্বারাও এইরূপে শারীরিক মল দূর করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক মন্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, মন্ত্রের ছন্দঃ, কোন দেবতার উদ্দেশে তাহা প্রযুক্ত এবং কি জন্য তাহার প্রয়োগ হয় তাহা জানিয়া লইতে হয়। নতুবা তাহার কোন ফল হয় না, ঋষি স্মরণ দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় রূপেই তাঁহার সাহায্য লাভ হয়। কারণ তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্য স্মরণে, নিজের হৃদয়ে বল আসে এবং তাঁহার স্বরূপচিন্তনে তদ্ভাবে ভাবিত হইবার আশা করা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের আদেশে যেরূপ রোগ এবং ঔষধ নির্ণয় করত উপযুক্ত ঔষধ, উপযুক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিতে পারিলে দেহ রোগশূন্য হইয়া দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হয়; তদ্রূপ দেবতা, বিনিয়োগ এবং ঋষিজ্ঞানে সেই পদবীতে আরূঢ় হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহার সহিত ছন্দঃও জানা চাই। কারণ কোন শব্দ কোন বস্তুর আকর্ষক হইলেও, বাক্যের উচ্চারণগুণেই তাহার আকর্ষণক্রিয়া সমাধা হয়। যেমন 'তু' এই শব্দ দ্বারা কুকুর আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যে কোনরূপ উচ্চারণ দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ বৈদিক মন্ত্র ও ছন্দঃ অজ্ঞাত হইলে ফলদায়ক হয় না। সন্ধ্যার কয়েকটী বিভাগ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে করিতে জল লইয়া বিন্দু বিন্দু জল ধীরে ধীরে স্বীয় মস্তকে, ভূমিতে ও তৎপরে শূন্যদেশে সেক করিবে, ইহার ফলে শারীরিক এবং মানসিক মল দূরীভূত হইবে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরে ঋষ্যাদিস্মরণপূর্ব্বক প্রাণায়াম। ইহা হঠযোগের প্রাণায়াম নহে। ইহাতেও পূরক, কুম্ভক ও রেচক তিন ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে। প্রথমতঃ উভয় নাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিতে হইবে এবং নাভিদেশে রক্তবর্ণ ব্রহ্মার ধ্যান করিতে করিতে, সপ্তব্যাহৃতি ও প্রণব-যুক্ত গায়ত্রীসহ গায়ত্রীশিরঃ পাঠ করিবে। পরে শ্বাসরোধ করত হৃদয়দেশে নীলোৎপলসদৃশ বিষ্ণুকে চিন্তা করত পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে

কুম্ভক করিবে। ইহার পর ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ললাটে শ্বেতবর্ণ শম্ভুর ধ্যান করত বায়ুরেচন করিবে। প্রত্যেক ব্যাহৃতির সহিত এক একবার প্রণব উচ্চারণ করিবে। গায়ত্রীর পূর্ব্বে ও গায়ত্রীশিরের পূর্ব্বে ও পরে প্রণব উচ্চারণ করিবে। এইরূপ একবার প্রাণায়ামে দশবার করিয়া প্রণবজপের ব্যবস্থা আছে। নিত্য প্রাণায়াম এতাদৃশ, ইহা দ্বারা দৈনন্দিন পাপক্ষয় হইয়া যায়। ইহা ছাড়া পাপবিশেষের নিবৃত্তির নিমিত্ত তিন, দ্বাদশ বা ষোড়শ প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে।

প্রাণায়াম ও মার্জ্জন দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর ক্ষালনের ব্যবস্থা করা হয়। তার পর তিন সন্ধ্যায় তিনরূপে আচমনের ব্যবস্থা দ্বারা অপ্-দেবতার স্মরণ করা হয়। তদ্দ্বারা রাত্রিকৃত পাপ, সংসারে দ্রব্য উপার্জ্জন-জনিত পাপ এবং ভোজ্যবস্তুগত দোষ এবং দিবাজনিত পাপ, তিন সময়ের তিন প্রকার আচমনের দ্বারা দূর করা যায়।

অঘমর্ষণ দ্বারা জগতের উৎপত্তি তৎসহ নিজের উৎপত্তি চিন্তা করিতে করিতে স্বরূপ উপলব্ধির সহায়তা করে। সুতরাং পাপকার্য্যের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যায়। অশ্বমেধযজ্ঞের দোষক্ষালনের জন্য অবভৃথস্নানের যে ফল, এই মন্ত্র দ্বারা তাহা লাভ হয়। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে —আচমন, মার্জ্জন, ও অঘমর্ষণ এই তিন ক্রিয়া যোগীদিগের প্রত্যাহার-ক্রিয়ার অনুরূপ। তাঁহাদের প্রত্যাহার অন্য বস্তু হইতে মনঃ আকর্ষণ করিয়া এক বস্তুতে নিবেশের চেষ্টা, আর সন্ধ্যার প্রত্যাহার জগৎতত্ত্ব চিন্তা করত আত্মতত্ত্বে প্রবেশের চেষ্টা ও মন্ত্র দ্বারা জলে পাপস্থাপন করত তাহাকে মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করা।

ইহার পর সূর্য্যোপস্থাননামক ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়। সূর্য্যোপস্থাননামক অঙ্গটী ঋষিদিগের ভাষায় উল্লেখ করা যাইতেছে। কারণ মন্ত্রদ্রষ্টার ভাব ও ভাষা স্বতন্ত্র। ইহা কতকটা যোগীদিগের ধারণাক্রিয়ার অনুরূপ। যোগীরা

যে কোন বিষয়ের ধারণা করেন, উহা শরীরের চক্রাদিতেও হইতে পারে, অথবা বাহ্য কোন বস্তুবিশেষের দ্বারাও হইতে পারে। তাঁহারা যে যখন কোন বস্তুতে চিত্ত স্থির করিতে যত্ন করেন, তখন সেই বস্তুতে মনোনিবেশ করিতে করিতে এমন অবস্থা হয় যে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় একাকার হইয়া যায়, সেই অবস্থার নাম কাঁচা সমাধি বলা যাইতে পারে। এই সমাধি যদি আত্মতত্ত্বে হয়, তবে তাহার নাম পাকা সমাধি। পূর্ব্বোক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধিনামক অঙ্গত্রয় এক বস্তুর উপর অভ্যস্ত হইলে, পরে অন্য বস্তুতে অভ্যাস করা হয়। এইরূপে তত্তদ্‌বস্তুসম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান জন্মে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমা ধারণা করা যোগীদিগের পক্ষে যতটা সহজ, এই প্রকার সূর্য্যে ধারণা তাঁহাদের পক্ষে তত সহজ নহে। সাধারণের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান সূর্য্য একটী জড়পিণ্ডমাত্র। সুতরাং সূর্য্য ধারণা দ্বারা তাঁহারা থালার মত গোলাকার জ্যোতিঃপিণ্ডকে মনে করেন, কিন্তু যথার্থ সূর্য্যের সত্তা তাহা নহে। উহা সূর্য্যের বাহ্য প্রকাশমাত্র।

যোগানুষ্ঠানকারীরা সূর্য্যকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র একটী পদার্থ মনে করেন, কিন্তু সন্ধ্যোপাসনায় আপনাকেই সূর্য্য বলিয়া ধারণা করিতে হয়। দৃশ্যমান সূর্য্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিয়া মনে মনে মন্ত্র স্মরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে 'চিত্রং' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকেই স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত পদার্থের আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই মন্ত্রগত ভাবসমুদয় হৃদয়ে উন্মেষ হইলেই জ্ঞান উদয় হইল বলা যায়। ইহার কারণ সূর্য্যকে জগতের আত্মা বলা হইয়াছে এবং আমিও জগৎ ছাড়া এই বলিয়া তাঁহাকে নিজের আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে পারি। সুতরাং ইহা দ্বারাই রাজযোগ সাধিত হইল, বলা যায়। ইহাই সূর্য্যের অধ্যাত্ম বা সর্ব্বাত্মভাব। এই ভাব উপলব্ধি সহজসাধ্য নহে। কিন্তু আমরা ইহার অধিদৈবভাব উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে যে রূপ আকাশ এবং সূর্য্যমণ্ডলাদির বর্ত্তমান আছে, আমাদের

সকলেরই অন্তরাকাশে ঐরূপ সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা কোন রূপেই তাহা দর্শন করিতে পারিলেই দেখিব যে, দেহাভ্যন্তরস্থিত সূর্য্যই রশ্মিরূপে সমুদয় স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া সমুদয় শারীরিক এবং মানসিক শক্তির অনুভবের মূলে রহিয়াছেন। সেই আত্মরূপী সূর্য্যরশ্মিসমূহ দেহ হইতে অপসৃত হইলেই আমরা তাহাকে মৃত বলিয়া অভিহিত করি। দেবতাদি সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বপুঃ ধারণ করিয়া সূর্য্যরূপে প্রথমে উদ্ভূত হন। ইনি সকলের প্রথম বলিয়া ইঁহার নাম আদিত্য। সকল জীবের প্রাণরূপে স্থাবর ও জঙ্গমের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ইনি নিজেকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যদিও বাহিরে নানা প্রকার নাম ও রূপে আমরা বহু পদার্থ দেখিতে পাই, তথাপি এই সমুদয় তাঁহারই বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি এইরূপে জগতের ভিতর বাহিরে পূর্ণ থাকায় এবং জগতের নিয়ামক হওয়ায়, তাঁহাকে সবিতা বলা যায়।

মানুষ যেরূপ কোন সং দেখাইবার জন্য নিজের সমস্ত শরীর আবৃত করে, কিন্তু তাহার চক্ষুঃ দুইটী অনাবৃত রাখে এবং তদ্দ্বারা সমস্ত বস্তু দর্শন করে। তদ্রূপ তিনিও স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় সত্তা আবৃত রাখিয়া, একটী মাত্র ছিদ্র রাখিয়াছেন যদ্দ্বারা এই চিত্র সম্যক্ দর্শন করিয়া থাকেন। এই আধিভৌতিক ভাবই আমরা দেখিতে পাই। যত দিন সাধক আধিদৈবিক ভাব নিজ অন্তঃকরণে প্রস্ফুটিত না দেখিবেন, তত দিন বাহ্য সূর্য্য দর্শন করত সূর্য্যোপস্থান ক্রিয়া করিবেন। এইরূপ অভ্যাসকালে নিজেকে পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী না ভাবিয়া জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যরূপে চিন্তা করিবেন।

যিনি বরাবর এইরূপ অভ্যাস করিতে পারিবেন, তিনি মরণান্তে সূর্য্যলোকে গমন করিবেন।

"সদৈবমুপতিষ্ঠেরন্ সৌরৈঃ সূক্তৈরতন্দ্রিতাঃ।
যে বসন্ত্যত্র তে বিপ্র বিপ্রা ভাস্করসন্নিভাঃ।।"

"যে ব্রাহ্মণেরা নিয়ত এইরূপে সৌর সূক্ত দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করেন, তাঁহারা মরণান্তে সূর্য্যতুল্য হইয়া সূর্য্যলোকে বাস করেন।" যাঁহারা পূর্ব্বে এইরূপ সূর্য্যোপস্থান দ্বারা সূর্য্যলোকে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলা হয়। এই সূর্য্যোপস্থানের পর মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদের তর্পণ করিতে হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে—মন্দেহনামক একজাতীয় রাক্ষস, সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মাদি দেবগণকে আক্রমণ করিতে যায়, তাহাদের বলক্ষয় এবং দেবতাদিগের পুষ্টির নিমিত্ত জল দ্বারা তাঁহাদের তর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর ন্যাস—

সূর্য্যোপস্থানে সাধক আপনাকে সূর্য্যরূপে চিন্তা করেন, সুতরাং তিনি স্বর্গ, অন্তরীক্ষ এবং মর্ত্ত্য নিজ তেজে ব্যাপ্ত দেখেন—এইরূপে তিন ব্যাহৃতি দ্বারা যেরূপ জগৎ ব্যাপ্ত দেখা যায়, তদ্রূপ স্বীয় অঙ্গও তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। বাচকমাত্রাতে প্রণব হইতে যেরূপ তিনটী ব্যাহৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, বাচ্যমাত্রাতে হৃদয় হইতে তেমনই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"প্রণবো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ অঙ্গানি হৃদয়াদয়ঃ।"

গায়ত্রীস্থ প্রণব ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ ইহারা জীবের হৃদয়, শিরঃ এবং শিখা অঙ্গস্বরূপে গণ্য হয়। তদনুসারে প্রণবকে হৃদয়ে ন্যাস করিয়া 'ভূ' নামক ব্যাহৃতিকে শিরোদেশে, "ভুবঃ"কে শিখাস্থানে ও "স্বঃ" কে সর্ব্বগাত্রে ন্যস্ত করা যায়। সুতরাং গায়ত্রীকে নিজ শরীরেই নিহিত করা হইল। মন্ত্র জপ দ্বারা এই অবস্থাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, অথবা তথায় পৌছিতে হইবে। সুতরাং গায়ত্রীর ভাষান্তর করিয়া কোন প্রকারই ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

গায়ত্রী মন্ত্র আদি পুরুষ ব্রহ্মার হৃদ্গত ভাবের পরিচায়ক। এই মন্ত্র গুরুর নিকট জ্ঞাত হইয়া তাহার অর্থচিন্তারূপ গাঢ় ধ্যানে নিবিষ্ট হইতে

হইবে। তদবস্থায় যে অলৌকিক তত্ত্ব নিষ্কাশিত হইবে, উহাকেই গায়ত্রীর অর্থ বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রকার জপের দ্বারাই সিদ্ধি হয় বলিয়াছেন। যথা—"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।"

"জপ হইতেই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।" এতদ্বিষয়ে নরসিংহপুরাণে বর্ণিত আছে যথা—

"ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদম্।
শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ ॥"

"মন্ত্রের অক্ষরশ্রেণীকে অন্তরে স্থাপন করত বুদ্ধি দ্বারা কোন্ বর্ণ টী কাহার বাচক এবং মন্ত্রের কোন্ পদে কোন পদার্থকে বুঝাইয়া থাকে, এইরূপ ভাগে ভাগে অর্থ করিয়া শেষে সমুদয় মন্ত্রটির কি অর্থ দাড়াইয়াছে, এতাদৃশ ভাবে চিন্তার অভ্যাসকে মানস জপ কহে।" অন্যচ্চ—

"ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্।
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥"

"মন্ত্রকে বর্ণ, স্বর ও পদ অনুসারে মুখে উচ্চারণ করা গিয়া থাকে। তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি কতকগুলি অক্ষরমাত্র। তাদৃশ অক্ষরশ্রেণী মুখে পাঠ না করিয়া অর্থোপলব্ধির জন্য বুদ্ধি দ্বারা যে স্মরণ করা হয়, তাহাই মানসিক জপ বলিয়া কথিত আছে।" মহর্ষি অত্রি বাচিক, উপাংশু ও মানসিক জপের সূক্ষ্মরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

"ধ্বনির্ব্বোষ্ঠবিকারেণ নিশ্বাসোপাংশুলক্ষণঃ।
নির্ব্বিকারেণ বক্ত্রেণ মনসা মানসঃ স্মৃতঃ ॥"

"ওষ্ঠস্পন্দনপূর্ব্বক যে জপ তাহাকে বাচিক, অন্যে শুনিতে না পায় এমন ভাবে জিহ্বা ও ওষ্ঠাদি সঞ্চালনপূর্ব্বক জপ করাকে উপাংশু জপ বলা যায়। অত্রির মতে তাহাও বাচিক জপের অন্তর্গত। সেরূপ না করিয়া নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক গতিতে, মন্ত্রের পদস্বরূপ কল্পনা করত জপ করাকে

উপাংশু জপ বলে। তাদৃশ চঞ্চলভাব অতিক্রম করত মনের স্থৈর্য্য লাভ হইলে তদবস্থায় নির্ব্বিকার অন্তঃকরণে অর্থমাত্র উপলব্ধিপূর্ব্বক যে জপ, তাহার নাম মানসিক জপ।"

এক্ষণে বুঝিতে হইবে—চিত্তবৃত্তি স্থির করার জন্য যোগশাস্ত্রের মত একটী পদার্থে মনঃসংযোগ করার উল্লেখ নাই, কারণ তাহা হইলে গায়ত্রীর ধ্যানে ত্রিসন্ধ্যাতে গায়ত্রীর ত্রিমূর্ত্তির ধ্যান উল্লেখ না করিয়া এক প্রকার ধ্যান করিতেই আদেশ করা হইত। বাস্তবিক বৈদিক যোগের উদ্দেশ্য মনোলয় নহে, পরন্তু বস্তুর স্বরূপজ্ঞান। সুতরাং গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা তাহার অর্থ উপলব্ধি করাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়। এখানে 'ধীমহি' শব্দ এতদর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা সবিতৃ-দেবতার 'ভর্গঃ' অর্থাৎ তেজঃ বা শক্তিকে চিন্তা করিতে হইবে, মূর্ত্তিবিশেষ নহে। এই শক্তি বা সামর্থ্যকে বেদান্তে মায়া, সাংখ্যে প্রধান, স্মৃতিতে প্রকৃতি, তন্ত্রে আদ্যা শক্তি ও বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ তেজঃ (গায়ত্রী) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রলয়ান্তে এই শক্তি রজোগুণময়ী হইয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি কার্য্যে ব্রতী হন অর্থাৎ জগদাকারে আপনাকে বিকাশ করেন, ইহাই তাঁহার বালভাব ব্রহ্মরূপ। যতদিন এই জগৎ প্রকাশ থাকে, এবং তাহার ক্রিয়া-কলাপ সুশৃঙ্খলার সহিত বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ইহার যৌবনভাব বা সত্ত্বগুণময়ী পালন অবস্থা—ইহাই বিষ্ণুরূপ। শক্তি যখন পুনরায় জগৎকে প্রলয়রূপে আপনার ভিতরে লুকাইয়া ফেলেন, তখন তাঁহার তমোময় রুদ্রভাব বুঝিতে হয়। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সহিত আমাদের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাই ত্রিসন্ধ্যায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অবস্থা স্মরণ করাইয়া তাহার অতীত প্রদেশে চৈতন্যসত্তায় পৌছাইবার নিমিত্ত ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি চিন্তা দ্বারা এ সমুদয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা এতাদৃশ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম

করিতে অক্ষম, তাহারা তিনকালে তিন প্রকার মূর্ত্তি চিন্তা করিবে, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। গীতাতে ব্রহ্মার দিবাকে সৃষ্টি এবং রাত্রিকে প্রলয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বে প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"

"অব্যক্ত অবস্থা হইতে যখন জগৎ ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে অর্থাৎ যখন জগৎকে বাক্য, মনঃ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তখন তাহাকে ব্রহ্মার দিবা বলা যায় এবং যখন ব্যক্তাবস্থা পুনরায় বিপরীত গতিতে অব্যক্তাবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাহাকে রাত্রি বলা যায়।

সেই ব্যক্তা ব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতিকে সবিতার বরেণ্য ভর্গঃ বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। অব্যক্ত অবস্থা বাক্য ও মনের অগোচর, সুতরাং ব্যক্ত জগৎ প্রকৃতির দৃশ্যমান দেহ। এই দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়নামক তিনটী অবস্থা ধরিয়া, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক নামে গায়ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি— গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী—এই তিন নামে ভাগ করা হইয়াছে। রূপ চিন্তা করিলে রূপের অতীত বস্তুর চিন্তা আসিতে পারে না, তজ্জন্য বিচারের দ্বারা তাহার অতীত সত্তা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। মানস জপে স্থূল ভাব পরিত্যক্ত হইয়া সূক্ষ্মভাবে পৌঁছাইয়া দেয়, সুতরাং মানস জপেই তাহা সাধিত হয়, এইরূপ বলা যাইতে পারে।

আমরা দেখিলাম শক্তির সাধনাই সন্ধ্যার উদ্দেশ্য, কিন্তু আধারভিন্ন আধেয় আমাদের ধারণার অতীত। ক্রিয়া দ্বারাই—তাহার ভিতরে শক্তি আছে, আমরা অনুমান করিয়া লই, সুতরাং প্রকৃতির এই ক্রিয়াযুক্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়করী শক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নামে অভিহিত হন। তাই যাহারা প্রকৃত সত্তা ধারণা করিতে অক্ষম, সন্ধ্যাসাধনের নিমিত্ত তাহাদিগের জন্য এই ত্রিমূর্ত্তি ধ্যানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"ভবতো যঃ পরং রূপং তত্ত্বং জানাতি কশ্চন।
"অবতারেষু যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ॥' ৪ অঃ।

আপনার যে পরম রূপ তাহা কেহই জানে না—সুতরাং দেবতাগণও আপনার অবতাররূপের চিন্তা করেন।" অবতাররূপ দ্বারা এই বুঝা যায় যে রূপ সাধকের বা ভক্তের ধারণানুযায়ী, ভাবাতীত অবস্থা হইতে ভাবগম্য অবস্থায় অবতীর্ণ হয়।

ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর যে ত্রিমূর্ত্তির ধ্যান কথিত আছে, তাহাও এতাদৃশ। যেরূপ আমরা নিশাবসানে জাগরিত হইয়া স্বীয় স্বীয় সংস্কার অনুযায়ী গত দিবসীয় অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অবশিষ্ট অংশ সম্পাদনে ব্রতী হই, সেইরূপ প্রলয়কালে সমুদয় জীব সংহার করিয়া, তাহাদের সংস্কারসমষ্টি গ্রহণ করত প্রকৃতি নিদ্রিত ছিলেন, কল্পাবসানে পুনরায় স্বীয় উদর হইতে জীব ও তাহার সংস্কারসমষ্টিকে নিস্কাসন করত নব নব সৃষ্টি বিকাশ করিতে থাকেন ও পূর্ব্বকল্পীয় অবশিষ্ট কার্য্য যেন সমাধা করিতে থাকেন—ইহাই প্রাতঃকালীন গায়ত্রীর ধ্যানের ভাব।

মধ্যাহ্ন সময়ে প্রত্যেক জীবই যেমন স্বীয় শরীরপোষণের নিমিত্ত নানা চেষ্টায়, আপন উদর পূরণ করিয়া বলের সম্যক্ বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ প্রকৃতি এই জগতের পালনের নিমিত্ত যে বিষ্ণুরূপ ধারণ করত প্রতিপ্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্যক্ কার্য্যক্ষম করিয়া সমুদয় জগতের পালনের ব্যবস্থা করেন, তাহাই মধ্যাহ্নকালীন সাবিত্রীরূপা গায়ত্রীর ধ্যানের ভাব।

সমস্ত দিন আমরা নানা কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হই, এবং সন্ধ্যা অবসানে যেরূপ সমুদয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করি, প্রকৃতি যেন সেইরূপ সমুদয় জগৎব্যাপার কল্পাবসানে রুদ্রমূর্ত্তিতে

সংহার করিয়া স্বীয় অব্যক্তাবস্থায় বিশ্রামের জন্য উপনীত হন। ইহাই সন্ধ্যাকালীন সরস্বতীরূপা গায়ত্রীর ধ্যানের ভাব। এই তিন কালের অতীত যে পদার্থ, তাহা গায়ত্রীর "ভর্গঃ" চিন্তায় সাধিত হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"ভৃজিঃ পাকে ভবেদ্ধাতু র্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ।
ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি"।।
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ।
ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ ভর্গঃ স উচ্যতে।।
ভেতি ভাজয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তে প্রজাঃ।
'গ'ইত্যাগচ্ছতেঽজস্রং ভরগো ভর্গ উচ্যতে।।
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্ব-ভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি।।
হৃত্থাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে।।"

"ভৃজ্ ধাতুর অর্থ পাক করা. (পাক বলিতে রন্ধন বুঝায়, এখানে পাক অর্থে পরিণত করা, যেমন কর্ম্মবিপাক বলিতে কর্ম্মপরিণাম বুঝিতে হয়) যে তেজঃ, বা শক্তি দ্বারা জগতের পরিণাম হয়, যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া প্রকাশ পায় ও যাহা অন্তিমে কালাগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সপ্তজিহ্বা ও সপ্ত রশ্মিদ্বারা জগৎ হরণ করে. অর্থাৎ যাহা স্বয়ং জগদ্রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সেই তেজঃ বা শক্তিই ভৃজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'ভর্গঃ' বলিয়া কথিত হয়। 'ভ' কার দ্বারা লোকদিগকে ভাজন অর্থাৎ উপযুক্ত করা বুঝায়, 'র'কার দ্বারা পালন এবং 'গ'কার দ্বারা অজস্র গতি বুঝায় ; সুতরাং ভ, র ও গ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন বুঝাইল। সূর্য্যমধ্যে যে "ভর্গঃ" বা জ্যোতির বিদ্যমানতা দ্বারা সূর্য্য হইতে চতুর্দ্দিকে রশ্মিজাল বিকীর্ণ হইতে

দেখা যায়, সেই "ভর্গঃই" সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে জীবরূপে অবস্থান করিয়া প্রাণীদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। সাধকেরা স্ব স্ব হৃদয়ে যে অঙ্গুষ্ঠাকার, জ্যোতীরূপী জীব বলিয়া উপলব্ধি করেন, সেই "ভর্গঃ ই" বহিরাকাশে আদিত্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই জন্য ধ্যান করিবার সময় সেই "ভর্গঃ" চিন্তা করিতে হয়। এখানে ভর্গকে জীব বলিয়া বুঝা গেল। সাধনার চরম অবস্থায় তাহাকেই পরমাত্মা বলিয়া জানা যায়। ইহারই নাম ব্রহ্ম-জ্ঞান। গায়ত্রীর মন্ত্রচিন্তার নাম স্থুল ধ্যান এবং মন্ত্রার্থ দ্বারা সূক্ষ্ম ধ্যান সম্পাদিত হয়।

"স্থুলং মন্ত্রময়ং বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু মন্ত্রবর্জ্জিতম্।"

গায়ত্রীর স্থুল এবং সূক্ষ্মভাব অধিকারী ভেদে উভয়ই চিন্তনীয় এবং উভয় অবস্থাই 'ভর্গঃ' বলিয়া কথিত। গায়ত্রীধ্যানে তাঁহার বরেণ্য 'ভর্গঃ' চিন্তা করিতে হয়। মন্ত্র হইতে মন্ত্রার্থ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং মন্ত্রকে অবরেণ্য 'ভর্গঃ' এবং মন্ত্রার্থকে বরেণ্য 'ভর্গঃ' বুঝিতে হইবে। অন্য দিকে সেইরূপ 'ভর্গের' সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রভাবকে যদি বরেণ্য ভর্গঃ মনে করি, তবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ক্রিয়ার অবসানে যে সুষুপ্তির অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য ও অব্যক্ত অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে ইহার কারণ অবস্থা বলা যায়। এই কারণ অবস্থা হইতে অর্থাৎ সাম্যাবস্থা হইতে ব্যক্ত জগতের উদ্ভব, সুতরাং আমাদেরও উৎপত্তিস্থান। সুতরাং ব্যক্তাবস্থার কারণ সেই অব্যক্তাবস্থাই সকলের কারণ হইল, এমতাবস্থায় ব্যক্তাবস্থাকে বরেণ্য 'ভর্গঃ' না বলিয়া তাহার কারণরূপ অবক্তাবস্থাকেই বরেণ্য ভর্গঃ বলিতে হইবে এবং তাহাই গায়ত্রীর অর্থ বলিয়া স্থির হইল। আমরা গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিয়া সবিতৃদেবতার ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা রূপ বরেণ্য ও অবরেণ্য দুইটী ভাব পাইলাম। এখন প্রকৃত সবিতৃদেবতার অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ, অগ্নি হইতে অগ্নির

দাহিকা শক্তির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। একই বস্তু দুইরূপে প্রকাশ পায়। যখন দাহ্য বস্তু না থাকে, তখন তাহা প্রকাশরূপে বর্ত্তমান এবং ঐ শক্তি তখন সংহত, ইহাই তাহার বরেণ্য অবস্থা এবং যখন তাহা বস্তুসংযোগে সক্রিয়, তাহাই তাহার অবরেণ্য অবস্থা। সুতরাং চৈতন্যময় পুরুষ বরেণ্য 'ভর্গঃ' এবং জড় হইল অবরেণ্য 'ভর্গঃ'; পুরুষের কোন সময়েই কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই, জগতের হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে। ইহা দ্বারা দৃশ্যমান জড়ের মূল শক্তিকেই চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ স্থির করা গেল।

বহু জন্ম-জন্মান্তরের চেষ্টার ফলে এই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং একদিনে এরূপ জ্ঞান হইবে, এরূপ আশা করা বৃথা। বৃহদ্‌যম সংহিতায় বলিতেছেন—

"ন তথা বেদজপ্যেন পাপং নির্দ্দহতি দ্বিজঃ।
যথা সাবিত্রীজপ্যেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

"ব্রাহ্মণ একমাত্র সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিয়া যেমন সর্ব্ব পাপ দূর করিতে পারেন, সমস্ত বেদমন্ত্রজপেও তত দূর কৃতকার্য্য হন না।" অতএব সন্ধ্যার অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটী হইলেও গায়ত্রী জপের দ্বারা তাহার সমুদয় দোষ দূর হইতে পারে। দ্বিজাতিগণের সন্ধ্যাবন্দনা এবং অন্যের যোগাভ্যাসের চরম ফল যে একই, তাহা শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা সংক্ষেপে বুঝান গেল। জপের সম্পূর্ণ ফল শৌচ, সত্যাদি তপস্যার ফলে লাভ হয়। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর ও মনের মলিনতা নষ্ট হয়। তজ্জন্য জপাদির অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে তাহা অবশ্য করণীয়, নতুবা সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চিত্তের স্বচ্ছতালাভই সাধনার উদ্দেশ্য।

বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলে চিত্তের মলিনতা অবশ্যম্ভাবী। যাহার মনে বিষয়াকাঙ্ক্ষা প্রত্যাহরণ করিবার সামর্থ্য আছে, এবং যিনি বিষয়-নাশেও ব্যাকুল হন না, তাঁহার মানসিক প্রসন্নতা এবং তজ্জনিত স্বচ্ছতা-লাভ সম্ভব। মনের এতাদৃশ অবস্থা হইলে মননের সামর্থ্য আসে। কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপ হৃদয় গ্রন্থিগুলি আত্মতত্ত্ব-ধ্যানের বিশেষ পরিপন্থী। ঐ গুলির ফলে চিত্তের ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় এই তিনটী অবস্থা আনয়ন করে। সুতরাং মানসিক তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে ঐ গ্রন্থিগুলির সম্যক্ উচ্ছেদ পূর্ব্বেই করিতে হইবে।

গীতা বলেন ঃ—"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥" ২১।১৬

"নরকের দ্বার এবং আত্মনাশের কারণ তিনটী—কাম, ক্রোধ, এবং লোভ। সুতরাং এই কয়টী ত্যাগ করিতে হইবে।"

বস্তুবিশেষলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার নাম লোভ এবং কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধরূপ ধারণ করে। যথা—গীতা—

"ধ্যায়তঃ বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাদ্ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২।২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩।২

"বিষয় ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে সঙ্গ (আসক্তি) হয়, সঙ্গ হইতে কাম, কাম বাধা পাইয়া ক্রোধ, ক্রোধের উৎপত্তিতে হিতাহিত-

জ্ঞানশূন্যতা, সুতরাং স্মৃতিশক্তির ভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইলে, বুদ্ধিশূন্য হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়।" বাস্তবিকই সংসারে সঙ্গের মত দুঃখদায়ক আর কিছুই নাই। শাস্ত্র বলেন—

"সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্ব্বীত সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥"

"সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ পরিত্যাজ্য, অসমর্থ হইলে সৎসঙ্গ করিতে হইবে। কারণ সৎসঙ্গ, ভগবৎপ্রসঙ্গ ও জ্ঞানালোচনা দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা দূরে যায়।" যদি তীব্র ইচ্ছাসংযুক্ত হয় তবেই সৎসঙ্গে ফল লাভ হইবে, নতুবা সঙ্গও নিষ্ফল হয়।

ভাগবত বলেন—"সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য্যসংবিদঃ
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

"অর্থাৎ সাধুসঙ্গে ভগবদৈশ্বর্য্য ও জ্ঞানের আলোচনা হয়। উহা হৃদয় এবং কর্ণের রসায়ন। উহা শ্রবণ করিতে করিতে মোক্ষপথে শীঘ্র শ্রদ্ধা, আসক্তি এবং ভক্তি বাড়াইয়া দেয়। নানা প্রকার ব্যাধিপীড়িত মানব যেরূপ ঔষধাদি পরিত্যাগ করত রসায়ন সেবন করে ও হৃতস্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করে, তদ্রূপ সাধুসঙ্গ দ্বারা ত্রিতাপতাপিত জীবের ক্রমশঃ সমুদয় তাপ দূর হইয়া, শান্তির বিমল আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়।" সাধুসঙ্গ দ্বারা মানসিক মলিনতা দূর হইলে সঙ্গও পরিত্যাগ করত ভগবচ্চিন্তায় বা আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করিতে হইবে। যতই সঙ্গ কর না কেন, মনন, নিধিধ্যাসন ভিন্ন বস্তুলাভ অসম্ভব। মননাদি অভ্যাসকালে সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। নতুবা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া মনের একাগ্রতা নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

নারদ-ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন :—"দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ"।

বাস্তবিকই দুঃসঙ্গ বা বিষয়সঙ্গের মত সর্ব্বনাশের হেতু আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। কামরূপ বিষয়লালসা জীবের এত বলবতী যে, তাহারা অন্ধ হইয়া উহাকেই অতি উপাদেয় এবং একমাত্র প্রার্থনার বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই দুষ্পুর কাম যে আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা সামান্য বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। কাম ব্যাহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয় এবং ক্রোধের যে ভীষণ পরিণাম, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। সুতরাং উহার পরিণাম দর্শন করিয়া দূর করিবার ঔষধগুলি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

কামদমনের উপায়—যখনই মনে কোন কামনার উদয় হইবে, যখনই কিছু পাইবার ইচ্ছা হইবে, তখনই অমনি চিন্তা করিবে যে আমি যাহা চাই সে জিনিষটা কি? উহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? পাইলে আমার লাভ কি এবং না পাইলে ক্ষতি কি? পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয়েই এইরূপ আলোচনা করিলে উহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইবে, সুতরাং উহার বিষক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যদ্রূপ ভূতগ্রস্ত রোগী যখনই জানিতে পারে যে, তাহাকে ভূতে গ্রাস করিয়াছে, তখনই আর ভূত থাকিতে পারে না; তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর পরিণাম দর্শন করিলেই আর তাহাতে আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অন্যান্য বহু উপায় থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা ইহারই অধিক এবং অন্যান্য সমুদয় উপায় ইঁহারই সহকারী।

ক্রোধদমনের উপায় :—

যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া যায়, সেই ক্রোধ আমার প্রতি কেহ করিলে আমার কি অবস্থা হয়, এইরূপ চিন্তা ক্রোধদমনের প্রকৃষ্টতর উপায়।

লোভ এবং মোহ দমন করিতে হইলে—কামেরই মত লোভ ও মোহের

স্বরূপ চিন্তা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতিরেকে 'আমি কে', 'আমার কে' এবং 'আমি কাহার,' এই কয়টী চিন্তাই ঐ রিপুদ্বয় নাশে বিশেষ সমর্থ।

নিজ অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত স্বীয় অবস্থার হীনতা পর্য্যালোচনা করিলেই, মদ ও মাৎসর্য্যরূপ রিপুদ্বয় নিবারিত হইতে পারে। যতদিন মানুষ ইহার কাহারও দাস থাকিবে, ততদিন তাহার দ্বারা প্রকৃত সাত্ত্বিক কার্য্য কিছুই হইবে না। কিন্তু অনেক স্থলে সত্ত্বগুণের অবস্থা আমরা ভীরুতা বা আলস্যের সহিত সমশ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। ভারতবাসী অতিরিক্ত সত্ত্বগুণী হইতে যাইয়া একটী ভীরু, কাপুরুষ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপ তেজঃ যে ক্রোধ নহে, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন কেহ কিছু অন্যায় করিলে বা অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিলে আমরা তাহাকে সমর্থন করি এবং তাহাতে বাহবা দিয়া থাকি। আমরা বলি, ও সব আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, উহা চিত্তে বিক্ষেপ আনিয়া দেয়। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? সমাজে অন্যায় কার্য্য বাধা না পাইয়া, সমাজ এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, আর বেশী দিন সমাজ থাকিবে এরূপ ভরসা হয় না। মনু বলেন—

"ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেৎ তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদে ধর্ম্মবিৎ ॥"

অর্থাৎ "ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিড়ালব্রতী, বকব্রতী এবং বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকে জলপর্য্যন্ত দিবেন না।"

যদি সংসারের কোন কার্য্য না করিতাম, বা চিত্তবিক্ষেপকর কোনরূপ কার্য্যে মনোনিবেশ না করিতাম, তাহা হইলে এরূপ বলা অসঙ্গত হইত না। কিন্তু যখনই অধর্ম্ম ধর্ম্মের বেশে সামনে দাঁড়াইবে, যখনই অন্যায় কার্য্য ন্যায়ের আকারে প্রকাশ পাইবে, তখনই আমরা বলি—যাহা হইবার হউক,

ঈশ্বর তাহার বিচার করিবেন। আমাদের ঐ বিষয়ে চিত্ত চঞ্চল করার প্রয়োজন নাই। যাঁহার কাজ তিনি ঠিকই করিতেছেন ইত্যাদি। কিন্তু ঐ অন্যায় বা অধর্ম্মের ফল যদি নিজে ভোগ করিতে হয়, তখনই চক্ষুঃ ও কর্ণ স্থির হইয়া পড়ে। ইহা সত্ত্বগুণের বা তমোগুণের লক্ষণ, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু স্বীকার করিলেই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, তন্নিমিত্ত তাহারা সুবোধ বালকের মত অস্বীকার করিয়া বসে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন যে—বকব্রতী ও বিড়ালব্রতী ব্যক্তিকে বাক্যের দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না, কারণ তাহারা ধর্ম্মের গ্লানিস্বরূপ। বকব্রতী এবং বিড়ালব্রতীর লক্ষণ এতাদৃশ—

"ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ॥"

"যো বহুজনসমক্ষং ধর্ম্মমাচরতি স্বতঃ পরতশ্চ লোকে খ্যাপয়তি তস্য ধর্ম্মঃ ধ্বজং চিহ্নমেবেতি ধর্ম্মধ্বজী, লুব্ধঃ পরধনাভিলাষুকঃ, ছলেন ব্যাজেন চলতীতি ছাদ্মিকঃ, লোকদম্ভকঃ নিঃক্ষেপাপহারাদিনা জনবঞ্চকঃ, হিংস্রঃ পরহিংসাশীলঃ, সর্ব্বাভিসন্ধকঃ পরগুণাঽসহনতয়া সর্ব্বাক্ষেপকঃ।" অর্থাৎ বহুজনসমক্ষে ধর্ম্ম আচরণ করত নিজে বা পরের দ্বারা লোকের নিকট প্রচার করে এতাদৃশ – ধর্ম্মধ্বজী, পরধনাভিলাষী, কপটব্যবহারী, জনবঞ্চক, অন্যের প্রতি হিংসাশীল এবং যে ব্যক্তি পরের গুণ সহ্য করিতে না পারিয়া যাহা ইচ্ছা বলে, বিড়ালের ন্যায় চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া থাকে এবং লোকের সর্ব্বনাশ করে তাহাকে বিড়ালব্রতিক কহে।" বকব্রতী যথা মনু—

"অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ॥"

"অধোদৃষ্টি নির্জবিনয়খ্যাপনায় সততমধঃ এব নিরীক্ষতে। নিকৃতি র্নিষ্ঠুরতা তয়া চরতীতি নৈষ্কৃতিকঃ, স্বার্থসাধনতৎপরঃ শঠঃ বক্রঃ। মিথ্যা-

বিনীতঃ কপটবিনয়বান্। অর্থাৎ নিজের বিনয়খ্যাপনের নিমিত্ত যে সর্ব্বদা নীচের দিকে তাকাইয়া থাকে, পরের অনিষ্টাচরণই যাহার কাজ, স্বীয় স্বার্থ যে কোন উপায়ে পুরণ করে, মুখে যাহা বলে কাযে তাহা করে না, বিনয়ের সহিত কপটতাই যাহার সম্বল, এবং বক যেমন মৎস্যভক্ষণের নিমিত্ত অতি সন্তর্পণে পদপ্রসারণ করে, তদ্রূপ স্বকার্য্যসাধনে যে ব্যক্তি অতি অভিজ্ঞতা সহ ব্যবহার করে ও যাহার উদ্দেশ্য শুধু অন্যের সর্ব্বনাশ করা, এরূপ ব্যক্তিকে বকব্রতী বলে।"

এই সমুদয় লক্ষণযুক্ত বকব্রতী এবং বিড়ালব্রতী ব্যক্তিদিগের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না রাখা বা তাহাদের অনুকূলতা না করা ও যাহাতে কেহ না করে তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। নতুবা দশলক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম অচিরেই সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে। ধর্ম্মের লক্ষণ দশটী এইরূপ—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

"সন্তোষ, ক্ষমতাসত্ত্বেও অপরাধসহনশীলতা, মনোনিগ্রহ, কাহারও দ্রব্য চুরী না করা, মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা (সাবান নহে) শরীরের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, আত্মজ্ঞান, সত্য ও তাড়িত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হওয়া—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।"

বর্ত্তমান সময়ে অনেকে ধার্ম্মিক ও ভগবন্নিষ্ঠ বলিয়া পূজা পাইতেছেন, কিন্তু ইহার একটীও লক্ষণ তাঁহাদের নাই। যদি থাকিত তবে বাহ্য শৌচের ফলে, তাঁহাদের স্বশরীরপোষণের চেষ্টা দূরীভূত হইয়া অন্যশরীর-সঙ্গরূপ কাম থাকিত না। অন্তঃশৌচের ফলে সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া রজস্তমোরূপ মনোমল নষ্ট হইত। অস্তেয়প্রতিষ্ঠার ফলে, ইচ্ছামাত্র সর্ব্ববিধ রত্ন অমনিই উপস্থিত হইত। সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে অমোঘ বাক্‌রূপ বর ও

অভিশাপাদির সামর্থ্য আসিত। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ভক্তির আতিশয্যে একেবারে সব ছাড়িয়া বচনসম্বল দীন হীন কাঙ্গাল সাজিয়াছেন এবং বেদকে উড়াইয়া দিতেছেন। যাঁহাতে এই গুণগুলি লক্ষিত হইবে তিনি ধার্ম্মিকনামের উপযুক্ত, নতুবা গলাবাজী করিয়া বা লোকের সমক্ষে বাজী দেখাইবার সামর্থ্য থাকিলে ধার্ম্মিক আখ্যায় অভিহিত করা যায় না। যিনি ধার্ম্মিক হইতে অভিলাষী, তিনি নিজের ভিতর এই গুণগুলির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিলেই স্বীয় ধার্ম্মিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তাঁহার অহমিকা চূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং তিনি নিজের মানসিক অবস্থার উন্নতি সাধন করত সাধনার অন্যান্য অঙ্গগুলি অভ্যাস করিবার উপযুক্ত হইবেন।

ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় হইলে তদুপরিস্থিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা যদ্রূপ দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানের উপযুক্ত দৃঢ়ভূমি প্রস্তুত হইলেই অন্যান্য সাধনসামগ্রী উপস্থিত হয়, এবং সেই গুলির পরিপক্কাবস্থায় চিরদুঃখের নিবৃত্তিরূপ শান্তি উপস্থিত হইয়া মানবকে জগৎসংসারের বরেণ্য ও মহান্ করিয়া তুলে। তাহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া, আরও শত শত ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারী সর্ব্ববিধ দারুণ দুঃখের আগার এই সংসারকে গোষ্পদের তুল্য ক্ষুদ্র মনে করিয়া অনায়াসেই শান্তিধামে যাইতে সমর্থ হন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পাতঞ্জল মতে সাধনা।

জ্ঞানলাভের যতগুলি সাধনপ্রণালী আছে, তৎসমুদয় আলোচিত হইল ; এইবার তাহার অন্তরঙ্গ এবং সমুদয় তপস্যার শ্রেষ্ঠ প্রাণায়ামসম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলির মত আলোচনা করা যাইতেছে।

অন্তরঙ্গ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। দুইটী শ্লোকে তৎসমুদয় বলা যাইতেছে।

"ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণম্।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনম্॥ ১৯
চতুর্থং সমতাভাবঃ পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারঃ সপ্তমং নৈব বিদ্যতে॥" ২০ শিবসংহিতা।

"নিশ্চয়ই হইবে এইরূপ বিশ্বাস সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। শ্রদ্ধা দ্বিতীয়, গুরুপূজা তৃতীয়, সমতাভাব চতুর্থ ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মিতাহার, ইহার সপ্তম লক্ষণ নাই।"

মনু বলেন—

"একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরঃ তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥"

"একাক্ষর পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সাবিত্রীমন্ত্র শ্রেষ্ঠ জপ্য এবং কাষ্ঠ মৌন অপেক্ষা সত্যকথন উৎকৃষ্ট।" এই শ্রেষ্ঠতপস্যারূপ প্রাণায়াম কি এবং ইহার ফলে কি লাভ করা যাইতে পারে তাহাই আলোচ্য। "প্রাণীতি অনেন প্রাণঃ" অর্থাৎ যদ্দ্বারা চালিত হয় তাহাই প্রাণ।" তাহারই সম্যক্ বিস্তার বা সংযমের নাম প্রাণায়াম। সাধারণ

দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই বহির্বায়ুর আকর্ষণ এবং আকৃষ্ট বায়ুর রেচনের দ্বারাই শরীরযন্ত্র ক্রিয়াশীল হয়। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যতিক্রমে রোগ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসহীনতায় মৃত্যু উপস্থিত হয়। দেহের যতগুলি যন্ত্র আছে, তদপেক্ষা ফুসফুসের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। তাহাই জড়বাদীদিগের জীবনীশক্তি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যোগীরা বলেন তাহা নহে—মুখ্য প্রাণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং তাহারই স্পন্দনে ফুসফুস-যন্ত্র ক্রিয়াশীল হয়, তাহার ফলে বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ, বিকর্ষণ ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া দেহকে সক্রিয় করিয়া তুলে। এইরূপ জগৎকে শরীর ধরিয়া লইলে তাহাকে চালনা করিবার নিমিত্ত ও এই প্রাণশক্তির অতিরিক্ত কিছুই আবশ্যক হয় না। সুতরাং আমরা নিজের দেহে অবস্থিত প্রাণকে জানিয়া যদি তাহা সংযত করিতে পারি, অথবা তাহার বিস্তারে জগতে একমাত্র প্রাণের ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে দৈহিক এবং জাগতিক যাবতীয় ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির ফল নিজে আয়ত্ত করিতে পারি। ইহাই তাঁহাদের অনুভবগম্য সত্য। এখন ইহাকে নিজের জীবনে যিনি যতটুকু কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন, তিনি ততটুকু সত্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। বাঁকিটুকু তাঁহার নিকট অসত্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব নাই, এরূপ নহে। যোগশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু মহর্ষি পতঞ্জলি এ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা এইরূপ—

"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।"

"আসনস্থৈর্য্যে সতি বাহ্যকোষ্ঠ্যবায়্বোরন্তর্বহির্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। ব্যাস।"

অর্থাৎ কোষ্ঠগত বায়ুর অন্তঃ এবং বহির্গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম।"
"আসন স্থির হইলে পর কোষ্ঠগত বায়ুর বাহিরের গতি-বিচ্ছেদ করিলে তাহাকে প্রাণায়াম বলে।"

এখানে মহর্ষি শ্বাস এবং প্রশ্বাস গতির বিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম বলিলেন। সুতরাং ইহা দ্বারা সাধারণে যাহাকে প্রাণায়াম বলে, তাহা ছাড়া অন্য কিছু বুঝা গেল।

"বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ।" "প্রাণায়ামশ্চতুর্বিধঃ। বাহ্যবৃত্তিরভ্যন্তরবৃত্তিঃ স্তম্ভবৃত্তিস্তুরীয়শ্চেতি। তত্র কোষ্ঠ্যস্য বায়োঃ রেচনেন বহির্গতস্য বহিরেব ধারণং বাহ্যবৃত্তিঃ স চ রেচকঃ। বাহ্যবায়োঃ পূরণেনান্তর্গতস্যান্তর্ধারণমভ্যন্তরবৃত্তিঃ স চ পূরকঃ। রেচনপূরণপ্রযত্নং বিনা প্রাণস্য কেবলবিধারকপ্রযত্নেন গতিবিচ্ছেদঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ স চ কুম্ভকঃ। নায়ং রেচকঃ, অন্তঃস্থত্বাৎ। নাপি পূরকঃ, তপ্তশিলাতলনিহিতজলবিন্দুবচ্ছরীরে প্রাণস্য সঙ্কুচিতত্বেন সূক্ষ্মত্বাৎ। যো হি স্থূলোঽন্ত র্নিরুদ্ধো দেহং পূরয়তি স পূরকঃ। তস্মাদ্রেচকপূরকাভ্যাসেন বিনা সকৃৎপ্রযত্নমাত্রেণ সূক্ষ্মপ্রাণস্য কুম্ভকশব্দিতস্য ঘটজলবৎ নিশ্চলত্বেন দেহেঽবস্থানাৎ কুম্ভকস্তৃতীয়ঃ সিদ্ধঃ। ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামো দেশকালসংখ্যাভিঃ দীর্ঘঃ সূক্ষ্ম ইতি পরিদৃষ্টঃ। তত্র রেচকস্য বাহ্যোদেশো বিষয়ঃ। প্রাদেশবিতস্তিহস্তাদি-পরিমিতো নির্বাতে নাসাগ্রে ইষীকাতুলাদিক্রিয়ানুমিতঃ। পূরকাদেস্ত্বান্তরো দেশ আপাদতলমস্তকং পিপীলিকাস্পর্শতুল্যেন স্পর্শেনানুমিতঃ। ক্ষণগণনয়া জ্ঞেয়ঃ কালঃ। মাত্রাগণনয়া জ্ঞেয়া সংখ্যা। স্বজানুমণ্ডলং পাণিনা ত্রিঃ পরামৃশ্য ছোটিকাঽবচ্ছিন্নঃ কালো মাত্রা। সা হি স্বস্থস্য পুংসঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাভ্যাং মিতা ভবতি। তত্র ষড়্‌বিংশতিমাত্রাভিরভ্যাসক্রমেণ দীর্ঘ ইতি দৃশ্যতে। অধিকদেশকালব্যাপিত্বং প্রাণনিরোধস্য দীর্ঘত্বম্। যথা যথা দীর্ঘ ইতি নিপুণেন দৃশ্যতে, তথা তথা প্রাণস্য সূক্ষ্মত্বেন দর্শনাদ্দীর্ঘ এব সূক্ষ্ম ইতি পরিদৃষ্টো ভবতীত্যর্থঃ।" মণিপ্রভাটীকা।

"ব্যাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপীশ্চতুর্থঃ।"

"উক্তো বাহ্যো দেশোবিষয়ঃ অভ্যন্তরবিষয়শ্চ হৃদয়নাভিচক্রাদিঃ, তয়োরা-

ক্ষেপঃ সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা পর্য্যালোচনং স যস্য পূর্ব্বকালেঽস্তি স চতুর্থঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ। তস্যাপি দীর্ঘসূক্ষ্মত্বং পূর্ব্ববৎ। ন চাস্য কুম্ভকান্তর্ভাবঃ শঙ্কনীয়ঃ। রেচকপূরকয়োরভ্যাসেন জিতবাহ্যাভ্যান্তরবিষয়নিশ্চয়ং বিনৈব সকৃৎপ্রযত্ন-মাত্রেণ স্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ। তন্নিশ্চয়পূর্ব্বকঃ স্তম্ভবৃত্তির্বহুপ্রযত্নসাধ্যস্তুরীয় ইতি বৈলক্ষণ্যাদিতি ॥

"প্রাণায়াম চারিপ্রকার যথা—রেচক, পূরক, কুম্ভক এবং তুরীয়বৃত্তি। কোষ্ঠ্যগতবায়ু যথাবিধি রেচনপূর্ব্বক বাহিরেই ধারণের নাম বাহ্যবৃত্তি বা রেচক। বাহ্য বায়ু অভ্যন্তরে পূরণ করত অন্তরে ধারণের নাম অভ্যন্তরবৃত্তি বা পূরক। রেচন ও পূরণের প্রযত্ন বিনা, কেবল ধারণরূপ প্রযত্ন দ্বারা যে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহার নাম স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক, ইহা রেচক নহে, কারণ—এই বৃত্তি অন্তরে স্থিত। ইহাকে পূরকও বলা যায় না, কারণ উত্তপ্ত প্রস্তরে অবস্থিত জলবিন্দু যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ প্রাণের সঙ্কোচন হেতু ইহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। যে বায়ু স্থূলরূপে অন্তরে নিরুদ্ধ দেহকে পূরণ করে, তাহার নাম পূরক। সুতরাং রেচক, পূরক অভ্যাস-ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রযত্নমাত্র দ্বারা ঘটে অবস্থিত জলের ন্যায় দেহে অবস্থিত সূক্ষ্ম প্রাণের যে কুম্ভক বা রোধ তাহার নাম কুম্ভক। এই তিনরূপ প্রাণায়াম দেশ, কাল এবং সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত হইয়া দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম আখ্যায় অভিহিত হয়। নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিত হইয়া বহিঃ নিঃসৃত রেচক বায়ুর গতি বহির্দ্দেশে প্রাদেশ, অর্দ্ধ হস্ত বা হস্তপর্য্যন্ত ধাবিত হয়, তুলা বা শক্তু দ্বারা তাহার পরিমাণ করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা দীর্ঘতা বা সূক্ষ্মতা অনুমিত হয়। পূরককালে পদতল হইতে মস্তকপর্য্যন্ত পিপীলিকার গতির ন্যায় অনুমিত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম অনুমান করা যায়। ক্ষণগণনার দ্বারা কাল অনুমিত হয়, এবং মাত্রাগণনা দ্বারা সংখ্যা অনুমিত হয়। তিনবার স্বীয় জানুদেশ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে যে সময় অতিবাহিত হয়,

তাহার নাম মাত্রা। সুস্থ ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারাই, উহার পরিমাণ হইয়া থাকে। এইরূপ ছাব্বিশ মাত্রার অভ্যাসের নাম দীর্ঘ প্রাণায়াম। কারণ দীর্ঘকালব্যাপী প্রাণনিরোধের নামই দীর্ঘ প্রাণায়াম। যতই প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হইতে থাকে, ততই প্রাণ সূক্ষ্মরূপে অনুভূত হয়।" এইবার তুরীয় প্রাণায়াম কথিত হইতেছে, যে প্রাণায়ামে অভ্যন্তরে, হৃদয়, নাভিচক্রাদি. সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আয়ত্ত হয়, তাহার নাম চতুর্থপ্রকার বা স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম। তাহারও দীর্ঘ-সূক্ষ্মতা পূর্ব্বরূপই হইবে। কিন্তু ইহাকে কুম্ভক বলিয়া মনে করা উচিত নহে। রেচক ও পূরক অভ্যাস দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয় নিশ্চয় বিনা সদ্যঃ প্রযত্ন দ্বারাই যে স্তম্ভবৃত্তিরূপ কুম্ভক উদিত হয়, তাহারই নাম চতুর্থ প্রাণায়াম। এই স্তম্ভবৃত্তিরূপ তুরীয় প্রাণায়াম বহুপ্রযত্নসাধ্য এবং পূর্ব্বকথিত তিন প্রকার প্রাণায়াম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।" শিবসংহিতাপ্রভৃতি গ্রন্থে যে প্রকার কুম্ভক বা প্রাণায়াম লিখিত আছে, উহা আধুনিক, পূর্ব্বতন ঋষিদিগের অনুষ্ঠিত নহে। উহার উপকারিতা যথেষ্ট থাকিলেও অনেকেই ঐগুলি পাতঞ্জলোক্ত যোগ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। তজ্জন্যই ইহা বিশেষরূপে বিবৃত করা গেল। এই চারি প্রকার প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে দোষের ক্ষয় হইয়া যায়। প্রাণায়াম দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু বদ্ধ হইয়া তেজঃ উৎপাদন করে এবং তদ্দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ জনিত দোষ সমুদয় নষ্ট করে। অবশেষে প্রাণের সূক্ষ্মতাহেতু চঞ্চল মনঃও সাধকের বশীভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং স্থির মনে সর্ব্ব বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ধারণার সামর্থ্য আসে। ইড়া, পিঙ্গলা ইত্যাদি ক্রমে যে প্রাণায়াম অভ্যস্ত হয়, তাহা পাতঞ্জলোক্ত প্রাণায়াম নহে। প্রাণবায়ুর অবস্থান হৃদয়ে, তদ্ভিন্ন আমরা শ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি তাহাকেও প্রাণ বলে। ঐ বাহ্য প্রাণবায়ুর গতি ফুসফুসপর্য্যন্ত এবং শ্বাসগ্রহণের সময়ে অন্য একটী বায়ু নাভি হইতে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত

হইয়া হৃদয়পর্য্যন্ত যায়, তাহার নাম অপান। এতদ্ভিন্ন যে বায়ু প্রশ্বাস দ্বারা রেচন করা যায় তাহাকেও অপান বলে। সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ দুই প্রকারে হইতে পারে। একপ্রকার কুম্ভকের দ্বারা অন্য প্রকার ভেক বা সর্পের ন্যায় জিহ্বা ঊর্দ্ধে স্থাপন দ্বারা। জিহ্বা ঊর্দ্ধ স্থাপনের ফলে ঐ সকল প্রাণী ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া রোধ করত দীর্ঘকাল অনাহারেও ক্লিষ্ট হয় না। যদি তৎকালে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের শরীরযন্ত্রের ঘর্ষণবশতঃ ক্ষয় জন্মাইয়া পূরণার্থ আহারের প্রয়োজন হইত, কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে তাহারা শীতকালে গর্ত্তেই বাস করে ও আহারের জন্য কোনপ্রকার চেষ্টা করে না। এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া যোগীরাও শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে আনীত সাধু হরিদাসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে ডাঃ ম্যাক্‌গ্রেগর প্রমুখ অনেক ইংরাজও তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহার ফুসফুসের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্থগিত ছিল। দ্বিতীয় প্রকার উপায়—শ্বাস রোধ করিয়া অর্থাৎ ধীরে ধীরে কাল ও মাত্রা স্থির রাখিয়া ক্রমাগত শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ করত শেষে দীর্ঘকালে শ্বাসরোধের ক্ষমতা জন্মে, যাহার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস ভিতরেই অস্তমিত হয়। এই পথটী সাধারণের নিকট পরিচিত, কিন্তু অনিয়মিত আহার-বিহারাদি দ্বারা ইহার সুফলের ভাগী কেহই হয় না এবং নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অচিরাৎ ভবলীলা সাঙ্গ করে এবং যোগের ফলে রোগই হয়—এইরূপ বলিতে অভ্যস্ত হয়।

প্রাণায়ামসম্বন্ধে গীতা বলেন—

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥　২৭।৫

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ম্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥" ২৮।৫

"বাহ্য বিষয়সকলকে বহিষ্কার করত নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিবে, এইরূপ অবস্থায় চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূমধ্যে স্থাপিত করিতে হইবে। মোক্ষকামী যিনি সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়, মনঃ এবং বুদ্ধিকে সংযত করেন ও ইচ্ছা, ভয় এবং ক্রোধমুক্ত হইয়া মননশীল হন তিনিই মুক্ত হন।" ইহাতে প্রাণায়ামরূপ তপস্যার মাহাত্ম্য অনুভব করা গেল, কিন্তু কেহ যেন অসংযত ও রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া শুধু প্রাণায়ামের ফলেই মুক্তি হইবে, এরূপ আশা না করেন। তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশী চেষ্টা বন্ধ্যার প্রসববেদনার ন্যায় নিরর্থক হইবে। তাহা ছাড়া এই সমুদয় ক্রিয়াদি উপযুক্ত ক্রিয়াবান্ গুরুর নিকট দীর্ঘকাল বাস করত শিক্ষা করা উচিত। নতুবা পুস্তকসাহায্যে অভ্যাস করা অতি বিপজ্জনক, অনেক সময় প্রাণহানির ও সম্ভাবনা আছে।

'ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্"।

"প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ প্রকাশশীলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য পিধানং ক্লেশপাপরূপং ক্ষীয়তে।" অর্থাৎ প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের ক্লেশ ও পাপরূপ আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়, সুতরাং আত্মা স্বমহিমায় প্রকাশিত হইবার অবকাশ পান।"

"ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।" "মনঃ ধারণার যোগ্য হয়।" অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা দোষের ক্ষয় হইলে সূক্ষ্ম লক্ষ্যে ধারণার নিমিত্ত মনের ক্ষমতা আসে।"

"স্ববিষয়াসংপ্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।' "ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখী না হইলে চিত্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকেই প্রত্যাহার বলে।"

"চিত্তশুদ্ধি হইলে শব্দাদি বিষয়ের মনঃ যুক্ত হয় না, বৈরাগ্য-

হেতু বিষয় হইতে মনঃ বিমুক্ত হইয়া তত্ত্বাভিমুখী হয়, সুতরাং চিত্ত আর বিষয়ানুকারী হইতে পারে না। মক্ষিকাসমুদয় যেরূপ মধুকররাজের উপবেশনে উপবেশন এবং প্রস্থানে প্রস্থান করে, তদ্রূপ চিত্তানুসারী ইন্দ্রিয়সমুদয় চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহারই নাম প্রত্যাহার।"

"ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।" প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়। রাবণ সীতা হরণ করিলেও, রামগত প্রাণ সীতার মনের কোন প্রকার চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই, কারণ—তাঁহার চিত্ত রামগত ছিল। তদ্রূপ প্রত্যাহারনামক অবস্থায়, রাগ, দ্বেষ দূর হইয়া ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে যোগীর আয়ত্ত হইয়া পড়ে, কারণ যখন চিত্ত অন্যান্য স্থান হইতে সংযত হইয়া আসে, তখন ধারণানামক যোগাঙ্গে যোগীর অধিকার জন্মে।

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।"

"স্থানবিশেষে চিত্ত বদ্ধ হইলে তাহাকে ধারণা বলে।"

সংপ্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধির নিমিত্ত হৃদয়, নাভি বা নাসাগ্রপ্রভৃতি স্থানে চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা। এই ধারণা হইতে ধ্যানাবস্থা আসে।

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"

"তথায় ক্রমাগত এক প্রবাহ উদিত থাকিলে—তাহাকে ধ্যান বলে"।

বিজাতীয় বৃত্তির পরিহারের চেষ্টা ধারণার অভ্যাসেও বর্ত্তমান থাকে। একজাতীয় বৃত্তি নিরবচ্ছিন্নরূপে চিত্তে উদিত হইলেই তাহার নাম ধ্যান এবং তাহা হইতেই সমাধি অবস্থায় উপনীত হয়।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।"

বিজাতীয় বৃত্তি বিচ্ছিন্ন চিত্তে ধারণা, অবিচ্ছিন্ন চিত্তে ধ্যান হয়। ধ্যেয়, ধ্যান এবং ধ্যাতার মধ্যে ধ্যেয়মাত্র স্ফূর্ত্তির নাম সমাধি। উহা দীর্ঘকাল হইলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায় এবং সমাধিপরিপাকে যখন চিত্ত ধ্যেয়-

কোন পদার্থ বর্ত্তমান থাকে না, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একই বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে সংযম বলা যায়।

"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।" ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একত্রে হইলে তাহাকে সংযম বলে। এই সংযমের কালে অর্থাৎ সংযম অভ্যস্ত হইলে সমাধিজাত আলোক নির্ম্মল হয় অর্থাৎ ভ্রান্তি-সংশয়াদিশূন্য ধ্যেয় তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। যথা—"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।" সংযম সিদ্ধ হইলে সমুদয় জ্ঞান হয়।

যোগের অন্যান্য অঙ্গ হইতে ধারণা, ধ্যান এবং সমাধিনামক অঙ্গ তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু ইহাও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গ। কারণ এই অসংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তে কোনও বিষয় থাকে না। তবে পূর্ব্বের গুলি অভ্যস্ত না হইলে পরের বস্তুটির ধারণাই আসে না।

এই সংযমের অভ্যাস দ্বারাই সাধকের সর্ব্ব প্রকার বিভূতি উদিত হইয়া থাকে। পৃথক্ পৃথক্রূপে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বস্তুর সংযমে নানা প্রকার বিভূতি প্রকাশ পায়।

দুই একটী বিভূতির দৃষ্টান্ত—যথা—

'ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্॥' ২৯

"ধ্রুবনামক নক্ষত্রে সংযম করিলে, তারকানিচয়ের গতিজ্ঞান হয় অর্থাৎ কোন গ্রহাদির কোন সময়ে কোন নক্ষত্রে উপস্থিতি হইবে, তাহা জানা যায়।

"কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসাবিনিবৃত্তিঃ।"

"কণ্ঠশব্দে গলদেশ, তাহাতে যে কূপ আছে তথায় সংযম করিতে পারিলে ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়।"

এই বিভূতিগুলির প্রতি যিনি অনাদরপূর্ব্বক আরও অগ্রসর হইতে চান, তাঁহার নিকট সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বপ্রভৃতি সামর্থ্য উপস্থিত হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—

"তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।"

"সেই বিশোকানামক সিদ্ধিকেও যিনি বৈরাগ্যবলে ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি কৈবল্যনামক মুক্তির অধিকারী হন।" কারণ তাঁহার পঞ্চ ক্লেশের বীজ ভ্রান্তিরূপ সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় এবং তাহার ফলে তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ঐরূপ অবস্থালাভের পূর্ব্বে কতকগুলি বিঘ্ন আসিয়া সাধককে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলে।

'স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।' ৫১

যোগী চারি প্রকার,—প্রথমকাল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ও অতিক্রান্তভাবনীয়। প্রথম—যাঁহারা সংযমে প্রবৃত্ত তাঁহারাই পরচিত্তাদি কিছুই জানেন না। দ্বিতীয়—যাঁহারা সম্প্রজ্ঞাতযোগে মধুমতীনামক চিত্তভূমি ও ঋতম্ভরা অর্থাৎ সত্যপ্রকাশকারী জ্ঞানাবস্থা লাভ করিয়া ভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তৃতীয়—যিনি ভূতেন্দ্রিয়জয়ী সুতরাং মহেন্দ্রাদি দ্বারা অক্ষোভ্য। চতুর্থ—যিনি তিন ভূমি হইতে বিরক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়াছেন। আদ্য যোগীর দেবতা দ্বারা নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্যতা নাই। দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত যোগীকে স্থানীয় দেবতারা তথায় নানারূপ সুখভোগের প্রলোভন দেখাইতে থাকেন, কিন্তু তিনি যদি ক্ষণবিধ্বংসী ক্লেশ ও অন্ধকারময় সেই সমুদয় সুখ অনিত্য চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চলমতি হইয়া সমাধিতে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে ত্রিগুণে আর তাঁহাকে পাতিত করিতে পারে না, সুতরাং তিনি কৃতকৃত্য হন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঈশ্বর

আমরা ক্রমশঃ সমুদয় সাধনাগুলি ও তাহার ফলপরিপাকে কৈবল্যাবস্থা-পর্য্যন্ত কিরূপে যাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করিলাম। মহর্ষি বলিতেছেন যে, এই উপায় ভিন্ন ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাও সমাধি সিদ্ধি হয়—

"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।"

ঈশ্বরে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ভক্তিবিশেষ হইতে সমাধি লাভ অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তাহার ফলাফল সম্যক্ ঈশ্বরে নির্ভর করিতে পারিলেই তদীয় কৃপায় চিত্তের অবিশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া সমাধি লাভের উপযোগিতা আসে। এইবার ঈশ্বর কাহাকে বলে, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

পূর্ব্বে এই ঈশ্বরসম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে। কেহ বলেন ঈশ্বর আছেন, কেহ বলেন নাই। তাঁহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বমধ্যে আমরা অস্তিত্বই স্বীকার করি। কারণ তিনি নাই এরূপ প্রমাণ নাই। কেহ প্রমাণ করিতেও পারেন না। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পঞ্চম বেদাত্মক পুরাণ এবং তাহা ছাড়া যুক্তি দ্বারাও এই ঈশ্বর সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে।" ইহা অথর্ব্ববেদীয় প্রমাণ, অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব বস্তু সামান্য এবং বিশেষরূপে জানেন, যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা, যাহা হইতে নাম, রূপ এবং অন্ন জন্ম গ্রহণ করে তিনি ব্রহ্ম।

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। যদিদং ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরমস্মি।"

অর্থাৎ যিনি ভূমা পুরুষ বা মহান্ তাঁহাকে পাইলেই সুখী হওয়া যায়, অল্পব্যাপী পদার্থে সুখ নাই, সুতরাং সেই সর্ব্বব্যাপী মহান্‌কেই জানিতে হইবে। এই দহরনামক পুরে ব্রহ্ম অবস্থিত, যাহাতে অষ্টদল পদ্ম এবং আকাশ অবস্থিত, তথায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহাই জ্ঞাতব্য বস্তু।" ইহাই সামবেদের উক্তি।

"পুরুষ বা এবেদং……"

"এই সমুদয় পুরুষ যাহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং হইবে, ইনি অমৃতদাতা, যাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।" যজুর্ব্বেদের উক্তি।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

"যাঁহাকে বাক্য নিরূপণ করিতে পারে না, মনঃও যাঁহার নিকট যাইতে পারে না, তিনিই উপাস্য।"

এই সমস্ত বেদোক্ত প্রমাণের দ্বারা যাঁহার কথা বলা হইল, তিনিই ঈশ্বর। ইঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আপত্তি উঠিলেও গগনকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় তিনি অলীক নহেন। কারণ—একই বস্তুকে বুঝাইতে যাইয়া সকলেই নিজ নিজ সংস্কার বা যুক্তির অনুযায়ী বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী বিভিন্ন হইলেও বস্তুর অস্তিত্বসম্বন্ধে সকলেই একমত। যদিও তিনি প্রাকৃত মনোবুদ্ধির গোচর নহেন, তথাপি তিনি নাই এ কথা বলা যায় না। কারণ—রাম ঘরে নাই বলিলে অন্য কোথাও আছে বুঝিতে পারা যায়, তাহার অস্তিত্বে কোনও সন্দেহ আসে না। তদ্রূপ ঈশ্বর এখানে নাই বা সগুণ একদেশব্যাপী বা নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী যিনি যাহাই বলুন, কেহই তাঁহার সত্তা অস্বীকার করেন না। অনেক কারণে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সুতরাং সেই সমুদয় কারণ অপসারিত করিলে যদি তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি না হয়,

তবে অস্বীকার করা যাইতে পারে। তাঁহাকে উপলব্ধি করার জন্য সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই উপদেশ অনুযায়ী দীর্ঘকাল সাধনার বলে বাধাগুলি অপসারিত হইলেই, মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় তিনি স্বপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হন। বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে নেতি নেতি বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করেন। সাংখ্যকার কপিলের—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" প্রমাণাভাবাৎ।

এই সূত্র অবলম্বনে অনেকে বলেন ঈশ্বর নাই, তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যদি তাঁহার ঈশ্বর নাই এইরূপ বলার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে তিনি "ঈশ্বরাভাবাৎ' এইরূপ সূত্র রচনা করিতেন। কিন্তু তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, জগৎকর্ত্তা সগুণ ঈশ্বর অস্বীকার করিয়া জগতের উৎপত্তি এবং মুক্তি নির্ণয় করা যায়। নির্গুণ পুরুষই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। মহর্ষি জৈমিনিও কর্ম্মের প্রাধান্য-স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া, খামখেয়ালী অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিচারবুদ্ধিতেও একটী আধার ভিন্ন কোন বস্তুই দাঁড়াইতে পারে না, সুতরাং আধাররূপী ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়, উহা নির্গুণ বহুপুরুষই স্বীকার করা যাউক অথবা এক পুরুষই স্বীকার করা হউক। ধনুর্বিদ্‌গণ যেরূপ প্রথমে স্থূল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য স্থির করত, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুতে লক্ষ্য স্থির করে, তদ্রূপ সাধারণ কর্ম্মপরায়ণ স্থূল-বুদ্ধিগণ কর্ম্মফলদাতা সগুণ ঈশ্বরনামধারী বহুদেবতার উপাসনা করে এবং তাহাদিগকেই ঈশ্বর বলিয়া জানে। কারণরূপে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কার্য্যরূপে জগদাত্মা ঈশ্বর। জাগ্রত অবস্থায় কার্য্যরূপে সগুণভাব—অবলম্বনকারী এবং সুষুপ্ত অবস্থায় অব্যক্ত সত্তায় অধিষ্ঠিত পুরুষ একই বলিয়া উক্ত হন। মহাপ্রলয়ে যিনি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ, তিনিই সৃষ্টিকালে জগৎরূপে সৃষ্ট। তন্তুভিন্ন পটের যেমন অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ তিনি ভিন্ন

জগতের অস্তিত্ব নাই। তিনিই নামরূপে ব্যাবহারিক সত্তায় প্রতীয়মান এবং তিনি পারমার্থিক রূপে এক ও অখণ্ড, আবার আধার-ভেদে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান। তাঁহা হইতে রজ্জুতে সর্পের মত জগতের উৎপত্তি, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব লোপ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

জগতে চেতন পদার্থ ভিন্ন শুধু জড়ের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা প্রকাণ্ড গৃহ দেখিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বহুপুরুষকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে ইহা অনুমিত হইল। জগৎ বলিতে পঞ্চভূত ও প্রাণিসমূহের বিচিত্র সমাবেশ ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না। পূর্ব্বোক্ত অনুমানসহায়তায় সর্ব্ব বস্তুর সিদ্ধিতেই কর্ত্তার প্রয়োজন হয়। যদি কেহ বলেন জগতের কর্ত্তৃত্বে বহুপুরুষ স্বীকার করা যাউক, তাহাতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, কারণ বহুকর্ত্তার মনে যুগপৎ বহুপ্রকার ইচ্ছার উদ্রেক হইলে শৃঙ্খলা-সহকারে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না সুতরাং এক কর্ত্তাই উপপন্ন হয়; তাহা ছাড়া প্রাণিমাত্রই অল্পজ্ঞ, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ কেহ আছেন ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে। সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই ঈশ্বর, তিনি সর্ব্ব জীবের অদৃষ্ট জ্ঞাত আছেন, তদনুযায়ী তাহার ফল প্রদান করেন। তজ্জন্য যদি কেহ শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহাকে নিজ সদৃশ করিয়া লন, সুতরাং সেও মুক্ত হয়। জ্ঞানলাভের ইহা অতি সুগম পন্থা বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

যোগবিঘ্ন ও তন্নিবারণের উপায়।

মূর্খতাবশতঃ বা হঠকারিতাপ্রযুক্ত যাহারা যোগশাস্ত্রীয় নিয়মাবলী পালন করিতে অসমর্থ, তাহাদের বাধির্য্য, জড়তা, মূকত্ব, স্মৃতিবিলোপ, অন্ধতা ও সদ্যোজ্বর ঘটিয়া থাকে। প্রমাদবশতঃ এই সমুদয় দোষ উপস্থিত হইলে, তাহার চিকিৎসার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

উত্তমরূপে উষ্ণীকৃত যবাগূ স্নিগ্ধ করিয়া ভক্ষণ বা উদরে ধারণ করিবে। ইহা দ্বারা বাত, গুল্ম, উদাবর্ত্ত (পেট ফাঁপা) আরোগ্য হইবে। মনঃ অস্থির হইলে মহাশৈল ধারণ করিবে। বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইলে বাক্য ধারণা করিবে। শ্রবণশক্তির বিনাশ হইলে শব্দতন্মাত্র ধারণা করিতে হইবে। এইরূপ যে যে অঙ্গে ব্যাধি উপস্থিত হইবে, সেই সেই দেহে তদুপকারিণী ধারণা করিতে হইবে। উষ্ণ হইলে শীতল এবং শীত হইলে উষ্ণ ধারণা করিবে। স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইলে আকাশ, পৃথিবী, বায়ু ও অগ্নি ধারণা করিবে, অথবা শিরোদেশে একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপনপূর্ব্বক অন্য একখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা তাহার উপর ধীরে ধীরে আঘাত করিবে, তাহা হইলে লুপ্ত স্মৃতির উদয় হইবে। কোনরূপ ভৌতিক পদার্থ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বায়ু ও অগ্নি ধারণা করিবে। এইরূপে শারীরিক বিঘ্নগুলি দূর করিলে আত্মা প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকিবেন। সেই সময়ে যোগীর অন্য প্রকার অনেক উপসর্গ উপস্থিত হয়। যথাসম্ভব তাহাদের নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা সিদ্ধির আশা তিরোহিত হইয়া যায়। সেই সময়ে নানা প্রকার কামনা ও বাসনা যোগীর হৃদয়ে জাগরূক হয়। স্ত্রী, দানফল, বিদ্যা,

মায়া (ইন্দ্রজাল) দিব্যধন, দেবত্ব, অমরত্ব, রসায়নসিদ্ধি, শূন্যে গমন, জল ও অগ্নিপ্রবেশ, শ্রাদ্ধ ও দানাদির ফল লাভে আকাঙ্ক্ষা, উপবাস, জলাশয়-খনন, দেবতা অর্চ্চন প্রভৃতিতে মনঃ আসক্ত হইয়া পড়ে। যদি তিনি মনকে তত্তদ্‌বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন, তবেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব, নতুবা এখানেই তাঁহার সকল সাধনা তিরোহিত হইয়া যায়। এই সকল উপসর্গ বিজিত হইলে পুনরায় নূতন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগের মধ্যে প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম ও আবর্ত্ত এই পাঁচটী উপসর্গ যোগ-সাধনার অতীব বিঘ্ন। যদ্দ্বারা নিখিল বেদার্থ, সমস্ত কাব্যশাস্ত্রার্থ, যাবতীয় বিদ্যা এবং শিল্প যোগীর চিত্তে প্রতিভাত হয়,—তাহার নাম প্রাতিভ। যদ্দ্বারা যাবতীয় শব্দের অর্থ বোধগম্য হয় এবং সহস্র যোজন দূরস্থিত শব্দও শ্রুতিগোচর হয়, তাহার নাম শ্রাবণ উপসর্গ।

যাহা দ্বারা মূর্ত্তিমান্‌ দেবের ন্যায় সর্ব্বদিকেই দর্শন করেন, তাহার নাম দৈব। যদ্দ্বারা যোগীর চিত্ত সমুদয় আধার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিরালম্বভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে, তাহার নাম ভ্রম। যাহার প্রভাবে জলাবর্ত্তের ন্যায় আকুল হইয়া জ্ঞানাবর্ত্ত চিত্তকে বিনাশ করে, তাহার নাম আবর্ত্ত। এই সমুদয় উপসর্গই যোগীর যোগসম্পত্তির নাশকারক, সুতরাং মনকে পরব্রহ্ম চিন্তায় নিমজ্জিত করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। নিরন্তর জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগী পুরুষ ভূরাদি সপ্তপ্রকার সূক্ষ্ম বিষয় শিরোদেশে ধারণ করিবেন। ধরিত্রীকে ধারণা করিলে, তাহা হইতে সপ্ত প্রকার সুখ প্রাপ্ত হইবেন। আত্মাকে ধরিত্রীরূপে চিন্তা করিলে ধরিত্রীর সমুদয় বন্ধন তাঁহার ছিন্ন হইবে। এইরূপ জলে সূক্ষ্ম রস, তেজে রূপ, অনিলে স্পর্শ, ব্যোমে সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি ও শব্দকে ধারণা করিবেন এবং পরে তাহাও পরিত্যাগ করিবেন। মনঃ দ্বারা সর্ব্বভূতের মনে আবিষ্ট হইয়া ধারণা করিতে পারিলে, তাহার মনঃ সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইবে। ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাও

ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি এইরূপ অভ্যাস করিতে পারেন, তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কোন ভূতে আসক্তি থাকিলেই, তাঁহার জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে পড়িতে হইবে, সুতরাং তিনি ভূতগুলির তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া তাহাতে আসক্তি ত্যাগ করিবেন। এইরূপে তাঁহার অণিমাদি সিদ্ধি যখন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও যিনি অনায়াসে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই পরম পদ প্রাপ্ত হন।

যদি তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি অরিষ্ট চিহ্ন দ্বারা মৃত্যু বিদিত হইয়া, মরণান্তে জাতিস্মৃতিলাভপূর্ব্বক পর জন্মে পুনর্ব্বার যোগিত্ব পাইতে পারেন। সিদ্ধ বা অসিদ্ধ যোগী সকলেরই অরিষ্ট চিহ্ন জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ অরিষ্টচিহ্ন জানা থাকিলে, মৃত্যুকালে অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয় না। সুতরাং যোগিব্যক্তি অরিষ্টগুলি দর্শন করিলেই মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া অবহিত হইবেন। অরিষ্টচিহ্ন যথা :—

১। যে ব্যক্তি দেবমার্গ, ধ্রুব, শুক্র, চন্দ্র, ক্ষীর, ছায়া ও অরুন্ধতী দেখিতে পায় না, তাহার এক বৎসর পরই মৃত্যু হয়।

২। যে ব্যক্তি সূর্য্যকে রশ্মিবিহীন ও অগ্নিকে অংশুমালী দেখে, একাদশ মাসের অধিক সে বাঁচে না।

৩। স্বপ্নযোগে যে মূত্র পুরীষ বা উদ্গীর্ণ বস্তু (বমি) মধ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্য দেখিতে পায়, সে দশমাস মাত্র বাঁচিয়া থাকে।

৪। যে ব্যক্তি প্রেত, পিশাচ গন্ধর্ব্বগণের নগর বা স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ দর্শন করে, সে নয় মাস মাত্র জীবিত থাকে।

৫। যে ব্যক্তি সহসা স্থূল হইয়া কৃশ এবং কৃশ হইয়া স্থূল হয়, তাহার আয়ুঃ কাল আট মাস মাত্র।

৬। ছাই বা কাদার ভিতর পাদক্ষেপ করিলে, যে ব্যক্তির পদচিহ্ন খণ্ডিত দেখা যায়, তাহার আয়ুঃ কাল সাত মাস মাত্র।

৭। গৃধ্র, পায়রা, কাকোল, কাক কিংবা অন্য কোন নীলবর্ণ মাংসাশী পক্ষী উড়িয়া মস্তকে উপবেশন করিলে, সে ছয় মাস মাত্র বাঁচিয়া থাকে।

৮। কাকসমূহ যাহার শরীরে পতিত হয়, অথবা ছাইবৃষ্টি যাহার উপর হয় এবং নিজের শরীরের ছায়াকে, যে বিপরীত দেখে তাহার আয়ুঃ কাল চারি বা পাঁচ মাস মাত্র।

৯। বিনা মেঘে দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ দর্শন করিলে বা রাত্রিতে ইন্দ্রধনুঃ দেখিলে, তাহার আয়ুঃ কাল দুই বা তিন মাস মাত্র।

১০। ঘৃত, তৈল, দর্পণ ও জল এই সকলের মধ্যে নিজ ছায়া না দেখিলে, এবং আপনার দেহ মস্তকশূন্য দেখিলে, তাহার আয়ুঃ কাল এক মাস মাত্র।

১১। যাহার গাত্র হইতে শবগন্ধ নির্গত হয়, তাহার জীবন কাল অর্দ্ধ মাস।

১২। স্নানমাত্র যাহার হৃদয় ও পদ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং জলপান করিবামাত্র পুনরায় তৃষ্ণার উদয় হয়, সে দশ দিন মাত্র জীবিত থাকে।

১৩। বায়ু যাহার মর্ম্মদেশ বিভিন্ন করিয়া দেয়, এবং জল স্পর্শ করিলে যাহার রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় না, তাহার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিবে।

১৪। স্বপ্নযোগে রক্ত বা কৃষ্ণবস্ত্রধারিণী স্ত্রী হাসিতে হাসিতে যাহাকে দক্ষিণদিকে লইয়া যায়, তাহার মৃত্যু অবিলম্বেই হইবে।

১৫। স্বপ্নে মহাবল ক্ষপণক উলঙ্গ অবস্থায় হাসিতে হাসিতে একাকী গমন করিতে দেখিলে, তাহার মৃত্যু অতীব নিকটবর্ত্তী।

১৬। স্বপ্নযোগে যে ব্যক্তি নিজের মস্তক কর্দ্দমে নিমগ্ন দেখে, তাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট।

১৭। স্বপ্নযোগে কেশ, অঙ্গার, ভস্ম, সর্প, নদী, শুষ্ক নদী যাহার নেত্র-পথে পতিত হয়, একাদশ দিনে তাহার মৃত্যু হয়।

১৮। স্বপ্নে বিকটাকার পুরুষ, যাহাকে পাষাণ দ্বারা আঘাত করে, সদ্যই তাহার মৃত্যু হয়।

১৯। সূর্য্যোদয়ে যাহার সম্মুখে পশ্চাতে বা চারিদিকে শৃগাল গমন করে, সদ্যঃ সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২০। আহার করিবামাত্র যাহার পুনরায় ক্ষুধা ও দন্তঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু অচিরাৎ হইয়া থাকে।

২১। যাহার নাসাতে দীপগন্ধ প্রবেশ না করে, যে দিবা এবং রাত্রিতে ভয় পায় এবং অন্যের নেত্রে নিজের ছায়া দেখিতে পায় না, তাহার জীবন শেষপ্রায়।

২২। যদি অর্দ্ধরাত্রে ইন্দ্রধনুঃ, এবং দিনে গ্রহ দেখিতে পায়, তাহার পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিতে হইবে।

২৩। যাহার নাসিকা বক্র হয়, শ্রবণযুগল নতোন্নত হয়, এব অবিরত বাম চক্ষুঃ হইতে জল পড়ে,—তাহার জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ।

২৪। মুখ লোহিতবর্ণ, এবং জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিতে হইবে।

২৫। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে উষ্ট্র বা গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া, দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাহার মৃত্যু অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

২৬। কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিলে যে শব্দ শুনিতে পায় না, এবং চক্ষুর জ্যোতিঃ যাহার লুপ্ত হয়, সে সদ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

২৭। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে গর্ত্তে নিপতিত হইয়া আর উঠিতে পারে না, সে সদ্যই জীবন ত্যাগ করে।

২৮। যে ব্যক্তির দৃষ্টি ঊর্দ্ধভাগে সমুত্থিত, লোহিতবর্ণ, মুহুর্মুহু

ঘূর্ণায়মান ও চঞ্চল, যাহার মুখ উষ্মায় পূর্ণ ও যাহার নাভিবিবর বিস্তৃত, তাহার মৃত্যু সদ্যঃ।

২৯। দিবা বা রাত্রিতে দুষ্ট ভূতগণ যাহাকে আঘাত করে, সপ্ত রাত্রিতেই তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

৩০। স্বভাবের বৈপরীত্য ও প্রকৃতির বিপর্য্যয় হইলে, তাহার মৃত্যু সময় নিকটবর্ত্তী জানিবে।

৩১। যে পূজ্যতম ব্যক্তিগণের অবমাননা ও নিন্দা করে, দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ করে, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে, জনক-জননীর সৎকার ত্যাগ করে, জামাতৃগণের আদর করে না—যোগী জ্ঞানী বা অন্যান্য মহাত্মা সকলকেই অনাদর করে, তাহার মৃত্যু কাল নিকটবর্ত্তী। ইহাভিন্ন আরও অরিষ্ট আছে, এতৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া যোগিব্যক্তি মৃত্যুজন্য ভয় পরিহার করত সময়মত যোগে নিবিষ্ট হইবেন। সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে বা রাত্রিকালে যখনই অরিষ্ট দৃষ্ট হইবে—সেই সময় হইতে মৃত্যু দিন-পর্য্যন্ত যোগক্রিয়ায় নিমগ্ন হইবেন। তিনি আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ভয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরমাত্মাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইবেন। তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধির অগোচর—বাক্যের অগোচর পরমনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।

সমাপ্ত। হরিঃ।